বাংলা সাহিত্যে ‘মধ্যযুগ’-এর চর্চা, ধারণা ও নির্মাণ (১৮৫০-১৯২০)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে
পি.এইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক
সুজাতা সরকার
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
শ্রী সৌমিত্র বসু
অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা
২০১৬

Certified that the Thesis entitled

বাংলা সাহিত্যে 'মধ্যযুগ' -এর চর্চা, ধারণা, ও নির্মাণ (১৮৫০-১৯২০)

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Dr. Soumitra Basu, **Department of** Drama, Rabindra Bharati **University** And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor :

Dated :

Candidate :

Dated :

=ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ=

কাজটি যখন শুরু করেছিলাম তখন তার পরিণতি ঠিক কীভাবে হবে তার পুরোটা বুঝে উঠতে পারি নি। কাজটি শুরু করবার পরিকল্পনা যাঁর দৌলতে আমাদের মনে এসেছিল তিনি আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই আবদুল কাফি বা কাফিদা। যাঁর কাছে ঋণের পরিমাণ (এই কাজটি ছাড়াও) এতই বেশি যে - কোনওদিন সেই ঋণ পরিশোধ হবে বলে তো মনে হয় না, এবং সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনে তাঁর অবদান সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলা হয় না। দ্বিতীয় জন অবশ্যই আমাদের আরও এক শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই ঁদীপান্বিতা দি, যিনি না থাকলে কাজটা শুরু করবার সুযোগ আমরা পেতাম না এবং পরবর্তী জন অবশ্যই আমাদের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক মাস্টারমশাই শ্রী সৌমিত্র বসু মহাশয় যিনি না থাকল কাজটা শেষ হত না। ফলে উক্ত তিনজনের কাছেই আমরা ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে শুভ, অভীক, সাহানা, আইবিদি, হরিশদা, নির্মাল্যদা, গোপালদা, ছাত্রসম, বিশ্বজিৎ, মানব, প্রদীপ, রাজদীপ, বীথিকা, রাজু, রিনি দি, সন্দীপদা (দত্ত) এদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আলাদা করে উল্লেখ করব স্বপন বসু মহাশয়, শম্পাদি, বরেন্দুদা, জয়দীপদা -এই মাস্টারমশাইদের, যাঁদের বইপত্র ও পরামর্শের সহযোগিতা পেয়েছি আমরা। এছাড়াও কাজের প্রয়োজনে জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগার, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর কাছে আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি রয়েছে, বন্ধু-সতীর্থ ও ছেলেমেয়েদের আন্তরিক উৎসাহ যা কখনই ভুলবার নয়, সব-শেষে যাদের কথা ছাড়া এই কাজ অসম্পূর্ণ তারা আমার পরিবার, যারা সর্বাবস্থায় পা-শে না থাকলে আজকের আমার আর ‘আমি’ হওয়া হয়ে উঠত না।

=ঃ সূচিপত্র ঃ=

বিষয় সূচি	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	১-১০
প্রথম অধ্যায় ঃ পত্র-পত্রিকা	**১১-৬২**
বিবিধার্থ সংগ্রহ	১২-১৪
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	১২-১৩
ভারতচন্দ্র	১৩-১৪
বঙ্গদর্শন	১৪-২২
রামায়ণের সমালোচনা	১৪-১৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ	১৬-১৭
জ্ঞানদাস	১৭-১৮
বলরাম দাস	১৮-১৯
চৈতন্য	১৯-২০
বিদ্যাপতি	২০-২২
ভারতী	২২-৩০
বিদ্যাপতি	২২-২৩
কবি কৃত্তিবাস	২৩-২৫
কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন	২৫-২৬
মালিক মহম্মদের পদ্মাবত এবং আলোয়াল কৃত আনুবাদ	২৭-২৮
কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা	২৯-৩০
সাহিত্য	৩০-৩৪
মুকুন্দরাম	৩০-৩১

নরোত্তমের রাধিকার ‘মানভঙ্গ’ ৩১-৩২
চৈতন্য ভাগবত ৩২-৩৩
মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী ৩৩-৩৪
সাধনা ৩৪-৩৫
মহাকবি কৃত্তিবাস ৩৪-৩৫
নব্যভারত ৩৬-৪৩
চন্ডীদাস ৩৬
রূপ ও সনাতন গোস্বামী ৩৭-৪০
রামপ্রসাদ ৪০-৪৩
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৩-৫৪
নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল ৪৩-৪৫
স্ত্রী কবি মাধবী ৪৬-৪৮
জগন্নাথ বিজয় ও কবি মুকুন্দ ৪৯-৫১
সত্যনারায়ণ কথা ৫১-৫২
খনা ৫২-৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উপন্যাস ও প্রবন্ধ **৬৩-১৩৪**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ উপন্যাস ৬৩-৮৪
দুর্গেশনন্দিনী ৬৩-৬৭
মৃণালিনী ৬৭-৭১
আনন্দমঠ ৭১-৭৭
রাজসিংহ ৭৭-৮৪
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ প্রবন্ধ ৮৪-৯৯

Bengali Literature	৮৪-৮৮
বাঙ্গালির বাহুবল	৮৮-৯০
ভারত-কলঙ্ক	৯০-৯৩
বাঙ্গালার ইতিহাস	৯৩-৯৭
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	৯৭-৯৯
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ উপন্যাস	৯৯-১০৮
কাঞ্চনমালা	৯৯-১০৩
বেনের মেয়ে	১০৩-১০৮
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ প্রবন্ধ	১০৮-১২৩
Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English Education	১০৮-১১৩
Ancient Bengali Literature Under uhammadan Patronage	১১৩-১১৫
Notices of Sanskrit Mss, Vol, (xi)	১১৫-১১৭
Bengali Buddhist Literature	১১৭-১২৩

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইতিহাস চর্চা **১৩৫-২৪৪**

কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঃ On Bengal Works and Writers	১৩৬-১৩৭
হরচন্দ্র দত্ত ঃ On Bengali Poetry	১৩৭-১৩৮
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ	১৩৮-১৪০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঃ কবিজীবনী	১৪০-১৪৭
হরিশচন্দ্র মিত্র ঃ কবিকলাপ	১৪৭
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ঃ কবিচরিত	১৪৭

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ বঙ্গভাষার ইতিহাস ১৪৭-১৫১

রামগতি ন্যায়রত্ন ঃ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ১৫১-১৫৬

রমেশচন্দ্র দত্ত ঃ The Literature of Bengal ১৫৬-১৬৫

রাজনারায়ণ বসু ঃ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ১৬৫-১৭০

গঙ্গাচরণ সরকার ঃ বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা ১৭০

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ঃ বাঙ্গালা সাহিত্য ১৭১-১৭৮

দীনেশচন্দ্র সেন ঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৭৮-২০৩

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ঃ বঙ্গভাষার লেখক ২০৩-২০৭

হারানচন্দ্র রক্ষিত ঃ ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য ২০৭-২১২

দীনেশচন্দ্র সেন ঃ History of Bengali Language and Literature ২১২-২২৮

চতুর্থ অধ্যায় ঃ 'মধ্যযুগ' ধারণার প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপ্তি ২৪৫-২৫৫

দীনেশচন্দ্র সেন ঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা ২৪৫-২৪৯

সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ও মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ২৪৯-২৫৩

উপসংহার ২৫৬-২৫৮

গ্রন্থপঞ্জি ২৫৯-২৬৪

পরিশিষ্ট ২৬৫-২৮৮

=ঃ ভূমিকা ঃ=

বাংলা সাহিত্যের বয়স আজ আর তত ছোট নেই, যত ছোট হয়ে একদিন শুরু হয়েছিল তার পথচলা। সেই সুদূর 'চর্যাগীতি' থেকে হাল আমলের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ পর্যন্ত ভাষার কলেবর যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই উত্তরোত্তর বেড়েছে তার বয়সও। ভাষাকে সার্বিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে চাওয়ার প্রয়াসে যুগে যুগে হয়েছে অনেক জল্পনা - যুগবিভাজনই একমাত্র পদ্ধতি, না সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের যুগরূপে কল্পনা করা সঠিক, না কি ক্ষমতার অলিন্দ থেকে নির্ণীত হবে সাহিত্যের স্থান ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, উপযুক্ত অবিতর্কিত উত্তর নির্ণয় হয়নি একবারও। উত্তর-প্রত্যুত্তর, যুক্তি প্রতিযুক্তির মধ্যে দিয়েই পথ এগিয়ে চলেছে। পথ মসৃণ একেবারেই নয়, পদে পদে মতৈক্যের চেয়ে মতানৈক্য ঢের বেশি, বিতর্ক কোন দিনই পিছু ছাড়েনা তাদের। তবুও এই সব কিছুই পাঠককে আরও বেশি আকৃষ্ট করে সাহিত্যের প্রতি। হৃদয়ের জলবায়ু আরও নির্মল হয় সাহিত্যের পরিবেশে।

প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে অতিবাহিত করবার পর ব্যক্তিগত আগ্রহের সৌজন্যে 'মধ্যযুগ' নিয়ে কিছু প্রশ্ন নিজের কাছে জেগেছিল এবং সেই প্রশ্নের সূত্র ধরেই এই বিষয়ের অবতারণা। বলতে দ্বিধা নেই যে, এতদিন পরেও সব প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছে দিতে পারিনি। তবে যেখানে তা পারিনি, সেখানে প্রশ্ন উত্থাপিত করেই আমরা সন্তুষ্ট থেকেছি এই আশায় যে ভবিষ্যতে হয়ত কেউ আমাদের প্রশ্নগুলির সমাধান করে দেবেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, যে বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের কাজ ও চিন্তা-ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি তার শিরোনাম - 'বাংলা সাহিত্যে 'মধ্যযুগ'-এর চর্চা-ধারণা ও নির্মাণ (১৮৫০-১৯২০)'।

বর্তমানে 'মধ্যযুগ' বলতে আমরা বাংলা সাহিত্যের যে অধ্যায়কে বুঝি অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে 'অন্নদামঙ্গল', বিষয়ের এই সীমার মধ্যেই আমাদের 'মধ্যযুগ' ভাবনা কেন্দ্রিভূত। কিন্তু যে সময় নিয়ে আমরা কথা বলতে চলেছি সেই সময়ে

‘মধ্যযুগ’-এর বিষয় পরিধি এমনটা ছিল না, এমনকি ‘মধ্যযুগ’- নামক এই তক্‌মাটিও সেই সময় নির্দিষ্ট হয়নি। সময়কাল -১৮৫০-১৯২০। স্থূল অর্থে সময়সীমা এমন হলেও বক্তব্যের প্রয়োজনে আমারা আরও একটু অর্থাৎ ১৯৪৮ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছি কারণ এই সময়ে এসেই ‘মধ্যযুগ’ শব্দটি মান্যতা পাচ্ছে।

শিরোনামে ‘মধ্যযুগ’ শব্দটিকে লক্ষ করে কেউ এমন প্রশ্ন করতেই পারেন যে, ইতিহাসও তো এই বিষয়টিকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করে চলেছে। তার দৃষ্টিতে ‘মধ্যযুগ’ বিষয়টি ঠিক কেমন? -এ প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণে রাখা উচিত সময়কালটিকে। আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করেছি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। বাঙালির ইতিহাস চর্চার সূচনাকাল প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বলা যায়, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই ছিল বিদ্যালয় পাঠ্য। বেশির ভাগ বই ছিল বিদেশি ভাষায় রচিত গ্রন্থের অনুবাদ বা অনুসরণে লেখা।[১] বাঙালির ইতিহাস রচনার এই উন্মেষকাল বা আদিপর্বের গতিধারায় নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চার করে সিপাহি বিদ্রোহ বা নীল বিদ্রোহের পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র চেতনার বিকাশ। স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ ধীরে ধীরে একটি পরিণত রূপ গ্রহণ করতে থাকে। অতীত ঐতিহ্য অনুসন্ধানে বাঙালি বিদগ্ধজনেদের তৎপরতা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। অন্তরালে বিদেশি পন্ডিতদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের উদ্যোগ সম্পূর্ণতা লাভ করে বিশ শতকের প্রথমার্ধেই। নতুন শতকের সূচনায় ‘বঙ্গভঙ্গ’ প্রস্তাব বাঙালিকে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে। নতুন দিগন্তের অনুসন্ধানে উদ্দীপ্ত করে। এই অনুসন্ধানের পরিণতি স্বরূপই ‘মধ্যযুগ’ বা ‘Mediaeval’ ধারণার স্বীকৃতি ঘটে। ফলে ১৮৫০ -এই কিন্তু ‘মধ্যযুগ’ -এর নির্মাণ ঘটেনি।

কিন্তু ‘মধ্যযুগ’ - এর উপযুক্ত সংজ্ঞা কি, বা ‘মধ্যযুগ’-ই কেন বলা হচ্ছে, কীসের সাপেক্ষে একথা বা এই শব্দ প্রয়োগ হচ্ছে, তার উপযুক্ত উত্তর পরিষ্কার

ভাষায় ঐতিহাসিকেরা বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ফলে দুই-তিন লাইনে 'মধ্যযুগ'-কাকে বলে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পরোক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একটা সামান্য প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।' 'History of Mediaeval India' -নামক রচনায় জানানো হয়েছে যে -

'The Muslims were great historiographers. They have left valuable chronicles which have helped us to reconstruct a history of the events of which they were eye witnesses. They were not historians in the modern sense, concerned with the sequence of cause and effect. They did not arrange their material systematically nor did they critically examine the facts. They were chroniclers who recorded what they saw and heard without caring much for the authenticity of the information obtrained by them. .....Care has to be taken in studying them and the scholar will have to train himself to be able to separate the grain from the chaff. Most of these chronicles are available in English translations (some in Hindi and other languages too) and the students must use them in studying mediaeval history.'[২]

অর্থাৎ সোজা বাংলায় বললে, মধ্যযুগের ইতিহাস বা মধ্যযুগকে বুঝতে হলে মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস অবশ্যই পড়তে হবে। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে কি পরোক্ষে মুসলিম শাসনের সময়কালকেই 'মধ্যযুগ' নামে অভিহিত করেছেন ঐতিহাসিক ? তা না হলে মধ্যযুগকে বুঝতে মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা পাঠ করতে হবে কেন? পরোক্ষে এর উত্তর হ্যাঁ বাচক হলেও প্রত্যক্ষ ভাবে

ঐতিহাসিক নিশ্চুপ। ঐতিহাসিক জগদীশ নারায়ণ সরকার তাঁর 'Glimpses of Medieval Bihar Economy' - নামক বইটিতেও 'Medieval' এর সংজ্ঞা পরিষ্কার করেন নি, তবে বইটির Title Page -এ তিনিও একটা দিক নির্দেশ দিয়েছেন - 'Thirteenth to mid-eighteenth Century'[৩] -অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে মধ্য -অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালকেই তিনি সম্ভাব্য 'মধ্যযুগ' -এর সময়সীমা রূপে চিহ্নিত করছেন। যদিও প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা নির্ধারণে তিনি ও নীরব। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' -এর দ্বিতীয় খন্ডকে আলাদা ভাবে 'মধ্যযুগ' নামে চিহ্নিত করেছেন, এবং এই বইটির প্রায় পুরোটা জুড়েই রয়েছে মুসলমান শাসক এবং সমকালীন সময়কালের আলোচনা।[৪] ঐতিহাসিক জগদীশ নারায়ণ সরকারও মুসলিম শাসনের আনুমানিক সময়কালকেই 'Medieval' নামে চিহ্নিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই জানিয়ে রাখা দরকার যে শিরোনামে 'মধ্যযুগ' শব্দটিকে দেখে কেউ এমন অনুমান একেবারেই করবেন না যে আমরা আলাদা করে ইতিহাসের 'মধ্যযুগ চর্চা' প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ আলোচনা করব - না, একেবারেই না। আমাদের বিষয় বাংলা সাহিত্য। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েই বক্তব্যের সূত্রে ইতিহাসের প্রসঙ্গ আসবে এবং আমরা স্বল্প পরিসরে তার আলোচনা করব। আলাদা করে ইংরেজি সাহিত্যের 'মধ্যযুগ চর্চা', বাংলা সাহিত্যের 'মধ্যযুগ চর্চা', ইতিহাসের 'মধ্যযুগ চর্চা', -আলোচনা করা, একটি নির্দিষ্ট গবেষণা সন্দর্ভে, আমাদের সাধ্যের বাইরে।

এখন আরও একটি প্রশ্ন হল, 'মধ্যযুগ' -এই নামটিই কেন? বা মধ্যযুগের অর্থে মুসলিমরাই কেন? যুগের এমন বিভাজনের ক্ষেত্রে এদেশীয়রা পাশ্চাত্যের যাঁদের কাছে ঋণী, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য জেমস মিল। সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মুসলমান রাজত্ব এবং ব্রিটিশ আধিপত্য[৫] -এই

তিন ভাগে বিভক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে 'History of Mediaeval India' -তে জানানো হয়েছে -

'The divisions must be observed in European as in Indian history, for in the one as in the other the three periods are in such marked contrast with one another.'[৬]

ইতিহাস প্রসঙ্গ ছাড়াও ইংরেজি সাহিত্যের 'Middle Age' যখন বাংলায় 'মধ্যযুগ' - এ রূপান্তরিত হচ্ছে, তখন ইংরেজি সাহিত্যের এই বাহ্যিক দৃষ্টি ও শ্রুতি নন্দন কাঠামোর প্রতিই ইতিহাসকারদের নজর ছিল বেশি। এই কাঠামোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ের গভীরতার প্রতি কেউই মোটেও লক্ষ করেন নি। করলে তাঁরা বুঝতেন যে, ইংল্যান্ডের ইতিহাসে মুসলমান শাসনকাল না থাকলেও তাঁদের নিজস্ব দেশীয় এবং সাহিত্যের ইতিহাসে 'Middle Age' ছিল। এই Age নির্ধারণে ইংরেজদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হতে হয় নি। 'Middle Age' নির্ধারণে ইংল্যান্ডের তৎকালীন ইতিহাস, সাহিত্যের গুণাগুণ ইত্যাদি আরও বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই ইতিহাস বিদ্যার চর্চাই যখন তাঁদের মাধ্যমে এদেশে শুরু হল, তখন তাঁদের এবং এদেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কল্যাণে 'Middle Age' হয়ে গেল 'মধ্যযুগ' বা 'মুসলিম যুগ'। এর পেছনে কারণ ঠিক কি কি ছিল বা বাংলা সাহিত্যে এই 'মধ্যযুগ' চর্চা এদেশের নিরিখে একেবারে উপযুক্ত ছিল কি না, এই সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের বক্তব্য আবর্তিত। শিরোনামে উল্লিখিত 'চর্চা' শব্দটির মধ্যে দিয়ে আমরা 'অধ্যয়ণ',[৭] 'ধারণা' শব্দটির মধ্যে দিয়ে 'নিশ্চয়' বা 'নির্দ্ধারণ'[৮] এবং 'নির্মাণ' শব্দটির মধ্যে দিয়ে 'ভাবনা-চিন্তার দৃঢ়তা' বোঝাতে চেয়েছি। 'মধ্যযুগ' বিষয়টিকে আমরা আমাদের সুবিধার্থে বেশ কয়েকটি দিক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি। এবার আমরা সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা করব।

প্রথম অধ্যায়ে উক্ত সময়সীমার মধ্যে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তারই কয়েকটিকে নির্বাচন করে আমরা অগ্রসর হয়েছি। বলাবাহুল্য, এই নির্বাচন একেবারেই নিজস্ব। উক্ত সময়সীমায় অনেক পত্র-পত্রিকাই প্রকাশিত যেখানে 'মধ্যযুগ' কেন্দ্রিক প্রবন্ধ/তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। সব পত্রিকা নিয়ে আলোচনা সম্ভব ছিল না, এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে 'মধ্যযুগ'-এর বিষয়গুলি নিয়ে যে সমকালে 'চর্চা' শুরু হচ্ছে আমরা সেটাই দেখাতে চেয়েছি। শিক্ষা ও সাহিত্যের মাদকরসে বুঁদ শিক্ষিত বাঙালিও যে নিজের ফেলে আসা অতীত নিয়ে 'চর্চা'-য় উৎসাহী হচ্ছে এটাই এই অধ্যায়ে আলোচ্য। এই কারণেই ১৮৫০ থেকে আমাদের চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত, কারণ 'মধ্যযুগ' কেন্দ্রিক আলোচনায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৎকালীন উপন্যাস-প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে কী ভাবে 'মধ্যযুগ' সম্পর্কিত 'ধারণা' আরও পরিপুষ্ট হচ্ছে তা আমরা আলোচনা করব এবং এক্ষেত্রেও আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করেছি। বক্তব্যের প্রয়োজনে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাস-প্রবন্ধকে গ্রহণ করেছি। সমসময়ের আরও অনেক লেখায় প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যাদি থাকলেও আমাদের মনে হয়েছে যে আমাদের যা বলবার তার জন্য উক্ত নির্বাচনই যথেষ্ট। এর বেশি নির্বাচন থাকলে একই কথার পুনরাবৃত্তি ও অযথা কলেবর বৃদ্ধিই হত, নতুন কোন ভাবনা-চিন্তা প্রকাশ পেত না। সমস্ত উপন্যাস-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যে কেবলমাত্র প্রথম প্রকাশকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে তা নয়, বরং উল্টোটাও ঘটেছে। অর্থাৎ লেখকের জীবিতাবস্থার সর্বশেষ সংস্করণও আমাদের কাছে কখনো কখনো বেশি মান্যতা পেয়েছে, কারণ এর দ্বারাই আমাদের বক্তব্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা ধরেই নিয়েছি যে লেখকের জীবিতাবস্থায় রচনার শেষ সংস্কার লেখক নিজে ছাড়া আর কেউ করেন নি। প্রথম অধ্যায়ের পত্রিকার 'চর্চা'-য় বিভিন্ন সূত্র ধরে আমাদের 'মধ্যযুগ' চর্চা অগ্রগতি লাভ করেছে। অর্থাৎ পত্রিকায় 'মধ্যযুগ' নামে কিছুই আলোচনা হয় নি, কিন্তু 'বিদ্যাপতি'

বা ‘বলরাম দাস’ নামে আলোচনা হয়েছে, এটাই ‘মধ্যযুগ চর্চা’-র সূত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ক্ষেত্রেও একথাই প্রযোজ্য। এই অধ্যায়ের উপন্যাস-প্রবন্ধে সমকালীন বা পূর্ববতী রাজনৈতিক ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস প্রসঙ্গ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে, এর মধ্যে দিয়েই ‘মধ্যযুগ’ সম্পর্কিত ‘ধারণা’-য় আমরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা উক্ত সময়ের মধ্যে ‘সাহিত্যের ইতিহাস’ কেন্দ্রিক যে সমস্ত লেখাপত্র রচিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি এবং এই সমস্ত লেখার মধ্যে দিয়ে কী ভাবে ধীরে ধীরে ‘মধ্যযুগ’ নামক বিষয়টির ‘নির্মাণ’ ঘটেছে তা দেখবার চেষ্টা করেছি। এই সমস্ত বই পত্রের সবগুলির ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশের সাহায্য আমরা নিতে পারিনি। গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের অভাব এর অন্যতম কারণ। কোন কোন বইয়ের কেবলমাত্র উল্লেখ পেলেও তা আমরা দেখতে পাইনি। এই অধ্যায়ে আমরা ইংরেজি সাহিত্যের ‘Middle Age’ কী ভাবে বাংলার ‘মধ্যযুগ’-এ রূপান্তরিত হচ্ছে তা বলবার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা জাতীয় গ্রন্থাগারে আশুতোষ সংগ্রহশালায় Taine -এর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর এযাবৎ পাওয়া সবচেয়ে পুরনো বইটির সাহায্য নিয়েছি। কিন্তু পুনরায় সংরক্ষণের অভাবে তার প্রকাশ সাল জানতে পারিনি। কেবল (১৮--) প্রথম দুটি সংখ্যা জানতে পেরেছি, তার পরের অংশ ছেঁড়া ছিল। তা সত্ত্বেও এই বইটি যে Taine -এর প্রথম প্রকাশিত বই নয়, তা New Edition কথাটির মধ্যে দিয়ে জানতে পেরেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা ১৯২০-র পর থেকে ১৯৪৮ এর মধ্যে চারটি বইয়ের আলোচনা করেছি। ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’-এর ষষ্ঠ সংস্করণ, ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ এবং ‘মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী’-র। ‘মধ্যযুগ’ নামক ধারণা ও শব্দের কী ভাবে নির্মাণ হচ্ছে এবং এর বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি ঘটছে আলাদা আলাদা লেখাপত্রের মধ্যে দিয়ে তা এই অধ্যায়ে আমরা দেখব।

পরিশেষে উপসংহারে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে, আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে আমাদের অগ্রজরা তাঁদের প্রতিবেশ ও পরিবেশের সাপেক্ষে যে যুগ নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তা সেই দিনের ও আজকের নিরিখে কতখানি প্রাসঙ্গিক, একই সঙ্গে এই অংশেই আমরা আলোচনা করব যে যুগনির্মাণের প্রাসঙ্গিকতা যদি যুক্তি-প্রতিযুক্তির কাছে স্তিমিত হয়ে পড়ে তাহলে বিকল্প পদ্ধতি কি আছে বা কি হতে পারে সাহিত্যকে বোঝাবার। বলাবাহুল্য এই প্রস্তাবিত অংশটি হবে পুরোপুরি বিতর্কিত, এবং আমাদের প্রস্তাবটিকে মান্যতা না দিয়ে পুরোপুরি বিতর্কের মধ্যে দিয়েই যদি সাহিত্যকে বোঝবার নতুন কোন মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই আমাদের কাজটির যথার্থ সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে।

উপসংহারের পরেই আছে গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রিকাপঞ্জির বিশদ তালিকা, সর্বশেষে রয়েছে পরিশিষ্ট। এখানে জানিয়ে রাখা দরকার যে কাজের সুবিধার্থে ১৮৫০-১৯২০ -এই নির্বাচনের পেছনে ১৮৫০ যদি হয় ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’-এর প্রয়োজনে, তাহলে ১৮২০ অবশ্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে। অর্থাৎ ১৮২০-র আগেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক স্নাতকোত্তরে পঠন-পাঠন শুরু হয়। সেই পঠন-পাঠনে ‘মধ্যযুগ’-এর চেহারা কেমন ছিল তা আমরা ১৯১৮, ১৯২০ এবং ১৯২১ এর প্রশ্ন পত্রের মধ্যে দিয়ে দেখব (অনুলিপি)। এর সাথে University of Calcutta -র 'MINUTES OF THE SYNDICATE (1857) (REGULATIONS IN ARTS) ENTRANCE EXAM' -এর সম্পর্কিত বক্তব্য, এবং ইংরেজি ও বাংলার পাঠ্যক্রম -এর অনুলিপি দেখব। একইসঙ্গে Taine -এর 'History of English Literature' -এর 1907 -এর যে Edition গুলি প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে (১টি বাদে) সেই Edition -এর সূচিপত্র অংশের প্রতিলিপি এই অংশে আমরা সংযোজিত করেছি। এর মধ্যে দিয়ে 'Middle age' -এর ‘মধ্যযুগ’- এ পরিণতি সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা সুদৃঢ় হয়েছে। অনুলিপির ক্ষেত্রে

এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যই রয়েছে, আপনারা নিজ গুণে মার্জনা করে ত্রুটি গুলি প্রত্যক্ষ করালে আমরা সংশোধন করবার জন্য প্রস্তুত।

****

সংক্ষিপ্ত টীকা ঃ-

১) কমল চৌধুরী, 'ভূমিকা', বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্র. কমল চৌধুরী (সম্পা.), কলিকাতা, দে'জ সংস্করণ, ২০০৬।

২) Ishwari Prasad, 'Leading sources of Mediaeval history' History of Mediaeval India, forword by- L.F. Rushbrook-Williams, Allahabad, The Indian Press, 1972, Page - xxxv.

৩) Jagadish Narayan Sarkar, 'Title Page', Glimpses of Medieval Bihar Economy, Calcutta, Ratna Prakashan, 1978 .

৪) রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'Title Page', বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স, ২০০৩।

৫) মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসে ইতিহাস ঃ কল্পইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, থীমা, ২০০৩, পৃঃ -৩৫।

৬) Ishwari Prasad, 'Introduction', History of Mediaeval India, forword by -L.F.Rushbrook -Williams, Allahabad, The Indian Press, 1972, Page -xix.

৭) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খন্ড, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৭৮, (এখানে চর্চা বানান 'চর্চ্চা' রয়েছে), পৃঃ -৮৬০।

৮) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯, পৃঃ - ১১৪০।

=ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ=

বাংলা পত্র-পত্রিকার ইতিহাস বহু পুরনো এবং সেই প্রাচীন কাল থেকেই বেশ কিছু পত্রিকা এবং তার সম্পাদকেরা তাঁদের পূর্ববর্তী কবি, তাঁদের রচনা ইত্যাদি সম্পর্কে চর্চায় উৎসাহ বোধ করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আমরা আমাদের কাজের সুবিধার জন্য যে পত্রিকা গুলিকে নির্বাচন করেছি এবং এই অধ্যায়ে যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, প্রত্যেকটি পত্রিকা এবং তার মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য অন্যটির থেকে আলাদা। অর্থাৎ আমরা এই অধ্যায়ে দেখব যে, একই বিষয় নিয়ে দুটি আলাদা পত্রিকায় দুইজন আলাদা প্রাবন্ধিক লিখছেন, বিষয়গত সাযুজ্য তাঁদের মধ্যে থাকলেও উপস্থাপনা, ভাবনা-চিন্তা, তথ্যাদির প্রকাশ ইত্যাদির নিরিখে দুটি প্রবন্ধের মূল্য আলাদা। একই সঙ্গে এই অধ্যায়েই আমরা দেখতে পাব যে, সমকালে কেবল গদ্যেই নয়, বরং পদ্যেও অগ্রজদের চর্চা হত। পাশাপাশি, একটি প্রবন্ধের সমালোচনা বা প্রতিবাদ স্বরূপ রচিত আরও এক বা একাধিক প্রবন্ধের উল্লেখও আমরা এই অধ্যায়ে পাব। ঊনবিংশ এবং বিংশ, দুই শতাব্দীরই প্রবন্ধের কম- বেশি উল্লেখ এই অধ্যায়ে আমরা রেখেছি। সর্বমোট সাতটি পত্রিকার নির্বাচন আমরা করেছি। প্রবন্ধ গুলির মধ্যে দিয়ে যে প্রচুর তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে তা সমকালে বিভিন্ন পত্রিকার পাঠকদের প্রাচীন কবি ও তাঁদের রচনার চর্চায় আগ্রহী করে তোলে। ধীরে ধীরে আরও বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে এই চর্চার প্রকাশ ঘটে যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতেও দেখব। প্রবন্ধগুলির সমালোচনা করা এই অধ্যায়ে আমাদের একেবারেই উদ্দেশ্য নয়। বরং আমরা কেবলমাত্র তথ্যের নিরিখে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাবন্ধিকের বক্তব্য অনুসারেই সেই তথ্যগুলিকে উপস্থাপিত করেছি। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এই পত্রিকা গুলি, তার মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং তারও মধ্যে চর্চিত বিষয় সমূহের মূল্য অপরিসীম।

বিবিধার্থ সংগ্রহ

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

‘কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন’ নামক প্রবন্ধটি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ পত্রিকায় ১৭৭৩ শকাব্দের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের নাম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা নেই। কেবল প্রবন্ধের শেষে তিনটি অক্ষর লেখা রয়েছে যথা -‘হ. মো. সে’।[১] আমাদের অনুমান সম্ভবত এটিই প্রাবন্ধিকের নামের সংক্ষিপ্ত চেহারা, সেক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের নাম শ্রী হরিমোহন সেনগুপ্ত হলেও হতে পারে। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে রামপ্রসাদ সম্পর্কে যে আলোচনা এই লেখায় রয়েছে তার দ্বারা রামপ্রসাদ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের জন্ম সংক্রান্ত এবং ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে যে তথ্য প্রাবন্ধিক এখানে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত খানিকটা প্রচলিত কাহিনির ওপরও নির্ভর করেছিলেন, প্রবন্ধ থেকে আমরা এমন অনুমান করতে পারি।

লক্ষনীয় বিষয় এই যে, প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে প্রাচীনত্বের নিরিখে প্রথমে কৃত্তিবাসকে নির্বাচন করেছেন, পরবর্তী কবিরূপে কাশীদাস, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র প্রমুখের কথা বলেছেন কিন্তু কোথাও বৈষ্ণব কবিদের নাম উল্লেখ করেন নি।[২] সম্ভবত বৈষ্ণব কবি ও সাহিত্যের আবিল ভাবালুতা প্রাবন্ধিক বা সম্পাদক কাউকেই মোহিত করে নি। রামপ্রসাদের রচনারীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক তাঁর রচিত বহু পদের উল্লেখ করেন নি, সামান্য কিছুর উল্লেখ করেছেন। রামপ্রসাদের ও ভারতচন্দ্রের রচনা রীতির উপর ভিত্তি করে প্রাবন্ধিক উভয়ের সময় নির্ণয়ের যে চেষ্টা করেছেন তা প্রশংসনীয়।

‘বঙ্গভাষায় কবিতায় দ্ব্যক্ষরি মিলনের সৃষ্টি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন কবি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে, রচনার চাতুর্য্য আধুনিক কবিদিগের মধ্যেই প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এবং এই নিয়মানুসারে

বোধ হয় যে রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্র রায়, যদিও উভয়েই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তত্রাপি কবিরঞ্জন প্রথমতঃ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কেবল একাক্ষরী মিলন প্রচলিত ছিল; এবং তিনি তদনুসারেই লিখিয়াছিলেন। পরন্ত তিনি যে দ্ব্যক্ষরি মিলন প্রদানে অসক্ত ছিলেন এমত নহে; যেহেতু যমক স্বরূপ উত্তম মিলন তাঁহার পদের মধ্যে ভুরি ভুরি দৃষ্ট হইতেছে।'[৩]

পরিশেষে প্রাবন্ধিক রামপ্রসাদের গ্রন্থত্রয়ের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। এই গ্রন্থত্রয় যথাক্রমে 'কালীকীর্ত্তন', 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' এবং 'বিদ্যাসুন্দর'।[৪]

ভারতচন্দ্র

'ভারতচন্দ্র' নামক প্রবন্ধটি ১৭৭৬ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে পরিষ্কার করে প্রাবন্ধিকের নাম এবং তিনি ঠিক কোন সময়ে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার উল্লেখ আছে। প্রাবন্ধিকের নাম শ্রী হরিমোহন সেনগুপ্ত এবং তিনি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১ ফাল্গুন ১৭৭৫ শকাব্দে।[৫] সমকালে ভারতচন্দ্র অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তার জীবন চরিত বা পরিবারবর্গের আবিষ্কার না হওয়ায় ভারতচন্দ্র সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি। ফলে প্রাবন্ধিককে তাঁর রচনা সমূহ এবং কিংবদন্তীর ওপর ভিত্তি করেই প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হতে হয়েছে।

'দরিদ্ররাজকুমার'[৬] অভিধায় অভিহিত ভারতচন্দ্রের জনপ্রিয় রচনা 'অন্নদামঙ্গল' নিয়ে প্রাবন্ধিক একেবারেই আলোচনায় অগ্রসর হননি, সম্ভবত এই কাব্যের জনপ্রিয়তা এর অন্যতম বড় কারণ। প্রাবন্ধিক বরং 'চোর পঞ্চাশত' নামক একখানি রচনা, যা অন্নদামঙ্গলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং রচনাটির পদ্য অনুবাদ যে ভারতচন্দ্রের নয় বরং নন্দকুমার কবিরত্নের সে

কথা জানিয়েছেন।[৭] লক্ষণীয় বিষয় হল যে রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্র উভয়ের সম্পর্কেই কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক কোথাও তাঁদের রচনার ভক্তি বিহ্বল তাকে বক্তব্যের উপজীব্য করেন নি, বরং ভক্তির বিষয় কেন্দ্রিক বা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারক রচনা গুলিকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। বরং এই পত্রিকার রচনাগুলি অনেক বেশি তথ্য নিষ্ঠ এবং আবেগ বর্জিত। প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক এমনই কিছু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

'যাহা হউক, চোর পঞ্চাশত কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ রায় গুণাকর প্রণীত নহে। অন্নদামঙ্গল ব্যতিরিক্ত তিনি রসমঞ্জরী ও সত্যনারায়ণের কথা রচনা করেন, কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থের নাম প্রায়ঃ অনেকেই অবগত নহেন, যেহেতু সচরাচর সত্য নারায়ণের কথা যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা ভারতচন্দ্রীয় নহে।'[৮]

বঙ্গদর্শন

রামায়ণের সমালোচনা

মাসিক 'বঙ্গদর্শনে' ১২৭৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে[৯] 'রামায়ণের সমালোচনা' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। রচয়িতার নামরূপে রয়েছে - 'শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজ শ্রীমন্মহামর্কট প্রণীত'।[১০] প্রকৃত রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেই।[১১] নিজ নাম ব্যবহারের পরিবর্তে উক্ত ছদ্মনাথ ব্যবহার করেছিলেন। প্রবন্ধের তথাকথিত গুরু গম্ভীর, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ প্রকৃষ্ট বন্ধন থেকে প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধকে মুক্ত করেছেন। আগাগোড়া কৌতুকেপূর্ণ এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বাল্মীকিকে সম্যক কৃতিত্ব দিয়েছেন 'বানরদের কীর্ত্তি' বর্ণনার জন্য। প্রাবন্ধিক বলেছেন -

'বানরদিগের কীর্ত্তি সম্যকরূপে বর্ণনা করা, সামান্য কবিত্বের কার্য্য নহে। গ্রন্থকার যে ততদূর কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এমত আমরা বলিতে পারি না; তবে

তিনি যে কিয়দ্দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।[১২]

রামায়ণ সম্পর্কে এতাবৎ প্রচলিত ধারণার আমূল বদল হয়েছে প্রাবন্ধিকের জবানিতে। যে ভাষায় ও ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার দ্বারা লঘু চালের এক বৈঠকী মেজাজের আবহ ধরা পড়ে। পাশাপাশি সমকালের প্রতি কটাক্ষ প্রদর্শন করতেও তিনি পিছুপা হন নি। এবং তাঁর এই মনোভাবটি তিনি আড্ডার ছলে সীতা চরিত্র ব্যাখ্যায় প্রকাশ করেছেন। রামের বনবাস সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন-

''পথে নারী বিবর্জ্জিতা'', এটা সামান্য কথা; ইহাও তাহার ঘটে আসিল না। তাহাতে যাহা ঘটিবার, ঘটিল। স্ত্রী স্বভাব সুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ সীতা রামকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্ব্বোধ রাম পথে২ কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। সীতা অন্তঃপুরে থাকিলে, এতটা ঘটিত না। সীতা দুশ্চরিত্রা হইলেও, ঘরে থাকিত; বনে গিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছিল, এবং অন্যের সংসর্গ সুসাধ্য হইয়াছিল, এজন্য এমত ঘটিয়াছিল। এক্ষণে যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য কলহ করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন। ..... আর একটি গন্ড মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ মূর্খ লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ'।[১৩]

রামায়ণে একমাত্র করুণরসের উপাদান মজুত রয়েছে বানরদের সমুদ্র বন্ধনের মধ্যে,[১৪] একথা জানিয়ে প্রাবন্ধিক 'বাল্মীকি' ও 'অযোধ্যা'-র এক নতুন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। প্রাবন্ধিকের অনুমান কোন বল্মীকের মধ্যে রামায়ণখানি পাওয়া যায়, তাই এর নাম 'বাল্মীকির রামায়ণ'[১৫] বা অযোধ্যাকান্ডে যোদ্ধাদের কোন বিবরণ নেই, রামায়ণ প্রণেতা তাই এই কান্ডটিকে আসলে 'অযোদ্ধাকান্ড' বলতে চেয়েছিলেন, ভুলবশত হয়ে গেছে 'অযোধ্যাকান্ড',[১৬] বলাবাহুল্য রম্য রচনার আধারে রামায়ণের এমন সরস আলোচনা পাঠকের আনুকূল্য লাভ করেছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ

শ্রীরাঃ রামদাস সেন প্রণীত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ' নামক প্রবন্ধটি দুটি ভাগে সমাপ্ত। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়, এবং দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় পৌষ সংখ্যায়।[১৭] প্রবন্ধটি জীব গোস্বামীর স্বকৃত 'বৈষ্ণব তোষিনী'-র আংশিক অনুবাদ।[১৮] বলতে দ্বিধা নেই, সাধুগদ্যে রচিত হলেও ভাষার ওপর দক্ষতা, এবং নির্বাচনের মুন্সীয়ানায়, যতটুকু অংশ প্রকাশিত হয়েছে তার দ্বারাই পাঠক সমাজ বৈষ্ণবদের ষড় গোস্বামী ছাড়াও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্কার ধারণা করতে পারবে। জীব গোস্বামী তাঁর গ্রন্থের সমাপ্তি কালে তাঁর নিজের যে পরিচয় 'ছকের মাধ্যমে' দিয়েছেন, তা পাঠকের কাছে এক নতুন প্রাপ্তি। এই ছককেই পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোন উৎস নির্দেশ করেন নি। ছকটি নিম্নরূপ -

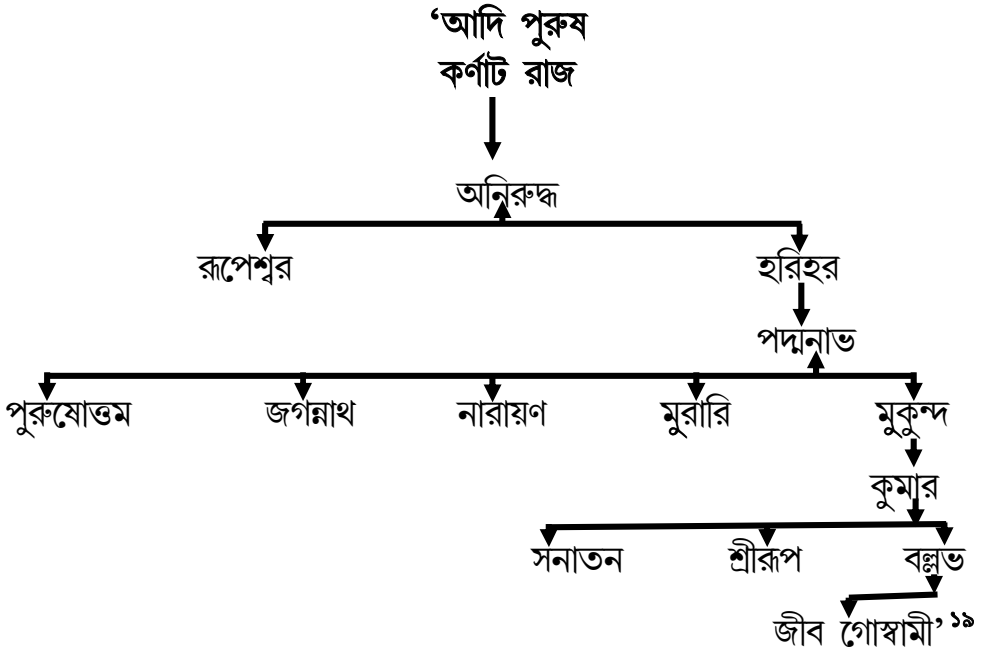

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত তথ্যপূর্ণ চেহারা এই রকম -

'হংসদূত। খন্ডকাব্য। গ্রন্থকার রূপ গোস্বামী। শিখরিণী ছন্দে রচিত। শ্লোক সংখ্যা ১০১। বিষয় শ্রীকৃষ্ণ বিরহে গোপীগণের অবস্থা বর্ণন, রাধিকার অবস্থা, তদনন্তর এক হংস সন্দর্শন করিয়া গোপীগণ তাঁহাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

আরম্ভ শ্লোক - ''দুকূলং বিভ্রাণো দলিত হরিতাল দ্যুতিহরং'' ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য - কদা ইত্যাদি'।[২০]

জ্ঞানদাস

'জ্ঞানদাস' শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধটি ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে লেখকের নাম অস্বাক্ষরিত ছিল।[২১] কিন্তু প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিকের সাহিত্য দর্শনের নিরিখ প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধের গোড়াতেই প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন -

'ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে কখন কখন উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উদয় হইয়া থাকে।'[২২]

অর্থাৎ তিনি ধর্মীয় (সাম্প্রদায়িক ধর্ম) মানদন্ডের বিচারেই সাহিত্যকে দেখতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে এই অনামী প্রাবন্ধিক দীনেশচন্দ্র সেনের পূর্বসূরী।

প্রবন্ধটিতে জ্ঞানদাসের ব্যক্তিগত জীবনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, বা তার সময়কাল সম্পর্কেও কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। এক কথায় তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ এটি একেবারেই নয়। বরং প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত আবেগের বহিঃপ্রকাশ এর মধ্যে অনেক বেশি ঘটেছে। প্রাবন্ধিক জ্ঞানদাসকে প্রথম শ্রেণির কবি রূপে মর্যাদা না দিলেও 'পদকল্পতরু' থেকে কয়েকটি পদ সংগ্রহ করে পদকর্তা জ্ঞানদাসকে বুঝতে চেয়েছেন। আধুনিকতাকে প্রাবন্ধিক মোটেও সুনজরে দেখেন নি, বরং প্রাচীন কবিদের

রচনার অনুসরণই পরবর্তী কবিদের উৎকৃষ্টতার পরিচায়ক, এমনটা তিনি মনে করেছেন।

'মনের মরম কথা, তোমারে কহি যে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনা আর কার নই।।'[২৩]

পদটি উদ্ধৃত করে, এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের মতামত -

'বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের রচনায় অপ্রাকৃত বর্ণনা দোষ তাদৃশ দেখা যায় না - ভারতচন্দ্রাদি আধুনিক কবিদিগের রচনায় সে দোষ লক্ষিত হয়। ''নিদ যাই মনের হরিষে'' শ্রাবণ রজনীতে, বৃষ্টির সময়ে ''কোকিল কুহরে কুতূহলে'' ''ডাহুকী সে গরজে'' এগুলি আধুনিক কবির লক্ষণ। আবার

''মরমে পৈঠল স্নেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী''।

এগুলি প্রাচীন কবির উক্তির ন্যায় শুনায়।'[২৪]

প্রাবন্ধিক জ্ঞানদাসের পদ সমূহে প্রচলিত বাংলার সাথে সাথে ব্রজবুলির মিশ্রণও প্রত্যক্ষ করেছেন এবং কেবলমাত্র বিদ্যাপতির এই ভাষাকে পরবর্তী কবিরা যে কেবল ভাষায় মাধুর্য বৃদ্ধির জন্যই ব্যবহার করেছেন, সে কথাও তিনি নিঃসংশয় চিত্তে জানিয়েছেন।

বলরাম দাস

'বলরাম দাস' নামক প্রবন্ধটি ১২৮০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিকের নাম এখানেও অস্বাক্ষরিত।[২৫] প্রচলিত বৈষ্ণব পদ কর্তাদের আলোচনা-সমালোচনা ছাড়াও অন্যান্য প্রায় অপরিচিত পদকর্তারাও বিভিন্ন পত্র-

পত্রিকার লেখকদের চর্চার মধ্যে দিয়ে জনমানসে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বলরাম দাস তেমনই একজন কবি, তাঁরও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত কোন পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধে পাই না। কিন্তু তাঁর বেশ কিছু পূর্ণ পদের উল্লেখ আমরা এই প্রবন্ধে পাই, যেমন -

'যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভাল সে কামিনী, দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে।.....'[২৬]

প্রবন্ধটিতে বলরাম দাস সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বেশি শব্দ খরচ করেন নি, কিন্তু যেটুকু তিনি বলেছেন তার ভিত্তিতে আমাদের অনুমান যে, পূর্বোক্ত 'জ্ঞানদাস' নামাঙ্কিত প্রবন্ধটি ও এই প্রবন্ধটি একই চিন্তা-ভাবনা সম্পন্ন ব্যক্তির রচনা। কারণ আধুনিক কবি সম্পর্কে এই প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিকের মনোভাব -

'যে অশ্লীলতা লালসার পুষ্টিকর, বলরামে তাহা নাই। তথাপি যাহা আছে, তাহা বলরামের সময় ও শিক্ষা, বিবেচনা করিয়া মার্জনা করিতে পারিলেও, আধুনিক কবির রচনায় তাহার মার্জনা করিতে পারি না। কোন আধুনিক লেখক এই প্রাচীন কবিদিগের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী না হয়েন।'[২৭]

চৈতন্য

'চৈতন্য' নামাঙ্কিত প্রবন্ধসমূহ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮২ বঙ্গাব্দে সর্বমোট পাঁচবার আটটি অধ্যায় সহ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আমরা যে প্রবন্ধটি নিয়ে কথা বলব, সেটি ফাল্গুন সংখ্যায় কেবল মাত্র অষ্টম অধ্যায় সহ প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিকের নাম শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস।[২৮] এই অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক চৈতন্যের গয়া থেকে গৃহে ফেরার পরের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মধ্যে আমরা

ছোট গল্পের আভাস লক্ষ করতে পারি। শুধু তাই নয়, এই প্রবন্ধ সমূহ পাঠে মনে হয় যেন প্রাবন্ধিক স্বচক্ষে নিজের সামনেই ঘটনা গুলি সংঘটিত হতে দেখছেন।

'ক্ষণেক পরে চৈতন্য বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, এবং প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন এজন্য লজ্জিত হইলেন। সে দিবস অধ্যাপনকার্য্য বন্ধ করিয়া সশিষ্যে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে আহ্নিক সমাপন করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। শচী অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! অদ্য কি বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেছিলে ? চৈতন্য বলিলেন -মাত! অদ্য কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে ছিলাম,.....'।[২৯]

কিন্তু সমস্যা হল এই যে ঠিক কোন কোন সূত্র বা উৎসকে অবলম্বন করে প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তা পরিষ্কার করে বলেন নি। পাদটীকায় তিনি যে সামান্য আভাস দিয়েছেন তার দ্বারা উৎসের বিষয়টি সম্পূর্ণ রূপে বোঝা যায় না। ফলে মনোগ্রাহী প্রবন্ধের মাঝেও প্রশ্ন রয়ে যায়। তৎকালীন ঐতিহাসিক সময়ের চমৎকার আলোচনা প্রথম প্রবন্ধটিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতি

'বিদ্যাপতি' নামক প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।[৩০] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দ্বারা একজন গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রথম প্রকাশ করেছেন যে বিদ্যাপতি একজন মিথিলাবাসী ও মৈথিলি কবি, যদিও তাঁর ওপর বাঙালিদের ভালোবাসার দাবী থাকবেই কারণ বিদ্যাপতির হৃদয়ে বাংলা দেশ বিরাজ করে। প্রবন্ধটি ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হলেও এর রচনাকাল সম্পর্কে প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন - 'এ সময়ে শকাব্দ ১৭৯৭ ও খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৪ বর্ষ বহমান'।[৩১]

প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক বিদ্যাপতির মিথিলাবাসী হওয়া সম্পর্কে ক্রমানুসারে যে প্রমাণ গুলি উদ্ধৃত করেছেন, আমরা সেই প্রমাণ গুলিই প্রাবন্ধিকের জবানিতে এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, এই প্রবন্ধটি প্রকাশের আগে পর্যন্ত অধিকাংশ বাঙালিই বিদ্যাপতিকে স্বগোত্র এবং স্বজাতি মনে করে তাঁর কীর্তির, ভাষার জয়গান ঘোষণা করতেন। কিন্তু এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পরে সেই সমীকরণ উল্টে যায়। অর্থাৎ এবার থেকে চন্ডীদাস কাছে ও বিদ্যাপতি দূরে যেতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদের এও এক আশ্চর্য নমুনা।

বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে তথ্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে তা নিম্নরূপ -

‘(১) মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে এবং ঐ সকল গীতের ভণিতায় রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লছিমা দেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

(২) মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লছিমা দেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন, ইহা পঞ্জীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়।

(৪) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা দেশে নাই।

(৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বীসপী গ্রাম দান পাইয়া ছিলেন; দানপত্র অদ্যাপি বর্তমান আছে; এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্তগ্রাম ভোগ-দখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন।

(৬) বিদ্যাপতির হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তদ্বংশীয় দিগের নিকটে মিথিলায় দেখা যায়।

(৭) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলায় আছেন।

(৮) বিদ্যাপতি লিখিত পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না।

(৯) এই সকল পুস্তকে তৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

(১০) বিদ্যাপতি-রচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; অঙ্গণাগণের ঘ্রান বিষয়ক উদ্ধৃত গীতদ্বয়ের তুলনা করিয়া দেখিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না।

এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলিতে না চাহেন, তাঁহার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।'[৩২]

ভারতী

বিদ্যাপতি

বাংলা পত্র-পত্রিকায় 'মধ্যযুগ' চর্চায় 'বিদ্যাপতি' নামক প্রবন্ধটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়।[৩৩] পত্র-পত্রিকায় যে কোন বিষয়ে চর্চার জন্য মূলত গদ্যকেই প্রধান মাধ্যম রূপে নির্বাচন করা হত। কিন্তু 'শ্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী'-র রচিত (সম্ভবত ছাপার ভুলে এমন হয়েছে, যদিও সূচিপত্রে শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী-ই উল্লিখিত হয়েছে) 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি বিদ্যাপতি সম্পর্কে প্রশস্তি মূলক পদ্য রচনা। রচনাটির নমুনা এই রকম -

'পশিলে তোমার অন্তঃপুরে,
রৌদ্রেদগ্ধ দিবাচয়, হয়ে যায় শ্যামময়,
বসিয়া হোথায় শ্যাম সরোবর তীরে।
শীকর সম্পৃক্ত বায়শীতলিয়া যায় কায়
-হৃদয় কমলগন্ধ নাসারন্ধ্রে ঘিরে;
আঘ্রাণিয়া জাগে হিয়া হৃদয়-কুটীরে।

দেখাইয়া শত পথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
পবিত্র তীর্থের সাথী হেন আর কে রে,
চল নিরখিতে শ্যামে যমুনার তীরে।
এল এল মধুমাস, কাজ নাই বেশ বাস,
আঁকা সে মধুরহাস প্রতি শিরে শিরে!
চল নিরখিব শ্যামে যমুনার তীরে!
এখনো আহির নারী লইয়া গাগরি ঝারি,
শ্যাম প্রতিবিম্ব তথা হেরে শ্যাম নীরে!.....'[৩৪]

কবি কৃত্তিবাস

'কবি কৃত্তিবাস' নামক প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক শ্রী বীরেশ্বর গোস্বামী।[৩৫] প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন- 'আজকাল আমাদের দেশে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দোলন চলিতেছে।.....আশা করি বাঙ্গালীর অন্যান্য কার্য্যানুষ্ঠানের ন্যায় ইহারও যেন কেবল আন্দোলনেই উপসংহার না হয়।[৩৬] প্রবন্ধটির প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ যে লেখাটি কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি কৃত্তিবাসের সাথে অন্যান্য কবিদের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাটি মুগ্ধ পাঠকের জবানিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত যে, বাংলা সাহিত্যে এই যে তুলনামূলক পাঠের ভাবনা, তার আমদানি ইংরেজি সাহিত্য থেকে। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত যে বই-পত্র গুলি মোটামুটি ভাবে ঊনবিংশ শতকে বর্তমান ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য Taine -এর 'History of English Literature' -বইটির দ্বিতীয়

খন্ডে মিল্টন প্রসঙ্গে আলোচনায় Taine -এর তুলনামূলক পাঠের পরিচয় পাওয়া যায় এবং বর্তমান প্রাবন্ধিকও সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ, ও বইটির উল্লেখ এখানে করেছেন।[৩৭] এই তুলনামূলক পাঠের পরিচয় প্রাবন্ধিক দিয়েছেন এই ভাবে -

'একদিকে বৈষ্ণব কবিদের উচ্ছৃঙ্খল ভাবপ্রবণতা, অপর দিকে ভারতচন্দ্র, কাশীদাস প্রভৃতির কৃত্রিমতার মধ্যে কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস। এজন্য কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস, বিশেষতঃ শেষোক্ত কবিতে বৈষ্ণব কবিদের গভীরতা ও ভারতচন্দ্রের কবিতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।'[৩৮]

বাংলা দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীনকাল থেকেই বহমান। রামায়ণে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও পরোক্ষে উক্ত দ্বন্দ্বের একটা আভাস আমরা লক্ষ করতে পারি। এবং এই দ্বন্দ্ব প্রকাশের মধ্যে দিয়ে কৃত্তিবাসের কবি প্রতিভার বিকাশও লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের অনুলিপি করণে প্রবৃত্ত হন নি, সেই কারণে-

'উমার জন্ম কথা, তপস্যা, ও মদনভস্ম ইত্যাদি মূলে আদিকান্ডে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাস এ সব কথার আদৌ উল্লেখমাত্র করেন নাই। বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্টের কলহ, বিশ্বামিত্রের তপস্তেজঃ, ত্রিশঙ্কুর কথা মূলে আদিকান্ডে আছে। কিন্তু কৃত্তিবাস এ সকল কথা পরিত্যাগ করিয়াছেন।'[৩৯]

কৃত্তিবাস নিজে রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন বলেই কি এমন ঘটনা সম্ভব হয়েছে? আমরা সঠিক জানি না।

সম্পূর্ণ রামায়ণ কৃত্তিবাস একা অনুবাদ করেছেন এমন প্রমাণ খুব একটা পাওয়া যায় নি, বরং সময়ের সাথে সাথে আরও অন্যান্য কবিদের লেখনী কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উত্তরকালে কৃত্তিবাসের নামেই প্রচলিত হয়ে চলেছে এমনটাই অনুমান। তাই দেখা যায় আদিকান্ডের যে ঘটনা কৃত্তিবাস পরিত্যাগ করেছেন, পরবর্তীকালে তেমনই আর এক ঘটনার সংযোজন ঘটেছে কৃত্তিবাসের রামায়ণে।

‘শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন ও দুর্গোৎসব ও নীল পদ্মের স্থানে দেবীর চরণে স্বীয় নীল নলিনের উৎসর্গ কথা মূলে আদৌ নাই -কৃত্তিবাস এ কথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন।.....অথচ মূলে রাবণ বধার্থ অগস্ত্যমূনি শ্রীরামচন্দ্রকে সূর্যস্তব পাঠ করিতে উপদেশ করার কথা বর্ণিত আছে।’[৪০]

মূলের অনুসরণ না করা যে সবসময় ভীষণ উৎকৃষ্টতার পরিচয় বহন করেছে তা নয়, কখনো কখনো তা প্রশ্ন চিহ্নের সামনেও কবিকে এনে দাঁড় করিয়েছে। হিন্দি সাহিত্যের কবি তুলসীদাসের সাথে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ভাবনার একটি তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এই প্রবন্ধেই সম্ভবত; সর্বপ্রথম লক্ষ করি।

‘উভয়ের কাব্য পাঠে আমাদের বোধ হয় যে তুলশী দাস কৃত্তিবাস অপেক্ষা সুপন্ডিত ও অশেষ শাস্ত্রবিৎ ছিলেন। কৃত্তিবাস প্রধানতঃ কেবল মূল রামায়ণ ও স্বীয় কল্পনার উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। তুলসী দাস অনেক শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া নিজের কাব্যামৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন।’[৪১]

কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন

‘কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন’ নামক প্রবন্ধটি মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্রে মোট তিনটি সংখ্যায় ১৩০১ বঙ্গাব্দের ‘ভারতী’তে প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল।[৪২] রামপ্রসাদের বহু প্রচলিত পদের উল্লেখ এই প্রবন্ধ সমূহে পাওয়া যায়, যার অধিকাংশই সমকালে ও আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাধক রামপ্রসাদ তাঁর সম্পূর্ণ জীবন তাঁর ইষ্টের চরণে অর্পণ করে কি ভাবে নির্ভরতার পরিচয় দিয়েছেন, তার উল্লেখ তাঁর নিজের রচিত একটি পদেই পাওয়া যায়।

‘আমি কি মা দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই।।

আগে পাছে দুঃখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই।

তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে মা দুঃখ দিয়ে বাজার মিলাই।।[৪৩]

কিন্তু রামপ্রসাদের গীত সমূহকে কেবল ধর্ম ভাবনায় সীমাবদ্ধ রাখলে, তার রসহানি ঘটে। পৌত্তলিকতার প্রতি আস্থা প্রদর্শনের সঙ্গে মুসলিম ধর্মের অপৌত্তলিক ভাবনাকে তুলনা মূলক ভাবে নেওয়া সঠিক নয়। উভয় ধর্মই আলাদা আলাদা দর্শন থেকে সমাজে অবস্থান করে। তাই এই সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে শারীরিক যোগাভ্যাসের বর্ণনা ও রামপ্রসাদের গানে সুলভ।

'কালী কালী বল রসনারে।

ঐ ষটচক্র রথ মধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে।'[৪৪] ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের পদ গুলিকে কেন্দ্র করে তাঁর সাধক জীবনের সমকালীন সময়ের অনেক ঘটনার, বিশেষ করে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিত্র প্রকাশ পায়। কেবল তাঁর পদ সমূহই নয়, তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটিও সমকালীন সমাজের এক অনন্য নিদর্শন। প্রাবন্ধিক এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-

'আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তৎকালের রুচির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর খানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে ও ভারতের বিদ্যাসুন্দরে অনেক প্রভেদ। ইহাতে সকলেই ধর্ম্মভীরু ও কালীভক্ত কিন্তু ভারতের বিদ্যাসুন্দরে কলিকাল অঙ্কিত-সকলেই সুচতুর, শীঘ্র যে কেহ ঠকাইয়া যাইবে তাহার যোটী নাই। ফলতঃ প্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং ভারতের বিদ্যাসুন্দর ধুর্ত্তের বাক্য ছটা বই আর কিছু নহে।'[৪৫]

মালিক মহম্মদের পদ্মাবত
এবং
আলোয়াল কৃত অনুবাদ

'মালিক মহম্মদের পদ্মাবত' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, প্রাবন্ধিক শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন।[৪৬] প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক লিপিকরের প্রমাদ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

'যে পুঁথি দৃষ্টে আলোয়াল অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই পুঁথির লিপিকার মহাশয়ও ৯৪৭ সালের স্থলে ৯২৭ সাল লিখিয়াছিলেন; সুতরাং এই ভ্রম আধুনিক মুদ্রাকরণের নহে, বহুপূর্ব্বে পুঁথি লেখক গণ ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।'[৪৭]

দীনেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য সমালোচনার একটা মস্ত বড় দিক এই যে, তিনি যে কোন রচনাকেই, তা সে উৎকৃষ্ট হোক বা না হোক, নিজস্ব ধর্মীয় দর্শনের নিরিখে পরিমাপ করতে চেয়েছেন। যেমন, 'পদ্মাবতী' কাব্যটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন -

'হিন্দুভাবাপন্ন কাব্যখানি ২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী মুসলমান মার্জ্জিত এবং সংস্কৃতাত্মক সুললিত পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।'[৪৮]

মৌলিক কাব্য হোক বা অনুবাদ কাব্য, যে কোন কাব্যের পরিচয় বা বিশ্লেষণ তার গুণাগুণের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত, রচয়িতার ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসের নিরিখে নয়।

তবে একথা ঠিক যে তথ্যানুসন্ধানের প্রতি প্রাবন্ধিক বরাবরই মনযোগী ছিলেন। সমকালের এবং আজকের নিরিখে, তার গুরুত্ব অপরিসীম।

'মালিক মহম্মদের নিবাসভূমি অযোধ্যার অন্তর্গত জয়সগ্রাম, এজন্যই তাঁহাকে আমরা 'মালিক মহম্মদ জয়সী' উপাধি বিশিষ্ট দেখিতে পাই।.....ইহার কবিত্ব ও উন্নত আদর্শ সম্বন্ধে গ্রীয়ারসন সাহেব লিখিয়াছেন, ''মালিক মহম্মদের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল, এই মুসলমান সাধুর রচনায় হিন্দুগণের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত সুগভীর সহানুভূতি ও প্রীতির ভাব পরিদৃষ্ট হয়।''[৪৯]

প্রাবন্ধিক দীনেশচন্দ্র সেন বিশ্বাস করতেন যে জায়সীর রচনার বেশ কিছু অংশে হিন্দু দর্শনের, বিশেষ করে বেদান্তের ছাপ রয়েছে, এবং এর কারণ সম্পর্কে জায়সীর হিন্দু পন্ডিতের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ণের ঘটনার উল্লেখ তিনি করেছেন।[৫০] কিন্তু সমস্যা এই যে, যেখানে যেখানে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে রচনাশৈলী উৎকৃষ্ট, সেখানেই তিনি হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু দর্শনের ছায়া আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু যেখানে তা হয়নি, সেখানেই প্রাবন্ধিক জায়সীকে মুসলমান ভাবাপন্ন বলে হীন জ্ঞান করেছেন।

'মুসলমান কবির হস্তে পদ্মিনীর সতীমূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া উঠে নাই, - পদ্মিনী সাধারণ ভাবে প্রশংসার্হ চরিত্র শালিনী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে হিন্দুর আদর্শ সতীত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই।'[৫১]

'কবি হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিশেষ রূপে পরিচিত ছিলেন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি উদার অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুগৃহললনার যে ভীরুতা, যে লজ্জা, যে চরিত্রের বল, যে আত্মত্যাগ লোকচক্ষুর অন্তরালে বন ফুলের ন্যায় অতি সংগোপনে বিকাশ পায়, সেই ছবিটি বোধহয় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিবার যথেষ্ট সুবিধা হয় নাই। বিশেষ সেই সময়ের রাজপুত কন্যা, যাঁহারা পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে পুড়িয়া সতীত্বের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই জগৎ বিখ্যাত ললনা কুলের শীর্ষ স্থানীয় পদ্মিনীর উচিত মর্য্যাদা কবি রক্ষা করিতে পারেন নাই।'[৫২]

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর প্রবন্ধে জায়সীর পাশাপাশি আলাওল -এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন এবং উভয়ের রচনার নমুনা পাশাপাশি বসিয়ে একটি তুলনা টানবার চেষ্টা করেছেন। বলতে দ্বিধা নেই উভয় কবিই তাঁদের নিজেদের জায়গায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। প্রবন্ধের শেষ লাইনে প্রাবন্ধিকের বিখ্যাত হিন্দু-বৌদ্ধ ভাবনার নজির মেলে -

'পাঠক কাব্যকথা ছাড়িয়া দিলেও বৌদ্ধদিগের প্রভাব এবং অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিকতত্ত্ব সূচক প্রসঙ্গ পদ্মাবত কাব্যে প্রাপ্ত হইবেন।'[৫৩]

কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা

'কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা' নামক প্রবন্ধটি ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক শ্রী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।[৫৪] প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক সর্ব মোট দশটি প্রমাণের দ্বারা কাশীদাস যে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন সেইটি বোঝাতে চেয়েছেন। প্রত্যেকটি প্রমাণ যথেষ্ট দীর্ঘ হওয়ায় আলাদা করে আমরা সেগুলি আর উল্লেখ করলাম না। কিন্তু এরই মধ্যে যে বিষয়টি আকর্ষণীয়, তা হল প্রাবন্ধিকের 'পাঁচালি' সম্পর্কিত বক্তব্যটি। পঞ্চম প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক 'পাঁচালি' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যটি অবশ্যই যথেষ্ট বিতর্কিত। তবে যে কোন বিতর্কেরই একটা উৎস থাকে। এই রচনাটিকে তারই উৎস বলে অনুমান করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা আলাদা করে আর কোন মন্তব্য করতে চাই না। কেবল সেই সময়ের তথ্যের গুরুত্বের দিক দিয়ে লেখাটি উদ্ধৃত করলাম।

'বাঙ্গালার ''পাঁচালী'' এইরূপ বানান করা হয় কিন্তু কথাটা 'পাঁচালী' নহে- পাঁচালি। পশ্চিমবঙ্গে (রাঢ়দেশে) এই কথার উৎপত্তি, পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চারণ দোষে সংস্কৃত পঞ্চশব্দ পাশ্ এবং পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ বলিয়া উচ্চারিত হয়।..... কাশীদাসের পূর্ব্বে ও তাঁহার সময়ে বারোয়ারীর লোকেরা পাঁচালি বলিয়া গণ্য হইত। ইহারা ছড়া গাহিত, সং সাজিয়া নাচিত ও তামাসা করিত, তর্জ্জা ও ঝুমুরের মত পয়ারছন্দে গালাগালি করিত, কিন্তু পাঁচালি গ্রন্থ লেখে নাই, অথবা দাশু রায়ের মত পাঁচালি প্রথাও তাহারা জানিত না। পাঁচালি বলিয়া কোন পুস্তক সে সময়ে ছিল না, তাহাদের অধিকাংশ ছড়া পয়ারে মুখে মুখে বিরচিত হইত, এবং তাহাই গান করা হইত। তখন এইরূপ পাঁচালি ছিল। ক্রমে উহা ''পাঁচালী'' নামে আখ্যাত হইয়া পুস্তকাকারে আসিয়া পৌঁছিল এবং উহার প্রথা পরিবর্তিত হইল। রাঢ়দেশে এখনও ঐরূপ গাওনা আছে, তাহার নাম এখনও পাঁচালি, তাহাদের পুস্তক নাই, মুখে কেবল কবিতা অভ্যাস করা আছে, কিন্তু তাহাদের রুচি অনেক সময়ে বিকৃত হইলেও রচনা ও ভাষায় তাহাদের যোগ্যতার

পরিচয় পাওয়া যায়। দাশরথী রায় ইহাদের ''ধরণ'' অনুকরণ করিয়া পাঁচালী নাম দিয়াছেন, পাঁচালী শব্দ ভাল বাঙ্গালা নহে, ইহা রাঢ়দেশের প্রকৃত ''পাঁচালি'' শব্দ। ইহারা মহাভারত জানিত না এবং গাহিত না; এখনও গায়না এবং কখনও গায় নাই। কাশীদাস ইহাদের মুখে মহাভারত শুনেন নাই, ইহাদের পয়ার ছন্দে এবং অন্যান্য ছন্দে মহাভারত রচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের ভাষার অনুকরণ করিয়া নিজের মহাভারত মধ্যে সেইরূপ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন।''[৫৫]

সাহিত্য

মুকুন্দরাম

'সাহিত্য' পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে 'মুকুন্দরাম' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি থেকে লেখকের নাম জানা যায় নি।[৫৬] অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রাবন্ধিক মুকুন্দরাম সম্পর্কে নিজ বক্তব্য পেশ করেছেন। তথ্যের দিক দিয়ে এই প্রবন্ধে অভিনবত্ব কিছু নেই। অভিনবত্ব রয়েছে প্রাবন্ধিকের মুকুন্দরামের রচনা পাঠে। প্রবন্ধের একেবারে শেষে এসে প্রাবন্ধিক তাঁর পাঠের যে নজির পেশ করেছেন তা প্রায় নতুন।

'আমরা খুল্লনার কথা ভাবি, আর Wordsworth এর White doe of Rylstone এর কথা মনে পড়ে। কবিকঙ্কণের গান কত দিন থামিয়া গিয়াছে; কিন্তু কোন পরীর দেশ হইতে, কোন বসন্ত সমীরণের বিরহকুঞ্জ হইতে, যেন একটা মোহের আবরণ আসিয়া অজয়ের উপর পড়িয়াছে। আমরা ''চন্ডী'' পড়ি, বসন্তবর্ণনায় বিদ্যাপতির কলকণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই; মদনদহনে বা রতিবিলাপে, আমরা কালিদাসের প্রতিকৃতি দেখি। আমরা কবিকঙ্কণ পড়ি, আর প্রাচীন বাঙ্গালার কত সুখস্বপ্ন যেন আমাদের দেহ স্পর্শ করে! -বাঙ্গালার সরস্বতীতে তখন সাততাল প্রমাণ

জল থাকিত; এ দেশের বসন্তের বাতাসে তপস্বীরা পীড়িত হইত! কবিকঙ্কণ চলিয়া গিয়াছেন - বাঙ্গালার সরস্বতীর প্রবাহও ভিন্ন পথে ছুটিয়াছে।'[৫৭]

নরোত্তমের রাধিকার 'মানভঙ্গ'

শ্রী আবদুল করিমের 'নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ' শীর্ষক রচনাটি 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩০৭ বঙ্গাব্দের পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৫৮] রচনাটির মূল বিষয় হল -শ্রীকৃষ্ণ একদিন চন্দ্রাবলীর বাড়িতে রাত্রিযাপন করেছিলেন, সেই কারণে রাধিকার মান, অবশেষে যোগীবেশে কৃষ্ণের রাধিকার কাছে উপস্থিতি এবং তার 'মানভঞ্জন'।[৫৯] উক্ত বিষয়টিই কাব্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। রচনাটিতে মূলত রাগরাগিণীর উল্লেখ নেই, কেবল পরিশেষে দুটি সঙ্গীত ছাড়া। দেবস্তুতিরও চরম ঘটা পরিলক্ষিত হয় না।[৬০]

বৃন্দাবনী ভাষার প্রভাব সমন্বিত, আধুনিক ভাষার শব্দ চিহ্ন যুক্ত, (যেমন - হবে, যাব, বসেছে ইত্যাদি) এবং ছন্দের মাত্রা বিপর্যয় ঘটিত[৬১] এই কাব্যের মাত্রা বিপর্যয় যে কেবল সচেতন ভাবেই সংঘটিত তা নাও হতে পারে। আমাদের অনুমান, লিপিকারেরাও এই মাত্রা বিপর্যয়ে অনুঘটকের কাজ করেছেন। প্রাবন্ধিকের কাব্য পাঠের কৃতিত্ব ছাড়াও আরও একটি কৃতিত্ব এই যে, 'রাধিকার মানভঙ্গ' শীর্ষক পুথিটি যে তাঁকে তাঁরই এক ছাত্র, আনোয়ারা নিবাসী শ্রীমান শশি কুমার নন্দী সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন তা তিনি স্বীকার করেছেন।[৬২] প্রাবন্ধিক কবি এবং তাঁর সৃষ্ট রাধিকা চরিত্র সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে মন্তব্য করেছেন, সেটি উদ্ধৃত করেই আমরা লেখার উপসংহার করব।

'এই মহাত্মার লেখনী যেন অবিশ্রান্ত মধু বর্ষণ করিয়াছে। এত পুরাতন কাব্য হইলেও তাঁহার রচনা নৈপুণ্যে কোথাও ইহা শ্রুতিকর্কশ কি দুর্ব্বোধ্য হয় নাই। সরল,

সহজ, অনাড়ম্বর অথচ গুরু গম্ভীর রচনা পাঠমাত্রেই পাঠকের হৃদয় অধিকার করে। অর্থ প্রতীতি কি ভাবপরিগ্রহের জন্য পাঠককে কোথাও এক মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব করিতে হইবে না। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ আপনা-আপনি তরলজলবৎ হৃদয়গত হইয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য নব্য সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।.....কাব্যজগতে শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ মূর্ত্তিমতী সরলতা দিয়ে গঠিত, তাঁহার প্রেমলীলার বর্ণনাতেও সেইরূপ সরলতা অনুসৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই গ্রন্থে কবি যেন লেখনীমুখে রাধিকারই সেই প্রেমবিহ্বল, অভিমানস্ফীত চপল হৃদয়ের কথাগুলিই ব্যক্ত করিয়াছেন। তখন লেখকের আত্মজ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার চিত্রগুলি কেবল জীবন্ত! কেমন উজ্জ্বল! লেখক নিজে আত্মসংযমী সংসার বিরাগী ছিলেন; নিজের এরূপ পান্ডিত্যাভিমান ত্যাগ তাঁহারই উপযুক্ত।'[৬৩]

চৈতন্য ভাগবত

'চৈতন্য ভাগবত' নামক প্রবন্ধটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক-সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং প্রাবন্ধিক ছিলেন শ্রী রজনীকান্ত চক্রবর্তী।[৬৪] প্রবন্ধটিতে চৈতন্যভাগবতের গুণাগুণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। পাশাপাশি মোক্ষম দুটি তথ্য প্রাবন্ধিক আমাদের দিয়েছেন।

প্রথমত ঃ-

'যে গ্রন্থ চৈতন্যদেবের যত পরবর্ত্তী, তাহাতে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা তত অধিক; এই জন্য চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা চৈতন্যচরিতামৃতে অলৌকিক বর্ণনা অধিক।'[৬৫]

দ্বিতীয়ত ঃ-

'বৈষ্ণব সাহিত্যপাঠে বঙ্গদেশের চারিশত বৎসর পূর্ব্বের সামাজিক অবস্থা উত্তম রূপে জানা যায়, কিন্তু শাক্ত সাহিত্য পাঠে বাঙ্গালার কোন সময়ের অবস্থাই জানা যায় না। বৈষ্ণব মহাজন দিগের অনেক কথাই আমরা জানিতে পারি, কিন্তু শাক্ত সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের ন্যায় ব্যক্তির বিষয়ও অল্পই জানা যায়।.....বাঙ্গালার বৈষ্ণবতীর্থ গুলি এখন সজীব আছে, কিন্তু বাঙ্গালার শাক্ততীর্থ মেহার, ক্ষীরগ্রাম, নলহাটী, চন্ডীপুর ও পাতালচন্ডীর নাম অল্প লোকেই জানে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি বাঙ্গলার বৈষ্ণবদের সমাজ, সাহিত্য ও আচার ব্যবহারের আলোচনা করেন, কিন্তু শাক্তদের বিষয় পরিত্যাগ করিলে যে তাঁহার ইতিহাসের অর্দ্ধেক অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা ভাবিয়া দেখেন না।'[৬৬]

মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী

'মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী' শীর্ষক রচনাটির প্রণেতা স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়। রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা; চৈত্র ১৩০৮ বঙ্গাব্দে।[৬৭] চৈতন্য ও চৈতন্যকেন্দ্রিক লেখালেখি পত্র-পত্রিকায় বেশ পরিমাণে হয়েছে, সেই দিক থেকে দেখলে এই রচনাটি ব্যতিক্রম। এখানে বক্তব্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু চৈতন্য নন, বরং তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরী ও তাঁরও গুরু মাধবেন্দ্রপুরী। প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন -

'ঈশ্বরপুরী নিজে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকটেই ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত ও অন্ধকারাবৃত। তবে তিনি যে এক জন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যে সকল গল্প রচিত হইয়াছে, তাহা তেই তাহা বুঝা যায়।.....মাধবেন্দ্রের জীবনের গল্প-মিশ্রিত ইতিহাস চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।'[৬৮]

'মাধবেন্দ্রপুরী শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠাপিত পুরী নামক সম্প্রদায় বিশেষের এক জন সন্ন্যাসী ছিলেন। জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞানে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভই এই সন্ন্যাসীদের সাধন ভজনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মাধব তাদৃশ উদ্দেশ্য অসার ও নীরসবোধে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইয়াছিল। অদ্বৈতবাদ-মূলক ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার বিবেচনায় শুষ্ক বোধ হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি কৃষ্ণের চরিত্রে তদপেক্ষা চিত্তাকর্ষক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন।.....আপন সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ মত পরিত্যাগ করায়, মাধবকে একজন স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।'[৬৯]

সাধনা

মহাকবি কৃত্তিবাস

'মহাকবি কৃত্তিবাস' নামক প্রবন্ধটি ১৩০১ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সাধনার সম্পাদক ছিলেন শ্রী সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধের লেখক শ্রী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।[৭০] প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন -

'সম্প্রতি সংবাদ পত্রে রামায়ণ রচয়িতা কবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের কালনির্ণয় সম্বন্ধে লেখকের সিদ্ধান্ত সমীচীন বোধ না হওয়ায়, আমরা তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।'[৭১]

প্রবন্ধটিতে বর্তমান প্রাবন্ধিক কৃত্তিবাসের সঠিক সময় নিরূপণ করতে গিয়ে সাল-তারিখ এবং কৃত্তিবাসের পরিবার পরিচিতি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে যে বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা করেছেন, বলা বাহুল্য পরবর্তীকালে তা কৃত্তিবাসের উপযুক্ত সময় নির্ধারণে সহায়ক হয়েছে। প্রাবন্ধিক যে সময়কালকে প্রায় সঠিক রূপে বিবেচনা

করেছেন, পরবর্তীকালে তার সঙ্গে প্রায় অনেকেই সহমত হন নি। প্রাবন্ধিকের অনুমান-

'১৪৬৫ শকে দেবীবর কৌলীন্য সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ইহার কিছু দিন পরে, অন্ততঃ ১৪৮০ শকে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।'[৭২]

লক্ষণীয় বিষয় আরও একটি যে কৃত্তিবাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কোথাও তাঁর অনুবাদ মুন্সীয়ানা বা 'রামায়ণ' নিয়ে প্রাবন্ধিক প্রায় কিছুই বলেন নি। মূলত তাঁর ভাবনা কৃত্তিবাসের সময়কাল এবং বাংলার আদি গ্রন্থকারের স্বরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বল্প দৈর্ঘ্যের সাধু ভাষায় লিখিত এই প্রবন্ধে পরিশেষে প্রাবন্ধিক নিজের মত করে আদি কবির স্থান নিরূপণ করেছেন।

'ইতিহাসাভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন, বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস বাঙ্গালার আদি কবি ও আদি লেখক হইলেও তাঁহারা কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহাদিগকে গীত রচয়িতা বলা যাইতে পারে। ইহাঁদিগের সমসাময়িক গুণরাজ খাঁন উপাধিযুক্ত মালাধর বসুই বাঙ্গালার আদি কবি এবং তৎপ্রণীত ''শ্রীকৃষ্ণবিজয়'' গ্রন্থই বঙ্গভাষার আদিকাব্য। ১৩৯৫ শকে আরব্ধ হইয়া ১৪০২ শকে কাব্য রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল।.....মালাধর বসু চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নিঃসংশয় রূপে বাঙ্গালার আদিকবি।'[৭৩]

বিদ্যাপতি সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের অনুসন্ধান সর্বাংশে উত্তম ছিল না, কারণ ১২৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতির পদ ছাড়াও তাঁর রচিত গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তবে একথা ঠিক যে সেগুলি বাংলায় রচিত হয় নি।

নব্যভারত

চন্ডীদাস

'চন্ডীদাস' নামক প্রবন্ধটি 'নব্যভারত' পত্রিকায় ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক-শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র রায়। সূচিপত্রে প্রাবন্ধিকের নামের পাশে তাঁর সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা 'এম.এ.' লেখা রয়েছে।[৭৪] প্রবন্ধটি চন্ডীদাস সম্পর্কিত দুটি কাব্য সংগ্রহের তুলনামূলক আলোচনা। দুটি কাব্য সংগ্রহের প্রণেতা অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং বাবু রমণী মোহন মল্লিক।[৭৫] রচনাদুটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিরীক্ষণ করে প্রাবন্ধিকের মতামত -

'দুইখানি গ্রন্থের তুলনা করিয়া বোধ হইল, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণ দেখিয়া এ গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা ইহাতে প্রায় একশত পদ অধিক সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু পদগুলির পাঠ ও সজ্জা দেখিয়া বোধ হইল, যেখানে পথ পাইয়াছেন, রমণী বাবু সেইখানেই মহাজন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে পাঠান্তর লক্ষিত হইয়াছে। .....আশ্চর্যের বিষয় এই, বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকারের গ্রন্থে যে পাঠ অশুদ্ধ আছে, রমণী বাবুর গ্রন্থেও সেই অশুদ্ধি জন্মিয়াছে।.....তাঁহার গ্রন্থে অক্ষয় বাবুর সঙ্কলন অপেক্ষা প্রায় একশত (৯৮) পদ অধিক আছে। এ কয়েকটী পদ নূতন সংগ্রহের জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকগুলি অন্য কবির পদ আছে। সংগ্রহে আর একটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। খন্ডিতার পদ রসোদগারে, রসোদগারের পদ বিপ্রলব্ধায়, এইরূপ কয়েকটী পদ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে।.....আমরা গীতচন্দ্রোদয় হইতে পাঁচটী নূতন পদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলাম। তাঁহার আবশ্যক হইলে অন্য অনেকগুলি ভবিষ্যতে দিতে পারিব।[৭৬]

রূপ ও সনাতন গোস্বামী

'রূপ ও সনাতন গোস্বামী' নামক প্রবন্ধটি ১৩০১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'নব্য ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি শ্রী দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী দ্বারা সম্পাদিত। প্রাবন্ধিক শ্রী উমেশচন্দ্র বটব্যাল।[৭৭] প্রবন্ধটিতে রূপসনাতন সম্পর্কে যে তথ্য ও মন্তব্য পেশ করা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে একাধিক প্রতিবাদী লেখা প্রকাশিত হয়েছে, অন্তত এই পত্রিকাতেই তার দুটি উদাহরণ আছে। কারা এই প্রতিবাদ করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে প্রাবন্ধিক তাঁর লেখায় ঠিক কি কি বিষয় বলেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ গুলি তাঁর মত করেই উদ্ধৃত করছি।

প্রথমত ঃ-

'রূপ সনাতন কোন্ জাতীয় লোক ছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সন্তান। কেহ বলেন, তাঁহারা মুসলমানের সন্তান। কেহ বলেন, তাঁহারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু মুসলমান রাজসরকারে চাকুরি করার সময় মুসলমান হইয়াছিলেন।'[৭৮]

দ্বিতীয়ত ঃ-

'দুই ভ্রাতার মধ্যে কে বড়, কে ছোট, এ বিষয়েও মতামত দেখা যায়। কবি কর্ণপূর, যিনি সনাতনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সনাতনের কথা এইরূপ লিখেন -

গৌড়েন্দ্রস্য ধভাবিভূষণ মণিস্ত্যক্তা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং।
''রূপস্যাগ্রজ এব এষ তরুণীং বৈরাগ্য লক্ষ্মীং দধে।''

ইত্যাদি।

ইহাতে সনাতনকে রূপের অগ্রজ বলা হইয়াছে। কিন্তু চরিতামৃতে যেখানে হুসেন সাহ সনাতনকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, -

''তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সর্ব নাশ।''

এখানে রূপেরই কথা হইতেছে বলিয়া বুঝা হইয়া থাকে। তাহা হইলে চরিতামৃতের মতে রূপই জ্যেষ্ঠ। ফলতঃ আমি এই মত দ্বৈধের মীমাংসায় সক্ষম নহি।'[৭৯]

তৃতীয়ত ঃ-

'চৈতন্যের অনুচরবর্গের মধ্যে কেবল তিন জন জগন্নাথের মন্দিরের ভিতরে যাইতেন না, হরিদাস, রূপ ও সনাতন। ইহাতে হরিদাসের ন্যায় রূপ সনাতনও যে একদা যবন ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট জানা যায়।'[৮০]

চতুর্থত ঃ-

'যে রাজানুগ্রহের কুহকে পড়িয়া তাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন সেই রাজানুগ্রহ হারাইলেন, তখন অনুতাপ হইবারই কথা। জাতিও গেল পেটও ভরিল না! রূপ দন্ডভয়ে গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন, সনাতন কারারুদ্ধ হইলেন। কি জন্য তাঁহারা রাজার বিষনয়নে পতিত হয়েন, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই।'[৮১]

পঞ্চমত ঃ-

'বৈষ্ণবেরা বিবেচনা করেন যে, কেবল বৈরাগ্য বশতই রূপসনাতন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন। ইহা প্রকৃত বিবেচনা হয় না। চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহাদের বিষয় ত্যাগের যেরূপ বিবরণ আছে, তাহা অসংলগ্ন বোধ হয়। প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইলে

একখানা কৌপীন পরিধান করিয়া বাহির হইয়া গেলেই হয় ; তাহার জন্য বড় ভাবনা চিন্তা বা ফন্দী ফিকির করিতে হয় না। রূপসনাতনের স্পষ্টই তাদৃশ বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই।'[৮২]

<u>ষষ্ঠত</u> ঃ-

'বৈরাগী হইয়া পলায়নের সম্বল স্বরূপ সনাতন দশ হাজার মুদ্রা রাখিলেন ! - স্বর্ণ না রৌপ্য মুদ্রা তাহা লেখা নাই। রৌপ্য হইলে ও তখনকার দশ হাজার এখনকার অন্যূন সার্দ্ধ লক্ষ। ইহা বৈরাগীর উপযুক্ত পুঁজি বটে। ..... রূপ যে বহুতর অর্থ লইয়া গৌড় হইতে সাকরমায় পলাইয়া আসিলেন, তাহার সিকি বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের নিকট পুতিয়া গচ্ছিত রাখিলেন কেন? -রাজদন্ড ভয়ে। রাজদন্ডের ভয় কেন?'[৮৩]

পরিশেষে প্রাবন্ধিক যা বলেছেন তা উক্ত বক্তব্যের চেয়েও বেশি স্পষ্ট ও ভয়ঙ্কর।

'ফলতঃ রূপসনাতনের জীবনে অনুকরণীয় কিছুই নাই। তাঁহারা উভয়েই জীবন যাত্রার পথহারা পথিক। উভয়েরই গতি সরল পথ ছাড়িয়া কুটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অর্থ কামের সেবাই জীবনের সরল পন্থা ; তাহার এক দিকে পাপের পঙ্ক, অন্য দিকে বৈরাগ্যের মরু। তাঁহাদের জীবনের এক ভাগ সেই পঙ্কে, অপর ভাগ সেই মরুতে যাপিত হয়। তবে যদিও তাঁহারা আমাদের অনুকরণের যোগ্য না হয়েন, তত্রাচ আমাদের শিক্ষার স্থান বটেন। লোভ পরতন্ত্র হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কি বিষময় ফল ফলে, মনুষ্য কিরূপে ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হয়, তাহা এই দুই ভ্রাতার জীবনে দেখা যায়।'[৮৪]

উমেশচন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটির সূচিপত্রে নাম ছিল 'রূপসনাতন'। কিন্তু প্রকাশের সময় তা হয়েছে 'রূপ ও সনাতন গোস্বামী'। 'নব্যভারত' পত্রিকার ১৩০১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, নাম 'রূপসনাতন শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ', প্রাবন্ধিক শ্রী গোবিন্দমোহন রায়

বিদ্যাবিনোদ।[৮৫] দ্বিতীয় প্রতিবাদ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩০১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা ‘নব্যভারত’ পত্রিকায়। প্রবন্ধের শিরোনাম ‘শ্রীমৎ রূপ সনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ’ প্রাবন্ধিক শ্রী হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়।[৮৬] বক্তব্য দীর্ঘায়িত হবে বলে, তাঁদের প্রতিবাদের নমুনা এখানে আর উদ্ধৃত করলাম না।

রামপ্রসাদ

‘রামপ্রসাদ’ নামক প্রবন্ধটি ‘নব্যভারত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি দুইটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, এবং এই দুটি প্রকাশের মেলবন্ধনেই প্রবন্ধটির সম্পূর্ণতা। প্রাবন্ধিক শ্রী রসিকচন্দ্র বসু।[৮৭] প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় শ্রাবণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দে, এবং দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩০২ বঙ্গাব্দে।[৮৮] প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক রামপ্রসাদের জীবনীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা - বাসস্থান, জাতি, পূর্ব্বপুরুষ-বংশাবলী-বাল্যকাল, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু ও ধর্ম্ম।[৮৯] রামপ্রসাদ সম্পর্কে এতদিন যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে এই প্রবন্ধটির বিশিষ্টতা মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, তথ্যের নিরিখে, দ্বিতীয়ত গঠনগত বৈচিত্র্যে। একজন ব্যক্তির জীবনকে এমন আলাদা আলাদা ভাবে তার জীবনের সময়ের সাথে মিলিয়ে দেখবার পদ্ধতি বেশ অন্যরকম, ফলে গঠনগত দিক থেকে তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রামপ্রসাদ সম্পর্কে এতাবৎ প্রচলিত ভ্রান্ত মৌখিক কাহিনি গুলির প্রতি প্রাবন্ধিকের প্রবল আপত্তি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে তিনি নিজের মত করে কিছু তথ্যের সন্নিবেশ করেছেন।

‘কেহ কেহ রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। রামপ্রসাদের সম্বন্ধে যতগুলি ভ্রমপূর্ণ কথা প্রচলিত আছে, এইটীই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর মনে করি। .....দুঃখের বিষয়, যে সকল পন্ডিতেরা এই অদ্ভুত কল্পনা করিবার কষ্ট সহিয়াছেন, তাঁহারা যদি কালীকীর্ত্তনের অষ্টমঙ্গলাটি (বিদ্যাসুন্দরের

শেষ ভাগে লিখিত) একটু কষ্ট সহিয়া পাঠ করিতেন, তাহা হইলে আর এই ভ্রমপূর্ণমত প্রচার করিতে হইত না। ..... রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর তেমনি তদীয় কালী কীর্ত্তনের এক মঙ্গল বা পালা।'[৯০]

রামপ্রসাদের বাসস্থান প্রসঙ্গে যে স্থান মোটামুটি ভাবে নির্দিষ্ট ছিল, রামপ্রসাদের রচনাসমূহ পাঠ করে তাঁর বাসস্থান সম্পর্কে প্রাবন্ধিক তেমন নির্দিষ্ট কোন তথ্য পান নি। 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠ করে প্রাবন্ধিক দেখেছেন -

'তিনি যে কুমারহট্ট গ্রামে রামকৃষ্ণের বাটীতে মন্ডপ ঘরে রাত্রিকালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই মাত্র জানা যায়। .....কুমারহট্ট রামপ্রসাদের সাধন ক্ষেত্র, বাসভূমি নহে। রামপ্রসাদ কোন স্থলেই স্বীয় আবাস স্থানের নির্দ্দেশ করেন নাই, এই জন্য তাঁহার বাসস্থান কোন্ স্থানে ছিল, নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না।'[৯১]

প্রবন্ধের নামকরণে প্রাবন্ধিক কোথাও রামপ্রসাদের পদবি ব্যবহার করেন নি। সম্ভবতঃ তাঁর পদবি সম্পর্কেও প্রাবন্ধিক সন্দিহান ছিলেন। এবং এইজন্যই রামপ্রসাদের জাতি প্রসঙ্গে তিনি আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রাবন্ধিকের অনুমান -

'যে স্থলে রামপ্রসাদ, দাস বলিয়া পরিচয় দেন নাই, সে স্থলেও তিনি কেবল রামপ্রসাদ, কিম্বা প্রসাদ, অথবা কবিরঞ্জন, কি কবি বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। কুত্রাপি তিনি সেন বলিয়া পরিচয় দেন নাই। গানের ভণিতাগুলিতে প্রসাদ ও রামপ্রসাদ শব্দই অধিক। পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম উল্লেখের সময়েও রামপ্রসাদ, সেন বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় দেন নাই। তথাপি ন্যায়রত্ন- প্রমুখ পন্ডিতেরা কেন যে রামপ্রসাদকে বৈদ্য জাতীয় সেন উপাধিধারী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।'[৯২]

রামপ্রসাদ এবং দ্বিজ রামপ্রসাদকে একই ব্যক্তি মনে করে[৯৩] প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন-

' ''শিশুকালে পিতা মলো রাজ্য নিল পরে।''

এই গীতাংশ দ্বারা তাঁহার পিতা পিতামহদিগকে জমিদার বলিয়া বোধ হয়। সেকালে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত বঙ্গদেশে বৈদ্যের জমিদারী কথা কোন পুথিতে, পুস্তকে বা লোকমুখে শুনা যায় নাই। সুতরাং রামপ্রসাদ যে কায়স্থ ছিলেন, তাহা নিশ্চিত।'[৯৪]

রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষদের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা ও বিবরণী প্রাবন্ধিক আমাদের দিয়েছেন সেখানে কৃত্তিবাস নামধারী এক ব্যক্তিকে তিনি রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ রূপে উল্লেখ করেছেন।[৯৫] এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক রামপ্রসাদের ৬টি (ছয়টি) পদের উল্লেখ[৯৬] করে জানিয়েছেন -

'এই সকল কবিতা হইতে জানা যায়, রামপ্রসাদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস অতুল কীর্ত্তিমান্, দয়াবান, দাননীল, শিষ্ট ও শান্ত ছিলেন। কালিকাদেবী তাঁহার উপর প্রসন্না ছিলেন। কৃত্তিবাসের বংশ বিশুদ্ধ ছিল। ধনগৌরবে কৃত্তিবাসের বংশ বড়ই প্রসিদ্ধ ছিল।'[৯৭]

১৩০২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় এই প্রবন্ধের যে দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়, সেখানেও প্রাবন্ধিক একই ভাবে রামপ্রসাদের 'যৌবন', 'বার্দ্ধক্য', 'মৃত্যু' ও 'ধর্ম্ম' প্রসঙ্গে তাঁর মত করে নতুন তথ্য সন্নিবেশ সহকারে আলোচনা করেছেন।[৯৮] পরিশেষে রামপ্রসাদের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন -

'যদি রামপ্রসাদের কালী কীর্ত্তন পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সময় সম্পর্কে কোন কথা তাহার মধ্যে পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কালীকীর্ত্তনের অতি অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সময় সম্বন্ধে কোন কথা নাই।.....কালিকামঙ্গল রচয়িতা প্রাণরামের নির্দ্দেশ অনুসারে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া জানা যায় -

''বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ,
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিম্‌তা যাঁর বাস।

তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই,
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই।
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে,
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে।''

সুতরাং কলিকাতাকে ইংরেজ অধিকার হওয়ায় পর, ও ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল রচিত হওয়ার পূর্ব্বে রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তন আদি রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে পূর্ণ হয়। সুতরাং ইহার কিছু পূর্ব্বেই রামপ্রসাদ কালী কীর্ত্তন রচনা করেন। তাঁহার কীর্ত্তনের ভাষা দর্শনে ও অন্নদামঙ্গলের পূর্ব্বের রচনা বলিয়াই বোধ হয়।'[৯৯]

উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ 'নব্যভারত' পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'রামপ্রসাদের জাতিনির্ণয়' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, তাঁর নামের আদ্যক্ষরে 'শ্রী' এর স্থানে 'প্রী' হয়ে রয়েছে।[১০০] বলাবাহুল্য উক্ত বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে পাঠকমহলে রামপ্রসাদের চর্চা ও জন প্রিয়তা এগিয়ে চলেছিল।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল

গোকুল-পালা

'নিত্যানন্দের 'শীতলা-মঙ্গল' (গোকুল-পালা) শীর্ষক রচনাটি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' ১৩০৫ বঙ্গাব্দের পঞ্চম ভাগ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, প্রাবন্ধিক শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তফী।[১০১] প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন -

'এই পালার যে পুঁথিখানি বিশ্বকোষ -কার্য্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ও অধিক দিনের প্রতিলিপি নহে, তবে মৎসংগৃহীত পূর্ব্বোক্ত পুঁথিখানি-অপেক্ষা অধিক

দিনের। ইহা ১২১৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে রামধন চোঙ্গদার নামক ব্যক্তির লিখিত। কাহার জন্য কোথায় লিখিত হয়, তাহার কোন উল্লেখ নাই। পুঁথিখানির বয়স ৮৮ বৎসর হইলেও ইহার অবস্থা ভাল।'[১০২]

'শীতলামঙ্গল' কেন্দ্রিক রচনা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩০৫ বঙ্গাব্দের পঞ্চম ভাগে এই লেখার আগেও প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সেই অংশের পৃষ্ঠা গুলির যা অবস্থা, তার থেকে কেবল 'শীতলামঙ্গল' নামটি ছাড়া আর অন্য কোন কিছু উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

সমকালীন বা তার আগেও বিভিন্ন পত্রিকায় মঙ্গলকাব্য বা মঙ্গলকাব্যের কবিদের সম্পর্কে যে আলোচনা-চর্চা প্রভৃতি হয়েছে তা ছিল বাঁধাধরা মঙ্গলকাব্যের প্রকৃতি অনুসারে। অর্থাৎ 'চন্ডীমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল' ইত্যাদি কেন্দ্রিক। সেই দিক থেকে দেখলে প্রধান মঙ্গল কাব্য গুলি ছাড়াও অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা বেশ অভিনব। কবি নিত্যানন্দ এবং তাঁর রচনা সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মত -

'কবি নিত্যানন্দের কল্পনা বড় তেজস্বিনী। শীতলার অবস্থানের জন্য তিনি স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও স্থান না করিয়া ''রোগপুর পাটনের'' সৃষ্টি করিয়াছেন, শীতলার চৌদ্দভুবন ভ্রমণ করিবার জন্য ''ব্রণব্যাধিরূপ যানের'' সৃষ্টি করিয়াছেন, আর শীতলার নাম দিয়াছেন ''বসন্তকুমারী''। যে পুরাণকার কবি যেন ব্রণভয়ে ভীত হইয়া এই দেবীর নাম শীতলা রাখিয়াছিলেন, তাঁহা অপেক্ষা বাঙ্গালী নিত্যানন্দকে অধিক সাহসী বলিতে হয়, তিনি নির্ভয়ে দেবীর নাম ''বসন্তকুমারী'' রাখিয়াছেন। যে বাঙ্গালী ভয়ে বসন্তের নাম করে না, বলে ''মার অনুগ্রহ'', সেই বাঙ্গালীরই জনৈক কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মার বাস্তবিক অনুগ্রহ লাভাশায়ে, মার উপযুক্ত নাম ধাম -যানাদির কল্পনা করিয়া একটু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন বলিতে হইবে।..... যাহা হউক, মহিমা প্রচার করিতে হইলে, দেবদেবীদিগের একার যুক্তিতে কিছু হয় না, কাহারও সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক হয়, সুতরাং প্রথানুসারে শীতলারই বা না হইবে কেন ? দৈবকী

নন্দনের শীতলাও জরাসুরকে ডাকিয়া ছিলেন, নিত্যানন্দের বসন্তকুমারী ও তাঁহাকেই ডাকিলেন ; .....'[১০৩]

এর পরেই শীতলামঙ্গলের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে এসে প্রাবন্ধিক কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য দিয়েছেন। এই পত্রিকায় আগে 'শীতলামঙ্গল' কেন্দ্রিক যে আলোচনার কথা আমরা উল্লেখ করেছি ; যার কোন তথ্য আমরা পাই নি, সে প্রসঙ্গেও প্রাবন্ধিক পরিশেষে আমাদের জানিয়েছেন -

'প্রথম চরণে দেবদাস দত্তের পূর্ব্বাবস্থায় কুবের পুত্রত্বের কথা জানা যাইতেছে। ইহার কবিকঙ্কণের অনুকরণ। যাহা হউক, শীতলার এই অষ্টমঙ্গলানুযায়ী নিত্যানন্দের পূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ কোথাও আছে কিনা বা আদৌ ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল। দেবদাস দত্ত কর্তৃক টীকা দিবার ব্যবস্থা-প্রকাশের কথা অষ্টমঙ্গলায় দেখা যাইতেছে। কিন্তু আসল কাব্যের মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ দেখা গেল না। কি দৈবকীনন্দন, কি নিত্যানন্দ উভয়েরই কাব্যালোচনা করিয়া আমরা যতটা বুঝিলাম, তাহাতে উভয়কেই মনসার ভাসান ও চন্ডী মঙ্গলের অনুকরণে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত বলিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল। ..... তবে সাধারণকে অনুরোধ যে যাহাতে এই শীতলা-মঙ্গলের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

একটা কথা, -এই কাব্যের নাম আমরা বরাবর শীতলা-মঙ্গল বলিয়াই আসিতেছিলাম, অথচ তাহার কোন আভ্যন্তরিক প্রমাণ দিই নাই। বিরাট-পালার শেষ চরণে কবির কথায় সে কথার সুন্দর প্রমাণ হইয়া গিয়াছে -''শীতলা-মঙ্গল সাঙ্গ সবে বল হরি।'' প্রথমে আমরা শীতলা-মঙ্গলের পাঁচটী পালার উল্লেখ স্থলে ''রঘুরাম দত্তের পালা'' নামে এক পালার উল্লেখ করিয়াছি, বিরাট-পালা কথিত দেবদত্তের পালার কথা আলোচনা করিয়া বোধ হয় যে যাহার নিকট আমি রঘুরাম দত্তের পালার নাম শ্রবণ করি, তাঁহার সম্ভবতঃ ভুল হইয়াছে, উহার নাম দেবদত্তের পালাই হইবে। যাহা হউক অনুসন্ধান আবশ্যক।'[১০৪]

স্ত্রী কবি মাধবী

'স্ত্রী কবি মাধবী' শীর্ষক রচনাটি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' পঞ্চম ভাগ তৃতীয় সংখ্যায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক, শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।[১০৫] আমরা এযাবৎ পত্র-পত্রিকার রচনাসমূহ নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি, বা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধের যে তালিকা আমরা দেখেছি, তার মধ্যে মেয়েদের রচনা সংক্রান্ত কোন আলোচনা আমরা খুব বেশি দেখিনি। সম্ভবতঃ সমকালে মেয়েদের রচনা এবং তাঁদের নিয়ে চর্চা বিরল হওয়ার কারণে প্রাবন্ধিক বিশেষ ভাবে 'স্ত্রী কবি' শব্দটির উল্লেখ করেছেন, যেন পাঠকের বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়। কবি মাধবীর একটি, সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁর লেখার দু-একটি মাত্র নমুনাই প্রাবন্ধিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পরবর্তী কালে এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তৃত সুদীর্ঘ কোন আলোচনা হয়েছে কিনা তা আমরা জানতে পারি নি।

কবি প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের অনুসন্ধান নিম্নরূপ -

'এ পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আমরা একজন মাত্র স্ত্রী-কবির কবিতা কুসুমের সৌরভ সুষমার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনিই মাধবীদেবী। কবিতা কুসুমের পরিমল বিস্তার মাত্র ইহার গৌরব নহে, মাধবীর গুণ গরিমা পুরুষ সমাজেও দুর্ল্লভ ছিল।

মাধবী নীলাচলনিবাসিনী। শিখি মাহিতির ছোট ভাই মুরারি মাহিতি; মাধবী মুরারির ছোট ছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহাদিগকে ''তিনভ্রাতা'' বলা হইয়াছে; মাধবীকে ও ভ্রাতা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি পুরুষের ন্যায় পন্ডিত ছিলেন ও পুরুষের ন্যায় ''জপতপ'' করিতেন। ..... মহাপ্রভু স্ত্রী দর্শন করিতেন না, মাধবীকে নীলাচলের সকলেই যদিও জানিত, তথাপি স্ত্রী বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে যাইতে পারেন নাই। তবে মাধবী অন্তরালে থাকিয়া শ্রী চৈতন্যদেবকে দর্শন করেন। এই দর্শনমাত্রই শ্রী মহাপ্রভুকে মাধবীর ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান হইল; তিনি মহাপ্রভুর একজন

''ভক্ত'' হইলেন। মাধবী বলেন যে; গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দেখিলেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। যথা তৎকৃত পদ্যে, -

''যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে।''.....

প্রাচীন কালাবধি নীলাচলে একটী প্রথা প্রচলিত আছে। জগন্নাথদেবের শ্রী মন্দিরে একজন ''লিখনাধিকারী'' থাকেন অর্থাৎ একজন লেখক - কর্ম্মচারী শ্রী মন্দিরের দৈনন্দিন বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। মাধবীর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তাঁহার স্বল্পাক্ষর গ্রথিত রচনক্ষমতা, পান্ডিত্য ও বুদ্ধিগৌরবে মোহিত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র, স্ত্রীলোক হইলেও মাধবীকে ঐ সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে এই জন্যই মাধবী ''প্রভু লেখা করে'' বলিয়া লিখিত আছে। ..... মহাপ্রভু জীবগণকে যে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেন, মোটে সাড়ে তিন জন ব্যক্তিই তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম ও উপভোগ করিতে সক্ষম হন। সেই সাড়ে তিনজন স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতি এবং মাধবীদেবী। স্ত্রীলোক বলিয়াই তাঁহাকে ''অর্দ্ধপাত্র'' বলা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝুন-মাধবীর ভক্তি প্রভাব, ইহাতেই অনুভব করুন্-মাধবীর জ্ঞান কত গভীর ; তাঁহার শক্তি কত দূর প্রসারিণী। তাঁহার বৈষ্ণবতা ও কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, চরিতামৃত গ্রন্থে একটী মাত্র ছত্রে, তাঁহার যে গুণ ও ভক্তি গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, নীলাচল বাসী ভক্তগণের নামগণনায় কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন, -

''মাধবী দেবী শিখী মাহিতির ভগিনী।
শ্রী রাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি।।''[১০৬]

কবি মাধবীর একাধিক পদের উল্লেখ প্রাবন্ধিক করেছেন। তার মধ্যে যে পদটিতে কবি নবদ্বীপের বিষাদময় চিত্র এঁকেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করলাম।

'নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কথো দূরে, দেখে নদীয়ারে,

গোকুলপুরের ছন্দ।
ভাবয়ে পন্ডিত রায়।
পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে চায়।।
লতা তরু যত, দেখে শত শত,
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ, না হয় স্ফুটন,
মেঘগণ দেখে রাতা।
ভালে বসি পখী, মুদি দুটী আঁখি,
ফুল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি,
গোরাচান্দ নাম লৈয়া।
ধেণু যুথে যুথে দাঁড়াইয়া পথে,
কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসীর পন্ডিত ঠাকুর,
পড়িলা আছাড়ে গা।'[১০৭]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এই প্রবন্ধটি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, 'নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল' প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত। 'স্ত্রী কবি মাধবী' প্রবন্ধের ঠিক আগেই পরিষদের 'দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ' সম্পর্কিত একটি লেখা আমাদের নজরে এসেছে যার একেবারে শেষে সভাপতি রূপে শ্রী রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ও সম্পাদক রূপে শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম রয়েছে।[১০৮] আমরা সঠিক জানি না যে এই সম্পাদকই প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন কিনা।

জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ

'জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ' শীর্ষক রচনাটি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার' সপ্তম খন্ড, চতুর্থ সংখ্যায় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়, প্রাবন্ধিক শ্রী রসিকচন্দ্র বসু।[১০৯] 'জগন্নাথ -বিজয়' -এর যে পুথিখানি প্রাবন্ধিকের কাছে ছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই প্রাবন্ধিক এই কাব্যের কবির পরিচয় ও রচনার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। প্রাবন্ধিকের বক্তব্য -

'কবি মুকুন্দ গ্রন্থমধ্যে আপনার কোন পরিচয় দেন নাই। সুতরাং এই সুদীর্ঘকাল পরে তিনি কি জাতি, কোথায় তাঁহার নিবাস ছিল, তাহা সুনিশ্চিত ভাবে জানিবার উপায় নাই।..... এই সকল কবিতা হইতে মুকুন্দ নাম ব্যতীত অধিক আর কিছু জানা যায় না। বঙ্গ বাসিগণ মুকুন্দ নামক এক কবির বিবরণ বহুদিন হইতে অবগত আছেন। তিনি মুকুন্দরাম মিশ্র বা চক্রবর্ত্তী - উপাধি কবিকঙ্কণ। কিন্তু সে মুকুন্দ, এ মুকুন্দ নহেন।..... জগন্নাথ বিজয়ের ভাষা ও রচনা প্রণালী চন্ডীমঙ্গলের ভাষা ও রচনা প্রণালী হইতে এত প্রাচীন যে, যে লেখনীতে চন্ডীমঙ্গল রচিত হইয়াছে, সেই লেখনীতেই জগন্নাথ -বিজয় রচিত হইতে পারে না। উভয় গ্রন্থের ভাষা ও এক প্রকার নহে।..... কবি রূপনারায়ণের গ্রন্থে আমরা বর্ত্তমান কালের অপ্রচলিত যে সকল শব্দ দেখিতে পাই, জগন্নাথ বিজয়ে ও সেই সকল শব্দ দৃষ্ট হয়- গহীর (গভীর), আপুনি (আপনি), আছিল (ছিল), এহি (এই), অলঙ্গ (অলঙ্ঘ্য), সমার (সবার), এতেক (এই), মোকে (আমার প্রতি), বৈসে (বাস করে), সহে (সহ) ইত্যাদি।

এই সকল ভাষা সাদৃশ্য দর্শনে কবি মুকুন্দকে রূপনারায়ণের প্রতিবেশী বলিয়া সহজেই অনুমান হয়। বিশেষতঃ কবি মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়ে এমন কতক গুলি শব্দ প্রয়োগ দেখা যায় , যাহা টাঙ্গাইল মহকুমা ব্যতীত অন্যত্র সমধিক প্রচলিত নহে। সেই শব্দগুলিই কবি মুকুন্দের বাসস্থান বিষয়ক আমাদের অনুমানকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস

জন্মাইয়া দেয়।.....কবি মুকুন্দ রচিত জগন্নাথ বিজয় গ্রন্থ আটীয়া পরগণায় প্রাপ্ত হওয়াও তাঁহার আটীয়া পরগণায় অধিবাস অনুমান করিবার এক কারণ। জগন্নাথ বিজয় ব্যতীত মুকুন্দ রচিত অন্য কোন গ্রন্থ আমরা পাই নাই; পাইলে মুকুন্দের নিবাস আটীয়া পরগণার কোন গ্রামে ছিল, তিনি কি জাতি ছিলেন, তাহা জানিবার সম্ভব ছিল।.....জগন্নাথ বিজয় দুইটী ছন্দে রচিত-পয়ার ও ত্রিপদী।.....ত্রিপদী ছন্দ প্রযুক্ত হইলেও মোটামুটি পয়ার ছন্দেই প্রায় সমস্ত গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে।.....কবি মুকুন্দ বৈষ্ণব ছিলেন; তিনি জগন্নাথকে 'পতি' 'পতি' জানিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ চরণে' জগন্নাথ বিজয় গীত গাইয়াছেন। ..... যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে কবি মুকুন্দকেই বঙ্গের প্রাচীনতম কবি বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু মুকুন্দের পূর্ব্বেও চন্ডী ও মনসা বিষয়ক কোন গান প্রচারিত থাকা অসম্ভব নহে। মুকুন্দের আবির্ভাব কালে চন্ডী বিশেষ ভাবে সর্ব্বত্র এবং বিষহরী দেবী ক্বচিৎ পূজিতা হইতে ছিলেন। .....মুকুন্দের সময় বিষহরীর তেমন প্রতিপত্তি হয় নাই। তিনি দেবতা পদ কেবল পাইয়াছেন মাত্র। চন্ডীরই তখন পূর্ণ অধিকার। পরবর্তী মনসার গীত কাব্য গুলিতে দেখা যায় বঙ্গদেশে প্রথমে চন্ডীর পূজাই প্রচলিত ছিল। .....কবি স্বীয় গ্রন্থকে পাঁচালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে শ্রীরাগ, মল্লার, পঠমঞ্জরী, ধানশী, সুহি, সিন্ধুরা, বড়ারি, প্রভৃতি রাগ রাগিণী অনুসারে পদ রচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে রচিত পাঁচালী গ্রন্থ সমূহে ও আমরা এই সকল রাগ রাগিণীর ব্যবহার দেখিতে পাই। পয়ার ছন্দকে মুকুন্দ খর্ব্ব ছন্দ বলিয়া লিখিয়াছেন। ত্রিপদী এক স্থলে মালিনী নামে অভিহিত হইয়াছে।'[১১০]

এই প্রবন্ধের ঠিক পরেই শ্রী নগেন্দ্র নাথ বসুর লেখা সাতখানি টীকা 'জগন্নাথ-বিজয়' এবং উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে মতামত রয়েছে।[১১১] একজন পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পদ্ধতিটি বেশ পাঠ উপযোগী। একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদ বা সমালোচনা যদি

একই পত্রিকার অন্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তাহলে সময়ের ব্যবধানে রচনার পারম্পর্য নির্ণয়ে অসুবিধা হয়। ফলে পদ্ধতিটি বেশ মনোজ্ঞ।

সত্যনারায়ণ কথা

'সত্যনারায়ণ কথা' নামক প্রবন্ধটি 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার' প্রথম সংখ্যা অষ্টম ভাগে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তফী। পত্রিকার সম্পাদক শ্রী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।[১১২] সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বাংলাদেশে বহু প্রচলিত, এর আগে পর্যন্ত আমরা এই ব্রতকথা শুনতেই অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু স্বল্প পরিসরে হলেও সত্যনারায়ণ কেন্দ্রিক সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রদান প্রবন্ধটিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। প্রবন্ধটির শেষে কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায়ের 'সত্যনারায়ণ কথা' সংযুক্ত রয়েছে।

প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক যে তথ্য গুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, সেগুলি তাঁর মত করেই আমরা উপস্থাপিত করলাম। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি জানাচ্ছেন -

'আমাদের প্রদেশে রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ প্রচলিত, কিন্তু চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত টাকী অঞ্চলে রামেশ্বরের আদর নাই। সেখানে সত্যনারায়ণের আর দুইটী কথা চলিত আছে। টাকীতে বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী উভয়বিধ কায়স্থের বাস। এই উভয়বিধ কায়স্থ সমাজে সত্যনারায়ণের বিভিন্ন কথা প্রচলিত। বঙ্গজ সমাজে দ্বিজ রামভদ্র রচিত এবং রাঢ়ীয় সমাজে কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায়ের কথা পঠিত হইয়া থাকে। ..... কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায় সম্বন্ধে দুটা কথা বলিবার আছে। চন্ডীকাব্য প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী নিজ পরিচয় দান কালে কবিচন্দ্র নামে আপনার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কবিচন্দ্র শব্দটী নাম অথবা উপাধি তাহা মুকুন্দরাম কোথাও খুলিয়া লেখেন নাই। তিনি পিতৃ পিতামহের পরিচয়, গাঞীর পরিচয়, বংশ পরিচয় এবং নিজের দ্বিজত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব, কবিকঙ্কণত্ব ইত্যাদি সকল

কথাই তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, অথচ কোথাও জ্যেষ্ঠের ..... নাম প্রকাশ করেন নাই। কবিচন্দ্র উপাধি আরও অনেকের ছিল, তাহা আমরা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ হইতে এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে জানিতে পারি।

গত ১২৯৯ সালের অনুসন্ধান পত্রিকায় ২৯ শে মাঘ কবিকঙ্কণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গুপ্ত মহাশয় একটি অনুমান প্রকাশ করেন যে কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্রের নাম অযোধ্যারাম। তাঁহার এ অনুমানের মূল বড় দৃঢ় নহে। ..... আমরা যে কবিচন্দ্রের সত্যনারায়ণ কথা অদ্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম, এখানিতে আমরা কবিচন্দ্র উপাধির সহিত অযোধ্যা রামের নামসংযুক্ত ভণিতা পাইতেছি, -''রচিল অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র রায়''। কিন্তু ইহাঁকে আমাদের কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ বলিয়া উপস্থিত করিবার সুদৃঢ় প্রমাণ কিছুই এ গ্রন্থে নাই, বরং ''রায়'' উপাধি দ্বারা তাঁহাকে ''চক্রবর্ত্তীর'' ভ্রাতৃপদবীতে যেন দাবী করিতে দিতেছে না। কিন্তু হৃদয় মিশ্রের পুত্র মুকুন্দরাম যদি ''চক্রবর্ত্তী'' হন, তাহা হইলে কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম ''রায়'' হইলেও ক্ষতি হয় না। কারণ ঐ সকল উপাধি গুণবাচী, বংশগত নহে। আরও এক কথা, কবিকঙ্কণ শ্রোত্রিয় কয়ড়ী গাঞীর ব্রাহ্মণ। প্রায় সমস্ত শ্রোত্রিয়বংশে সাধারণতঃ রায় উপাধি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ব হইতেও চলিয়া আসিতেছে। এরূপ স্থলে অযোধ্যারাম 'রায়' বলিয়া যে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা হইতে পারেন না, এরূপ কোন কথা নাই। তবে তাঁহার পিতৃনাম না পাওয়ায় আমরা তাঁহাকে মুকুন্দরামের ভ্রাতা বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিতে পারিলাম না।'[১১৩]

খনা

'খনা' নামক প্রবন্ধটি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার' দশম ভাগ, প্রথম সংখ্যায়, ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক যোগেশচন্দ্র রায়।[১১৪] প্রবন্ধটি শ্রী দীনেশচন্দ্র

সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ - গ্রন্থের ‘বৌদ্ধযুগ’ বা ‘খনা’ শীর্ষক রচনার সমালোচনা। যে সময় এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে, তার আগে ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। একটি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়টি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। নতুন তথ্য আবিষ্কারের সাথে সাথে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গ্রন্থের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করেছেন, কিন্তু খনা প্রসঙ্গে তাঁর কিছু অভিমত সম্ভবত একই থেকে গিয়েছিল। সেই অভিমত গুলির প্রতিই প্রাবন্ধিক নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন -

‘দীনেশ বাবু যে সকল খনার বচন লক্ষ্য করিয়া উক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তিনি সে সকল বচন স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করেন নাই। বচন গুলি কোন কাব্যের ন্যায় পরস্পর গ্রথিত নহে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন (৭০ পৃঃ), ‘‘কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। হয়ত প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনার সাহায্য করিয়াছে।’’ যদি তাহাই হয়, তবে প্রাচীনকাল’ অর্থে ৮০০-১২০০ খ্রীস্টাব্দমাত্র বুঝিবার কারণ কি?..... খনার বচন বাঙ্গালা, সংস্কৃত নহে ; বরাহমিহির এক ব্যক্তির নাম, পিতা পুত্রের নহে; এবং বরাহ মিহিরের যে সকল গ্রন্থ আছে, সে সকল গ্রন্থোক্ত জ্যোতিষের সহিত খনার জ্যোতিষের সাদৃশ্য নাই। খনা নাম্নী কোন রমণী ছিলেন কি না, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায় না।’[১১৫]

এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন -

‘খনার বচনের সহিত ডাকের কথার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় খনার বচন জ্যোতিষিক, ডাকের কথা সাংসারিক। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে খনাতে ও ডাকের কথায় ঠাকুর দেবতার পূজার ব্যবস্থা অশাকরা যাইতে পারে না। তাহা ছাড়া, খনার বাক্যে ও ডাকের কথায় ঠাকুর দেবতার নাম নাই বলিয়া খনা ও ডাককে ‘বৌদ্ধযুগের’ অনুমান করিতে পারা যায় না। .....দীনেশ বাবু ঐ যুগকে খৃঃ ৮০০ হইতে ১২০০ অব্দের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই কালে

বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল কি ? বরং মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নস্তূপে তন্ত্রমন্ত্র বলবান্ বৃক্ষে পরিণত হইতেছিল। যদি গ্রামের ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হইলে বৌদ্ধযুগ বলিতে হয়, তাহা হইলে সে যুগের অবসান অদ্যাপি হয় নাই। ..... তিনি বৌদ্ধযুগের কতক গুলি অপ্রচলিত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন (৭৫ পৃঃ)। কিন্তু তন্মধ্যে অনেক শব্দ অদ্যাপি পশ্চিমবঙ্গে চলিত আছে, কতক গুলি অবিকল চলিত ওড়িয়া শব্দ। যথা অবুধ (=অ-বুধ, অবুঝ)..... আর একটি ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উপসংহার করা যাইতেছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ৪৩ পৃষ্ঠে আছে, ''প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ' বাঙ্গালা 'র' কারে পরিণত হয়। 'ণ' সচরাচরই 'ড়' তে পরিণত হয়। এই পরিণতি সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ প্রমাণ চান, তবে উড়িষ্যা দেশ ঘুরিয়া আসিলেই তাঁহার প্রতীতি জন্মিবে''। কিন্তু এই ওড়িয়াদেশে বহুকাল বাস করিয়াও প্রতীতি জন্মে নাই। 'ণ' কারের ওড়িয়া উচ্চারণ সম্বন্ধে - অনেক বাঙ্গালীর একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। বোধ হয়, দীনেশ বাবু ও সেই রূপ ভ্রান্ত হইয়াছেন। কারণ ওড়িষার কোথাও 'ণ' কার 'র' বা 'ড়' তে পরিণত হইতে দেখি না। 'ণ' এর উচ্চারণ 'ড়' নহে। কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতির বাঙ্গালা উচ্চারণ কৃষ্ট, বিষ্টু আছে। এই উচ্চারণের সহিত ওড়িয়া উচ্চারণের সাদৃশ্য আছে। তেমনই ওড়িয়া ও মারাঠিতে দুইটা 'ল' আছে। একটীর উচ্চারণে 'ড়' কারের আমেজ আছে। কিন্তু শাস্ত্রের 'রলয়োরভেদঃ' পূর্ব্বে বুঝিতাম না। দুই 'ল' কারের উচ্চারণ শুনিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়।'[১১৬]

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রবল জনপ্রিয়তার সময়ে সেই গ্রন্থ সম্পর্কে এমন সমালোচনা প্রশংসার দাবী রাখে। বলাবাহুল্য দীনেশচন্দ্র সেনের বৌদ্ধযুগ এবং সেই সম্পর্কিত ধারণা পরবর্তী পাঠক-সমালোচকদের দৃষ্টিতে পুরোপুরি গ্রাহ্য হয় নি। এবং এক্ষেত্রে সমালোচক শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় অবশ্যই অগ্রগণ্য ও প্রশংসার পাত্র।

****

সংক্ষিপ্ত টীকা ঃ-

১) হ.মো.সে., ‘কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন’, বিবিধার্থ সংগ্রহ, দ্র. রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সম্পা.), কলিকাতা, মাঘ ১৭৭৩ শকাব্দ, পৃঃ -৬৯।

২) ঐ, পৃঃ ৬৭।

৩) ঐ, পৃঃ ৬৮।

৪) ঐ, পৃঃ ৬৯।

৫) হরিমোহন সেনগুপ্ত, ‘ভারতচন্দ্র’, বিবিধার্থ সংগ্রহ, দ্র. রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সম্পা.), কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৬ শকাব্দ, পৃঃ -৬৪

৬) ঐ, পৃঃ ৬৩।

৭) ঐ, পৃঃ ৬৪।

৮) ঐ, পৃঃ ৬৪।

৯) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম -ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ -৮৪।

১০) শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজ শ্রীমন্মহামর্কট, ‘রামায়ণের সমালোচনা’, বঙ্গদর্শন, পঞ্চম মুদ্রণ, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃঃ -৩৭০।

১১) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম -ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ -৮৪।

১২) শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজ শ্রীমন্মহামর্কট, ‘রামায়ণের সমালোচনা’, বঙ্গদর্শন, পঞ্চম মুদ্রণ, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃঃ -৩৭০।

১৩) ঐ, পৃঃ ৩৭১।

১৪) ঐ, পৃঃ ৩৭২।

১৫) ঐ, পৃঃ ৩৭২।

১৬) ঐ, পৃঃ ৩৭২।

১৭) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম -ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ -৯৩-৯৪।

১৮) রামদাস সেন, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ', বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, জুন ১৯৮৮, পৃঃ -২৪৫।

১৯) ঐ, পৃঃ ৭৬।

২০) ঐ, পৃঃ ২৪৬।

২১) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম -ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ -৯৪।

২২) 'জ্ঞানদাস', বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, জুন ১৯৮৮, পৃঃ -৩৬৪।

২৩) ঐ, পৃঃ ৩৬৬।

২৪) ঐ, পৃঃ ৩৬৬।

২৫) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম -ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ -৯৫।

২৬) 'বলরাম দাস', বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, জুন ১৯৮৮, পৃঃ -৪৪৮।

২৭) ঐ পৃঃ ৪৪৬।

২৮) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম -ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ -১১৪।

২৯) শ্রীকৃষ্ণ দাস, 'চৈতন্য', বঙ্গদর্শন, চতুর্থ খন্ড, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, জুলাই ১৯৮০, পৃঃ -৪১৯।

৩০) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম -ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ -১১১।

৩১) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'বিদ্যাপতি', বঙ্গদর্শন, চতুর্থ খন্ড, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, জুলাই ১৯৮০, পৃঃ -৭৩।

৩২) ঐ, পৃঃ -৭৬।

৩৩) গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, 'বিদ্যাপতি', ভারতী, দ্র. স্বর্ণকুমারী দেবী (সম্পা.), কলিকাতা, ভারতীযন্ত্র, বৈশাখ ১৩০১।

৩৪) ঐ, পৃঃ ৩৯।

৩৫) বীরেশ্বর গোস্বামী, 'কবি কৃত্তিবাস', ভারতী, দ্র. স্বর্ণকুমারী দেবী (সম্পা.), কলিকাতা, ভারতীযন্ত্র, কার্ত্তিক -চৈত্র ১৩০১।

৩৬) ঐ, পৃঃ ৪০৯।

৩৭) ঐ, পৃঃ ৪০৯।

৩৮) ঐ, পৃঃ ৪০৯।

৩৯) ঐ, পৃঃ ৪১১।

৪০) ঐ, পৃঃ ৪১১।

৪১) ঐ, পৃঃ ৪১২।

৪২) কানাইলাল ঘোষাল, 'কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন', ভারতী, দ্র. স্বর্ণকুমারী দেবী (সম্পা.), কলিকাতা, মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০১।

৪৩) ঐ, পৃঃ ৭২৬।

৪৪) ঐ, পৃঃ ৭২৯।

৪৫) ঐ, পৃঃ ৭৩২।

৪৬) (গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করবার জন্য যে উপযুক্ত বিবরণের প্রয়োজন তা আমরা উক্ত পত্রিকায় পাই নি। পত্রিকাটিকে আমরা অর্ধেক ছেঁড়া অবস্থায় পেয়েছি। এর মধ্যে থেকে কেবল মাত্র প্রবন্ধটি এবং প্রবন্ধে উল্লেখিত তথ্য গুলিই আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এর বেশি কিছু সম্ভব হয় নি) দীনেশচন্দ্র সেন, মালিক মহম্মদের পদ্মাবত এবং আলোয়ালকৃত অনুবাদ, ভারতী, ১৩০৮ ফাল্গুন।

৪৭) ঐ, পৃঃ ৪৪০।

৪৮) ঐ, পৃঃ ৪৪১।

৪৯) ঐ, পৃঃ ৪৪১-৪৪২।

৫০) ঐ, পৃঃ ৪৪৩।

৫১) ঐ, পৃঃ ৪৪৫।

৫২) ঐ, পৃঃ ৪৪৬।

৫৩) ঐ, পৃঃ ৪৪৯।

৫৪) শ্রী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, 'কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা', ভারতী, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩০৯।

৫৫) ঐ, পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮।

৫৬) 'মুকুন্দরাম', সাহিত্য, দ্র. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.), দ্বিতীয় বর্ষ, কলিকাতা, বৈশাখ - চৈত্র ১২৯৮, পৃঃ -৫৬৯।

৫৭) ঐ, পৃঃ -৫৭০।

৫৮) শ্রী আবদুল করিম, 'নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ', সাহিত্য, দ্র. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.), কলিকাতা, পৌষ ও মাঘ ১৩০৭।

৫৯) শ্রী আবদুল করিম, 'নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ', সাহিত্য, দ্র. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.), কলিকাতা, পৌষ ১৩০৭, পৃঃ -৫৭২।

৬০) ঐ, পৃঃ ৫৭২-৫৭৩।

৬১) ঐ, পৃঃ ৬০৬।

৬২) ঐ, পৃঃ ৬০৯।

৬৩) ঐ, পৃঃ ৬০৭-৬০৮।

৬৪) রজনীকান্ত চক্রবর্তী, 'চৈতন্যভাগবত', সাহিত্য, দ্র. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.), কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩০৮।

৬৫) ঐ, পৃঃ ২৪২।

৬৬) ঐ, পৃঃ ২৪০।

৬৭) উমেশচন্দ্র বটব্যাল, 'মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী', সাহিত্য, দ্র. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.), কলিকাতা, চৈত্র ১৩০৮।

৬৮) ঐ, পৃঃ ৭০৮।

৬৯) ঐ, পৃঃ - ৭১২,৭১৩।

৭০) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাকবি কৃত্তিবাস', সাধনা, দ্র. সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর (সম্পা.), তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

৭১) ঐ, পৃঃ ১৮৫।

৭২) ঐ, পৃঃ ১৯২।

৭৩) ঐ, পৃঃ ১৯৩।

৭৪) ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, 'চন্ডীদাস', নব্য ভারত, দ্র. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.), একাদশ খন্ড, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩০০।

৭৫) ঐ, পৃঃ ৫৮৫।

৭৬) ঐ, পৃঃ ৫৮৬-৫৮৭।

৭৭) উমেশচন্দ্র বটব্যাল, 'রূপ ও সনাতন গোস্বামী', নব্যভারত, দ্র. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.), দ্বাদশ খন্ড, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩০১।

৭৮) ঐ, পৃঃ ২২৫।

৭৯) ঐ, পৃঃ ২২৬।

৮০) ঐ, পৃঃ ২২৬।

৮১) ঐ, পৃঃ ২২৭।

৮২) ঐ, পৃঃ ২২৭-২২৮।

৮৩) ঐ, পৃঃ ২২৮।

৮৪) ঐ, পৃঃ ২৩১।

৮৫) গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ, ‘রূপসনাতন শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ’, নব্যভারত, দ্র. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.), দ্বাদশ খন্ড, কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩০১, পৃঃ -৩৩৭।

৮৬) হারাধন দত্ত ভক্তনিধি, ‘শ্রীমৎ রূপ সনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ’, নব্যভারত, দ্র. দেবীপ্রসন্ন রারচৌধুরী (সম্পা.), দ্বাদশ খন্ড, কলিকাতা, পৌষ ১৩০১, পৃঃ - ৫০০, ৫৫৩।

৮৭) রসিকচন্দ্র বসু, ‘রামপ্রসাদ’, নব্যভারত, দ্র. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.), ত্রয়োদশ খন্ড, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩০২, পৃঃ - ১৬৬।

৮৮) রসিকচন্দ্র বসু, ‘রামপ্রসাদ’, নব্যভারত, দ্র. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.), ত্রয়োদশ খন্ড, কলিকাতা, শ্রাবণ ও আশ্বিন ১৩০২, পৃঃ - ১৬৬, ৩২১।

৮৯) ঐ।

৯০) রসিকচন্দ্র বসু, ‘রামপ্রসাদ’, নব্যভারত, দ্র. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.), ত্রয়োদশ খন্ড, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩০২, পৃঃ - ১৬৬, ১৬৭।

৯১) ঐ, পৃঃ ১৬৯।

৯২) ঐ, পৃঃ ১৭০।

৯৩) ঐ, পৃঃ ১৭৩।

৯৪) ঐ, পৃঃ ১৭০।

৯৫) ঐ, পৃঃ ১৭৩।

৯৬) ঐ, পৃঃ ১৭৩।

৯৭) ঐ, পৃঃ ১৭৩।

৯৮) রসিকচন্দ্র বসু, ‘রামপ্রসাদ’, নব্যভারত, দ্র. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.), ত্রয়োদশ খন্ড, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩০২, পৃঃ -৩২১-৩৩২।

৯৯) ঐ, পৃঃ ৩৩২।

১০০) কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, 'রামপ্রসাদের জাতিনির্ণয়', নব্যভারত, দ্র. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.), ত্রয়োদশ খন্ড, কলিকাতা, পৌষ ১৩০২, পৃঃ-৪৬৯-৪৭৫।

১০১) ব্যোমকেশ মুস্তফী, 'নিত্যানন্দের শীতলা মঙ্গল গোকুল-পালা', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, প্রথম সংখ্যা কলিকাতা, ১৩০৫, পৃঃ -৫১, ৭০। (পত্রিকাটিকে আমরা এমন অবস্থায় পেয়েছি যে উক্ত তথ্য ছাড়া, সম্পাদকের নাম বা আর অন্যান্য তথ্য আমরা সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারিনি)।

১০২) ঐ, পৃঃ ৫১।

১০৩) ঐ, পৃঃ ৫৩।

১০৪) ঐ, পৃঃ ৬৯,৭০।

১০৫) অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, 'স্ত্রী কবি মাধবী', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, (সম্পাদকের নাম পত্রিকা থেকে জানতে পারিনি) পঞ্চম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩০৫, পৃঃ -১৫৯-১৬৪।

১০৬) ঐ, পৃঃ -১৫৯, ১৬০।

১০৭) ঐ, পৃঃ -১৬২, ১৬৩।

১০৮) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য - বিবরণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চম খন্ড, কলিকাতা, ১৩০৫, পৃঃ -১/৯০।

১০৯) রসিকচন্দ্র বসু, 'জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সপ্তম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩০৭, পৃঃ -২১৫-২২৯।

১১০) ঐ, পৃঃ ২১৫,২১৬,২১৭, ২১৯, ২২১, ২২২, ২২৩।

১১১) নগেন্দ্রনাথ বসু, 'জগন্নাথ বিজয়' (সাতখানি টীকা), সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩০৭, পৃঃ ২৩০-২৩৩।

১১২) ব্যোমকেশ মুস্তফী, 'সত্যনারায়ণ কথা', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্র. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (সম্পা.), অষ্টম ভাগ, প্রথম সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩০৮, পৃঃ - ৫৫-৫৭।

১১৩) ঐ, পৃঃ ৫৫,৫৬।

১১৪) যোগেশচন্দ্র রায়, 'খনা', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, (সম্পাদকের নাম জানতে পারিনি) দশম ভাগ, প্রথম সংখ্যা, কলিকাতা ১৩১০, পৃঃ ১।

১১৫) ঐ, পৃঃ ১,২।

১১৬) ঐ, পৃঃ ১২, ১৩, ১৪।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- এই অধ্যায়ে আমরা যে পত্রিকা গুলি দেখেছি, তার অধিকাংশের ক্ষেত্রেই টীকার উপযুক্ত তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি, পত্রিকা গুলির অবস্থার জন্য।

=ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ=

১৮৫৭ বাংলা তথা দেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। সিপাহী বিদ্রোহের উদ্ভব এবং তার ব্যর্থতা সামগ্রিক ভাবে দেশবাসীর মনে যে সংঘাত ও বৈপ্লবিক চিন্তার জন্ম দেয় তার দ্বারা মানুষের মনে 'জাতি' সম্পর্কিত অস্মিতার ধারণা গড়ে ওঠে। এখন জাতির আদর্শ ও মূল্যবোধগুলি তার লোককথা, কাহিনি, মহাকাব্য, ইত্যাদির মধ্যে কম-বেশি লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এই কাহিনি গুলিতে কল্পনা ও বাস্তবের মিশেলের সাথে সাথে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর চরিত্র ও ভাবরূপেরও সন্ধান মেলে। যেমন, দেখা যায় যে অতীতের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে, সে বর্ণনা সত্যনিষ্ঠও হতে পারে আবার কাল্পনিকও হতে পারে, কাহিনি প্রায়ই পাঠক বা শ্রোতাকে সচেতন করে দেয় যে সমবেত ভাবে তাঁরা একই অতীতের অংশীদার।[১] বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশের সাথে সাথে জাতির এই অতীত রোমন্থন আরও বৃহৎ রূপ নেয়।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর প্রথম উপন্যাসে রাজপুত ও মোগল-পাঠান ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে একমাত্র 'রাজসিংহ' ছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাস গুলি যে ঐতিহাসিক উপন্যাস তা মানতে চাননি।[২] যাই হোক, সমকালে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করবার জন্য উপন্যাস লেখবার ও পড়বার উৎসাহ 'জাতীয়তাবাদী' চিন্তা ভাবনারই একটি মূর্ত প্রকাশ। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা ঐতিহাসিকেরা যাই নির্ণয় করুন না কেন, একথা পরিষ্কার যে, জাতীয়তাবাদ ব্যক্তির

জাতি সম্পর্কিত ভ্রান্ত আত্মশ্লাঘা ছাড়া আর কিছুই নয়। উপন্যাসে জাতির মহত্ত্ব, উদারতা, শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করবার মধ্যে দিয়ে পাঠকের মনে দেশের এমন এক মূর্তি প্রস্তুত করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক যা তাদের দৈনন্দিন তুচ্ছতার উর্ধ্বে নিয়ে যাবে। সমকালীন জন জীবনের দৈনন্দিন বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যা সম্ভব ছিল না।[৩] সেই কারণেই বাঙালির ও বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পরিধিতে কোন বীরত্ব ব্যঞ্জক চরিত্রের খোঁজ না পেয়ে ঔপন্যাসিক রাজপুত চরিত্রদের দ্বারস্থ হয়েছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র রাজপুত কুলতিলক জগৎসিংহ, যিনি রাজা মানসিংহের পুত্র। পাঠানদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য মোগল সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত, রাজপুত সুলভ বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন এই ভাবে -

'কুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া তিনি কতলু খাঁর পঞ্চাশৎ সহস্রকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া দিবেন, যদিও এ পর্য্যন্ত তত দূর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখাইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি শিবির হইতে আসিয়া দুই সপ্তাহে যে পর্য্যন্ত যোদ্ধৃপতিত্ব গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মানসিংহ কহিয়াছিলেন, ''বুঝি আমার কুমার হইতে রাজপুত নামের পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।''[৪]

পরাধীন জাতি অতীতের পরাক্রমশালী বিবরণের মধ্যে দিয়ে একথা উপলব্ধি করে যে, তারা নিজেরা বীর না হলেও অন্তত তাদের পূর্বপুরুষরা প্রতাপশালী বীর ছিলেন। এই চেতনাই তাঁদের হীনমন্যতার ওপর অংশত সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে এবং আত্মসম্মান বজায় রাখতে সাহায্য করত।[৫]

আলোচ্য উপন্যাসে পাঠানেরা বিরুদ্ধ পক্ষ রূপে অবতীর্ণ হলেও বঙ্কিমের আরও কিছু উপন্যাসে মোগলদের বা মুসলমানদেরই প্রতিকল্পরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপন্যাসে পাঠানদের কথা বলতে গিয়েই মুসলমানদের ঈশ্বর স্মরণের চিত্র হয়েছে এই রকম -

‘পাঠানেরা শিকার সম্মুখে পাইয়া ‘‘আল্লা-ল্লা-হো’’ চীৎকার করিয়া, পিশাচের ন্যায় লাফাইতে লাগিল।’[৬] জাতীয়তাবাদী অতীত, সবসময় শত্রু সন্ধান করে। এবং শত্রুর দোষ-ত্রুটি, দুর্নীতি- ইত্যাদি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় পরাধীন জাতি এক অদ্ভুত মানসিক শান্তি লাভ করে।

পাঠান জাতির হৃদয়হীনতার অন্যতম বড় উদাহরণ সমসময়ে ধর্মান্তরীকরণ। উপন্যাসে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ‘গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ’ নামক চরিত্রটির ধর্মান্তরীকরণ এবং তার নিষ্ঠুর প্রথা, জগৎ সিংহের সাথে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে -

‘ ‘‘আপনার হাতে ও কি পুতি !’’

‘‘আজ্ঞা এ মাণিকপীরের পুতি !’’

‘‘ব্রাহ্মণের হাতে মাণিকপীরের পুতি !’’

‘‘আজ্ঞা, -আজ্ঞা, আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, এখন ত আর ব্রাহ্মণ নই।’’ .....‘‘আমি মোছলমান হইয়াছি।’’ .....‘‘যখন মোছলমান বাবুরা গড়ে এলেন, তখন আমাকে কহিলেন যে, আয় বামন্ তোর জাতি মারিব। এই বলিয়া তাঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া মুরগির পালো রাঁধিয়া খাওয়াইলেন।’’ ’[৭]

কেউ কেউ মনে করেন যে আধুনিক ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণার শুরু ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন থেকে অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর শুরু ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা থেকে অর্থাৎ ১৭৬৫ সালের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন কোম্পানি দেওয়ানি হাতে পেল, তখন থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরেজ শাসনের হাতিয়ার হল।[৮] অন্যদিকে ইউরোপে বুর্জোয়াদের বা মধ্যবিত্তদের অভ্যুদয়ের সময় এই ইতিহাসবিদ্যাই তদানীন্তন সমাজে সামন্তশ্রেণির রাজনৈতিক আলোক প্রাপ্তির যুগ থেকে সামন্ত শক্তির তিন প্রধান, অর্থাৎ রাজা, ক্ষমতাধারী শাসক ও যাজক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নিরন্তর আক্রমণ চালিয়ে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে। অথচ এই ইতিহাসবিদ্যাই যখন একটি পাশ্চাত্য শক্তির মাধ্যমে এদেশে উপনিবেশ গড়ার কাজে ব্যবহৃত হল, তখনই তার

ভূমিকা পাল্টে গেল। প্রভু শক্তির সমালোচক দেশ হয়ে ওঠার বদলে কালভেদে হয়ে গেল প্রভুশক্তির স্তাবক। সমাজ-শিক্ষা-রাজনীতি-অর্থনীতি সমস্ত কিছুর ওপর শাসক গোষ্ঠীর একাধিপত্যের কাছে অধীনতা স্বীকার করল তারা। উপন্যাসে ওসমানের বক্তব্যে এই অধীনতা স্বীকারের প্রতি কটাক্ষই প্রদর্শিত -

'পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে; কখন ও অধীনতা স্বীকার করে না; একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখন করিবে ও না; ইহা নিশ্চিত কহিলাম।'[৯]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র সেনাপতি ওসমান। উপযুক্ত বীর চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও একজন পাঠান সেনাপতি ও মুসলমান হওয়ার সৌজন্যে তাঁর বীরত্ব পদানত হয়েছে রাজপুত জগৎসিংহের কাছে।

'রাজকুমারের আর ধৈর্য্য রহিল না। শীঘ্র হস্তে ত্যক্ত প্রহরণ ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া শৃগালদংশিত সিংহবৎ প্রচন্ড লম্ফ দিয়া রাজপুত্র যবনকে আক্রমণ করিলেন। সে দুর্দ্দম প্রহার যবন সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজপুত্রের বিশাল শরীরাঘাতে ওসমান ভূমিশায়ী হইলেন। রাজপুত্র তাঁহার বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া হস্ত হইতে অসি উন্মোচন করিয়া লইলেন, এবং নিজ করস্থ প্রহরণ তাঁহার গলদেশে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, ''কেমন, সমর-সাধ মিটিয়াছে ত ?'' ..... তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন ''এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে যাও, তুমি যবন হইয়া রাজপুতের শরীরের পদাঘাত করিয়াছিলে, এই জন্য তোমার এ দশা করিলাম, নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নহে যে, উপকারীর অঙ্গস্পর্শ করে।'' ওসমান মুক্ত হইলে আর একটি কথা না কহিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একেবারে দুর্গাভিমুখে দ্রুত গমনে চলিলেন।'[১০]

ওসমানের মতো বীর চরিত্রদের জন্মই হয় এই জন্য, যেন তাঁরা নিজেরা পরাজিত হয়ে, বিপক্ষকে জয়ী করতে পারে, সেটা রণক্ষেত্রেই হোক বা নারীহৃদয়ে। জগৎসিংহ নিজে বীর বটে, কিন্তু একজন ওসমান চরিত্র পাশে অঙ্কিত না হলে তার বীরত্ব উপযুক্ত মর্যাদা পেত না। বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাসে এমন বেশ কিছু মুসলমান চরিত্র এসেছে যাঁরা শেষ পর্যন্ত কেবল মাত্র মুসলমান বলেই লেখকের

স্বাজাত্যাভিমানের কাছে, হিন্দু বা রাজপুতদের কাছে পরাজিত হয়েছে। আজকের সময়ে যে সমস্ত পাঠকেরা উগ্র জাতীয়তাবাদের পক্ষ সমর্থন করেন না, তারা খুব পরিষ্কার ভাষায় বঙ্কিমের হিন্দু জাতীয়তাবাদী পক্ষপাতকে সমর্থন না করে তাঁর সৃষ্ট হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রগুলিকে মনুষ্যত্ব সুলভ মর্যাদা দান করে। এবং এখানেই এই চরিত্র গুলির সার্থকতা।

মৃণালিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস মৃণালিনী (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৯)। কাহিনিতে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় এবং সেনরাজ্যের অবলুপ্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত। এই দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে আজ পর্যন্ত যে মিথ সাধারণ বাঙালি জীবনে প্রচলিত আছে, তার প্রতিই কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন চিহ্ন আলেখ্যর মধ্যে দিয়ে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের নায়ক একজন মগধ-রাজপুত্র। লক্ষণীয় প্রথম উপন্যাসে রাজপুত বীরত্বের কাহিনি শোনানোর পর এই প্রথম লেখক মুসলিমদের বিপরীতে একজন অ-রাজপুত চরিত্রকে নির্বাচন করেছেন।

সতেরোজন অশ্বারোহী সহ বঙ্গবিজয়ের প্রচলিত কাহিনিকে প্রায় প্রতি পদেই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। তাঁর মনে হয়েছে এই বিজয়ের পেছনে কারণ স্বরূপ মুসলিমদের বীরত্ব যতটা না প্রবল ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গের ভীরুতা প্রদর্শন, প্রধান রাজকর্মচারীদের বিরোধিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। কাহিনিতে বৃদ্ধ সেনরাজা এবং মাধবাচার্য্যের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এই বক্তব্যের প্রমাণ উপস্থিত -

‘মাধবাচার্য্য .....কহিলেন, মহারাজ, তুরকীয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে। .....রাজা কহিলেন, ‘‘আমি কি করিব -আমি কি করিব ?

আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে আসুক।'[১১]

যে সময়ে বঙ্কিম এই উপন্যাসটি লিখছেন তখন বাংলায় সার্বভৌম ক্ষমতা ইংরেজদের। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সমকালে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী ছিলেন। মুসলিম রাজত্বের আগে ও পরে দেশীয় রাজাদের এই অপদার্থতার চিত্রায়ণকে সমকালে ইংরেজ রাজত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবেই উপস্থিত করেছেন ঔপন্যাসিক-

> 'গণিয়া দেখিলাম যে, যবন সাম্রাজ্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে।
>
> তাহা হইতে পারে। কিন্তু কতকালেই বা তাহা হইবে ? আর কাহা কর্ত্তৃক ?
>
> তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি। যখন পশ্চিম দেশীয় বণিক্ বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবেক।'[১২]

মাধবাচার্য্য ও হেমচন্দ্রের এই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকেই পশ্চিমদেশীয় বণিক বলে সম্বোধিত করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের প্রতি ঔপন্যাসিকের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বঙ্গবিজয়ের পরিকল্পনা 'যবন'-রা কীভাবে করেছিলেন উপন্যাসে তার একটি মোটামুটি ছবি আমরা পাই। বৃদ্ধ রাজার শৈথিল্যের সুযোগে তাঁর প্রধান রাজকর্মচারীরা কীভাবে দেশ ও রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ে সহায়ক হয়েছিল, তার মোটামুটি একটা অনুমান আমরা এখানে পাই। এই অনুমানের স্বপক্ষে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ উপস্থিত করা একরকম অসম্ভব, কিন্তু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের মতো করে ইতিহাসকে গড়তে ও পড়তে চাওয়ার তাগিদ উপন্যাসে পরিলক্ষিত।

ইতিহাসে মীরজাফরদের মতো বিশ্বাসহন্তাদের কথা লিখিত থাকলেও সেখানে পশুপতিদের মতো ব্যক্তিরা অনুপস্থিত থাকেন। ইতিহাসের এই ঘাটতি পূরণ হয় সাহিত্যে।

''আমি যবনহস্তে এ রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি; অক্ষমও নহি। আমিই গৌড়ের রাজা, সেনরাজা নাম মাত্র কিন্তু সমুচিত মূল্য না পাইলে আপন রাজ্য কেন আপনাদিগকে দিব ?.....আমিই এক্ষণে প্রকৃত গৌড়ের ঈশ্বর, কিন্তু লোকে আমাকে গৌড়েশ্বর বলে না। আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি। সেন বংশ লোপ হইয়া পশুপতি গৌড়াধিপতি হউক। .....আমার অনুমতি ব্যতীত একটি পদাতিকও যুদ্ধ করিবে না। রাজকোষ আমার অনুচরের হস্তে। আমার আদেশ ব্যতীত যুদ্ধের উদ্যোগে একটি কড়াও খরচ হইবে না। পাঁচ জন অনুচর লইয়া খিলিজিকে রাজপুরে প্রবেশ করিতে বলিও; কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না, ''কে তোমরা?'' ''[১৩]

অভাগা জন্মভূমির এই সমস্ত সন্তানেরা নিজেদের স্বাধীনতার বিনিময়ে, ক্ষমতার মরীচিকার লোভে মুসলমান রাজার প্রতিনিধিত্ব ও বশ্যতা স্বীকার করত। সেই সময় জনসাধারণের মতামত গ্রহণ যোগ্য ছিল না, কারণ দেশ শাসন করবে রাজা, রক্ষা করবে রাজকর্মচারীগণ, সৈনিকেরা। প্রজারা কেবল শোষকের ভূমিকা পালন করবে। তাই রাজা বা কর্মচারী বদলে তাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হত না।

বিশ্বাসঘাতক পশুপতি ও যবন প্রতিনিধির সম্মিলিত পরামর্শের ফলে একদিন-

''বেলা প্রহরেকের সময় নগরবাসীরা বিস্মিতলোচনে দেখিল, কোন অপরিচিতজাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজ ভবনাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদিগের আকারেঙ্গিত দেখিয়া নবদ্বীপ বাসীরা ধন্যবাদ করিতে লাগিল। তাহাদিগের শরীর আয়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট; তাহাদিগের বর্ণ তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ; তাহাদিগের মুখমন্ডল বিস্তৃত, ঘনকৃষ্ণশ্মশ্রু তাহাদিগের যোদ্ধৃবেশ; সর্ব্বাঙ্গ প্রহরণ জাল মন্ডিত, লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর যে সকল সিন্ধুপার-জাত অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়া যাইতেছিল, তাহারাই বা কি মনোহর।.....আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন করিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, ''এক্ষণে আপন আপন কার্য্য কর।'' অমনি বাক্যহীন ষোড়শ অশ্বারোহীদিগের মধ্য হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন সেই ষোড়শ যবনের কটিবন্ধ হইতে ষোড়শ অসিফলক নিষ্কোষিত হইল এবং

অশনিসম্পাত সদৃশ তাহারা দৌবারিকদিগের আক্রমণ করিল। দৌবারিকেরা রণসজ্জায় ছিল না -অকস্মাৎ নিরুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না - মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই নিহত হইল।'[১৪]

সতেরো জন অশ্বারোহী এমন কিছু অনুমান ও প্রত্যক্ষ সাহায্য দ্বারাই সমকালে নবদ্বীপ জয় করতে পেরেছিল। নবদ্বীপ ছাড়া তৎকালীন গৌড়ের অন্য কোথাও তারা বিজয়ী হয়েছিল এমন কথা লেখক বিশ্বাস করতেন না (এ বিষয়ে প্রবন্ধ অংশে আলোচনা করব)। বঙ্গজয়ের সাথে সাথে বিধর্মীদের ধর্মান্তরীকরণের প্রতিও যে তারা নির্মম ছিলেন তার প্রমাণ আরও একবার 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা'-র পরে এই উপন্যাসে আমরা পাই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পারস্পরিক সম্প্রীতির যে পরিচয় আমরা দীর্ঘকাল ধরে পাই না, তার অন্যতম কারণ এই ধর্মান্তরীকরণ।

মুসলমান জয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ -

'রাজপথে যে দুই একজন হতভাগ্য আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ করিয়া রুদ্ধদ্বার ভবন সকল আক্রমণ করিতে লাগিল। কোথায়ও বা দ্বার ভগ্ন করিয়া, কোথায়ও বা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোথায়ও বা শঠতাপুর্ব্বক ভীত গৃহস্থকে জীবনাশা দিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহপ্রবেশ করিয়া, গৃহস্থের সর্ব্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রীপুরুষ, বৃদ্ধ বণিতা, বালক সকলেরই শিরচ্ছেদ, ...কেবল যুবতীর পক্ষে দ্বিতীয় নিয়ম। শোণিতে গৃহস্থের গৃহ সকল প্লাবিত হইতে লাগিল। শোণিতে রাজপথ পঙ্কিল হইল .....শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের মুন্ড সকল ভীষণ ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অশ্বের গলদেশে দুলিতে লাগিল। সিংহাসনস্থ শাল-গ্রাম শিলা সকল যবন - পদাঘাতে গড়াইতে লাগিল।'[১৫]

নৃশংস বীভৎসতার এমন পরিণতি প্রত্যক্ষ করবার পরেও মানুষ বেঁচে থাকে। জীবন বেঁচে থাকে ভবিষ্যতের নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায়। মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে

ভারতবাসীর সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ছবি কল্পনায় অঙ্কন করে তৃপ্তি অনুভব করেন মাধবাচার্য্যেরা -

'এই যবনেরা এ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিয়া অজেয় বলিয়া রাজগণমধ্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভয়ে কেহ তাহাদের বিরোধী হইতে চাহে না। তাহারা একবার মাত্র পরাজিত হইলে, তাহাদিগের সে মহিমা আর থাকিবে না। তখন ভারতবর্ষীয় তাবৎ আর্য্যবংশীয় রাজারা ধৃতাস্ত্র হইয়া উঠিবেন। সকলে এক হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলে যবনেরা কত দিন তিষ্টিবে ?'[১৬]

কাল্পনিক বীর চরিত্রকে কল্পনায় বিজয়ী প্রমাণ করবার মধ্যে দিয়ে হিন্দু শক্তির জয়গান পুনরায় ধ্বনিত। উপন্যাসে মৃণালিনীর স্বপ্ন, ঔপন্যাসিকের স্বপ্ন এবং আপামর, হিন্দু জাতির স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু, নায়ক হেমচন্দ্র বিজয়ী বীরের ধ্বজা নিয়ে কাহিনির শেষে হাজির হয়েছেন। কাল্পনিক বীরের এই কাল্পনিক জয় এবং মুসলমান প্রতিরোধেই বঙ্গবাসী মানসিক আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছে, সার্থক হয়েছে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য।

আনন্দমঠ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে।[১৭] ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। যে প্রেক্ষাপট অবলম্বনে উপন্যাসটি লেখা হচ্ছে, সেই সময়ে -

'টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুল কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে ?'[১৮]

বাংলা রক্ষা করবার একমাত্র উপায় নেড়েদের মেরে তাড়ানো। মুসলমানদের রাজ্যচ্যুত করে ইংরেজদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করালেই বাংলার সুদিন ফিরবে এমন স্বপ্ন ঔপন্যাসিক আমাদের দেখিয়েছেন।

‘এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়রের খোঁয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে অবার পবিত্র করিব।’[১৯]

‘কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, ‘‘মার, মার, নেড়ে মার।’[২০]

প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০-১৯২০, মোটামুটি ভাবে এই সময়কালের মধ্যেই (সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে) ভারতের সাংস্কৃতিক গৌরব অনায়াসে হিন্দু জাত্যাভিমানের সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, এবং মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামই জাতীয় অস্মিতা প্রকাশের একমাত্র চিহ্ন বলে বিবেচিত হবার প্রবণতা দেখা দেয়। যে যুগে এই লেখকরা তাঁদের উপন্যাসে হিন্দু পরাক্রমের বর্ণনা করেছেন তখন ক্ষমতায় আসীন ইংরেজ শাসকেরা। কিন্তু কাহিনির সময়কালে দিল্লিতে মোগলদের প্রভুত্ব ছিল বলে লেখকেরা আপাতবৈরী হিসাবে দেখছেন মুসলমান ধর্মকে। ভারতীয় ইতিহাসে এই বিরোধাভাস নিয়ে কখনো চর্চা হয় না। তুর্কি ও মোগল সাম্রাজ্যকে যদি ধর্মীয় অভিধায় চিহ্নিত করে মুসলমান রাজত্ব বলা হয়, ইংরেজ আধিপত্যের যুগকে অনুরূপ যুক্তিতে খ্রিস্টান রাজত্ব বলা হয়নি কেন? ভারতীয় উপন্যাসের প্রথম যুগে ক্ষমতার সমীকরণ বদলে গেছে। ততদিনে মোগল রাজশক্তি অস্তমিত। ব্রিটিশদের সার্বভৌম দাপট সর্বত্র প্রকাশিত। কিন্তু কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে শত্রু তখনও বিগত দিনের শাসকেরা। এই প্রত্যয়ের প্রাথমিক কারণ হতে পারে লেখকদের অত্যধিক সাবধানতা। পরাধীন জাতির পক্ষে তদানীন্তন প্রভু ইংরেজদের বিরোধাচরণ প্রত্যক্ষ ভাবে করা নিরাপদ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরিতে উন্নতি আটকে যাবার সঙ্গে ‘আনন্দমঠ’ প্রকাশের সম্ভাব্য সম্পর্ক আমরা সকলেই জানি। তার চেয়ে অতীতের রণাঙ্গণে অপেক্ষাকৃত সরল সংঘর্ষ হিসাবে হিন্দু -মুসলমানের যুদ্ধ লেখকের পক্ষে অনেক বেশি আকর্ষক বিকল্প ছিল এবং এর দ্বারা সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন এবং আত্মশ্লাঘা, দুই উদ্দেশ্যই একযোগে চরিতার্থ করা যেত।[২১]

উপন্যাসে মূর্তি পুজোর প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ রূপ নিয়েছে। ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে মায়ের যে স্বরূপের সাথে পরিচিত করিয়েছেন, তার মধ্যে দিয়ে 'মা -যা ছিলেন'[২২] (জগদ্ধাত্রী মূর্তি), 'মা যা হইয়াছেন'[২৩] (কালীমূর্তী), এবং 'মা যা হইবেন'[২৪] (দশভূজা মূর্তি) -এই বক্তব্যই সাকার রূপে ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে দিয়ে হিন্দুদের সাকার মূর্তি পুজোর এবং মুসলমানদের নিরাকার মূর্তি পুজো প্রসঙ্গ হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এসে পড়ে।

'কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।'[২৫]

উপন্যাসে হিন্দুমূর্তি গুলি উজ্জীবনের প্রতীক। যে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দু সন্তানেরা দেশরক্ষায় ব্রতী হয়, দেশ থেকে যবনদের উৎখাত করবার সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে। মূর্তির মধ্যে দিয়ে দেশমাতৃকার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ ও বিষাদবোধ করে। মূর্তির স্বরূপগুলি হিন্দু সন্তানদের কাছে অহংকারের চিহ্নও বটে, যে অহংকারের জন্যই তাঁরা সন্তানব্রত ধারণ করে। পাশাপাশি এসে পড়ে মুসলমানদের নিরাকার উপাসনা প্রসঙ্গ। হিন্দুদের সাকার মূর্তির উক্ত গুণাবলী গুলিই প্রকাশ করে নিরাকারের প্রয়োজন হীনতা।

উপন্যাসে বৈষ্ণবধর্ম এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বৈষ্ণব সাহিত্যের একজন গুণগ্রাহী ছিলেন। বিদ্যাপতি, 'চৈতন্যচরিতামৃত' বা স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রের পদলালিত্য, পদমাধুর্য, বা পেলবতা নিয়ে তিনি খুব বেশি শব্দ খরচ করেন নি। ভৌগলিক দিক থেকে বাংলাদেশের যা অবস্থান, তার ফলে বাঙালিরা এমনিতেই পশ্চিম দেশীয়দের তুলনায় কম পরিশ্রমী, উদ্যমী, জাতির ইতিহাস সম্পর্কে চেতনাবিহীন। এর পর যদি আবার তারা বৈষ্ণব শাস্ত্রের পদলালিত্যে মুগ্ধ হয়ে অহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে, পদমাধুর্যকে আত্মস্থ করে বিদ্যাপতি বা চন্ডীদাসময় হয়ে

বসে তাহলে ইতিহাস লিখন বা দেশোদ্ধার পরিকল্পনা বিশ বাঁও জলে। অতএব বৈষ্ণব শাস্ত্রে সম্মোহিত দেশবাসীকে চেতনাদান করবার জন্য বৈষ্ণব ধর্মেরই এক নতুন ব্যাখ্যা তিনি হাজির করেছেন সন্তান সম্মুখে।

'প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালন কর্ত্তা। ..... চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে-উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্মমাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় - কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন- তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়-সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।'[২৬]

দুষ্টের দমন করবার জন্য প্রয়োজন অধিক সংখ্যক সন্তানসেনা। সেই সেনা শক্তিকে একত্রিত করতে আবার বিষ্ণুই হবেন প্রধান সহায়, একই সঙ্গে ধরণীর উদ্ধার কী ভাবে সম্ভব তার উপায় বিষ্ণুকে অবলম্বন করেই বলে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক -

'তারপর তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে, ভাই, বিষ্ণু পূজা করবি? এই বলিয়া ২০/২৫ জন জড় করিয়া, মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল, সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ধর্ম্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।'[২৭]

যদি কেবল বৈষ্ণব ধর্মের কথা ছেড়েও দিই, তাহলেও এই উপন্যাস 'ধর্ম' সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন কথা আমাদের শুনিয়েছে। ধর্ম বলতে এখানে অবশ্যই 'হিন্দু ধর্ম'-এর কথা বলা হচ্ছে, যে ধর্মে মুরারি 'প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।'[২৮] বলাবাহুল্য এটি ধর্মের একটি অপব্যাখ্যা। মূর্তি পুজোয়

বিশ্বাসী হিন্দুদের মূর্তির প্রতি সম্মোহনের দুর্বলতাকে এখানে ভয় রূপে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আজকে আমরা সম্প্রদায় কেন্দ্রিক মনোভাবের ভিত্তিতে যে ধর্মবোধ গুলিকে দেখি, সেই ধর্ম এবং তার বোধ কোনও দিনই তার মান্যকারীকে বিনষ্ট করবার কথা বলে না। 'ধর্ম' -অর্থে যা আমাদের ধারণ করে থাকে। এখন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ভেদে এই ধারণ প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। যেমন কেউ যদি নিজের জীবনে শৃঙ্খলাবোধকে ধর্ম স্বরূপ জ্ঞান করে তাকে ধারণ করেন, তাহলে অন্য কেউ সেই জায়গায় শিক্ষা-মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিতেই পারেন। কোন সম্প্রদায় যদি সাকার মূর্তিকেই ধর্মবোধের চিহ্ন স্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহলে অন্য সম্প্রদায় এর বিপরীত আচরণ করতেই পারে। সম্প্রদায় ভেদে মূর্তির রূপ ও বিভিন্ন। কিন্তু কোন ধর্মই তার প্রকৃত ধারণকারীকে বিনাশের পথে ঠেলে দেয় না।

মানুষের মনে ভয়ের উদ্রেক ঘটিয়ে তার দ্বারা নিজের কাজ উদ্ধার করতে চাওয়ার প্রচেষ্টায় এই 'ধর্মের ভয়' নামক স্বরূপের জন্ম হয়েছিল। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের দুর্বল মনকে ধর্মের দ্বারা উন্নত বা উপযুক্ত করবার কথা চিন্তা না করে, এক সন্তানের দ্বারা অন্য সন্তানের ঘর ভাঙবার বা পোড়ানোর পরিকল্পনায় ব্যবহার করেছিলেন ধর্মের ধ্বজাধারীরা। এই ধর্মের পূজারিদের কেউই ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য জানেন না, জানেন কেবল উদ্দেশ্য সিদ্ধি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির আরও অনেক সঠিক পথ আছে, কিন্তু সেগুলি বেশ পরিশ্রমযোগ্য ও কষ্টসাধ্য। ফলে সহজতম পন্থা হল, ধর্মকে কেন্দ্র করে ভয় দেখানো, এবং দেব-দেবীদের অলৌকিক শক্তিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত মিথ গুলিও এই ভয়ের ওপরই সিলমোহর দেয়।

'যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির বিনাশহেতু, যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা .....'।[২৯]

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বাংলা উপন্যাসের জন্মের শুরুর লগ্নে ঔপন্যাসিকেরা প্রায় সকলেই ছিলেন ব্যতিক্রমহীন ভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দু। পাঠকদের মধ্যেও অধিকাংশ একই শ্রেণির ছিলেন এমনটা আন্দাজ করা যায়। কারণ

উপন্যাস পড়বার জন্য যতটা স্বাক্ষরতা, শিক্ষা বা অবসরের প্রয়োজন হয়, মুসলমান বা নিম্নবর্গের হিন্দুদের কাছে সে যুগে তা থাকার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিতে লালিত উচ্চবর্গের হিন্দুদের ভারতভূমি সম্বন্ধে জ্ঞান যেভাবে ইউরোপীয়দের দ্বারা উৎপাদিত ও প্রচারিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার একান্ত নিকট সম্বন্ধ। (এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, ইউরোপ বলতে এখানে কেবল মাত্র একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড নয়, বরং শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-এর ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী কথা বলা হচ্ছে)। এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে পরিপুষ্টতা দিতেই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বলা হয়েছে-

'কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস-তোমার প্রাণদান দিলাম, আপাতত ঃ তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।'[৩০]

'শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।'[৩১]

খ্রিস্টান ধর্মের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত ইউরোপীয়রা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এদেশের ঐতিহ্যকে বুঝে উঠতে না পেরে, ইসলাম-পূর্ব ভারতের বিচিত্র আচার-বিচার, বিশ্বাস, ভাবনাকে তাঁরা একটি মাত্র ধর্মীয় সত্তা ও ঐতিহ্য (হিন্দু) হিসেবেই ভেবে নিয়েছিলেন। ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগের ঠিকানা সেই প্রাচীন হিন্দু যুগে, মুসলমান যুগে সেই স্বর্ণযুগের অবসান, ব্রিটিশ শাসনে বা আধুনিক যুগে সেই অন্ধকার অধ্যায় থেকে মুক্তি[৩২] -নবজারণের ধারণা এই বোধ থেকেই শুরু হয়েছিল। এই বোধের পরিবেশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বাদ যাননি। তারই চিত্রণ উপন্যাস-প্রবন্ধে হয়েছে।

সমকালে বঙ্কিমের 'কপালকুন্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', 'সীতারাম' উপন্যাসেও হিন্দু-মুসলিম প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু সেখানে এই প্রসঙ্গের তুলনায় সামাজিক ও অন্যান্য

প্রসঙ্গই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা আমাদের বক্তব্যের প্রয়োজনে কেবল চারটি উপন্যাসকেই নির্বাচন করলাম।

রাজসিংহ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। চতুর্থ সংস্করণ উল্লেখ করবার কারণ, এই সংস্করণে গ্রন্থের আকার প্রথম সংস্করণের তুলনায় প্রায় চারগুণ। প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৮৩, চতুর্থ সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৪।[৩৩] (আমরা আমাদের আলোচনায় এই চতুর্থ সংস্করণকে ব্যবহার করছি বলেই, খ্রিস্টাব্দের নিরিখে 'আনন্দমঠ'এর পরে 'রাজসিংহ' -এর আলোচনা করেছি।)

উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী ও ভারত অধিপতি ঔরঙ্গজেবের প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে। চঞ্চলকুমারী একজন রাজপুত রমণী। মুসলমান বিদ্বেষ তার রক্তে প্রবাহিত। জাতীয়তাবাদী ধারণার বশবর্তী হয়ে কাহিনির শুরুতেই তিনি এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন, যার সূত্র ধরেই গোটা উপন্যাসে মুসলমান সমাজের চিত্র ও চরিত্র পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে -

'চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন - চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন - মড় মড় শব্দ হইল - ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।'[৩৪]

উপন্যাসের এই ঘটনা প্রতীকী। অনুমান করা শক্ত নয় যে সমগ্র হিন্দু জাতির পদদলনে মুসলমান সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে যাচ্ছে -এই চিত্রই ঔপন্যাসিক অঙ্কন করতে চেয়েছেন।

উপন্যাসে আদর্শ হিন্দু নারীর চরিত্র চঞ্চলকুমারীর মধ্যে দিয়ে অঙ্কন করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তার বিপরীতে মূর্ত করে তুলেছেন জেবউন্নিসা ও উদীপুরী বেগমকে। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সর্বাপেক্ষা কাছের দুই নারী। মোগল সাম্রাজ্যের চালিকা শক্তি জেবউন্নিসা। কিন্তু তার নিজের মুখেই তার চরিত্রের স্বরূপ এই রকম -

'আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব ? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।'[৩৫]

মুসলিম শাহাজাদীর কামনা যে কখনও এক পুরুষ সঙ্গে তৃপ্ত হয় না সেই কথাই জেবউন্নিসার মুখ দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে। উপন্যাসটি যখন লেখা হচ্ছে তার অনেক আগেই বাংলায় সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে নারী - পুরুষ সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস বিষয়ে একটি অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। একই সঙ্গে একজন নারী স্বেচ্ছায় বহুগামী হবে, না সমাজ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করবে এই প্রশ্নও এখানে তোলা হয়েছে। প্রাচীন রক্ষণশীল ধারণার বশীভূত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বহুগামীতাকে এক রকম অসতীর লক্ষণ রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন ঠিকই আদর্শ রমণীর পাশে, কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে তিনি নিজে হয়ত বুঝতে পারতেন যে, সেই সময়ে তাঁর এবং সমাজের, কেবল ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকেই নয়, বরং গোঁড়া, রক্ষণশীল, সংকীর্ণ মানসিকতার কাছ থেকেও স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল। একজন নারী হিন্দু হোক বা মুসলিম, তাঁর নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দিয়ে তাঁকে 'অসতী' প্রমাণ করবার চেষ্টায় জাতির কোন স্বরূপ প্রকাশ পায়, -এই প্রশ্ন আমরা ঔপন্যাসিককে করতে চাই। পাশাপাশি জানতে চাই যে রাজসিংহ বা ঔরঙ্গজেবের বহুগামীতা প্রসঙ্গে তিনি নীরব কেন ? কেউ যদি এই মানসিকতাকে যুগলক্ষণ বলে চিহ্নিত করতে চান, তাহলে সেই যুগ এবং তার মানসিকতাকে আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে চাই।

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মুসলিম বিবাহ প্রথার কদর্যরূপকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন ঔরঙ্গজেবের মধ্যে দিয়ে।

'সম্রাট জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন -কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকাপরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দ ধ্বনিতে ধ্বনিত হইত। তাঁহার মহিষী ও অসংখ্য .....বেতন -ভোগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য।'[৩৬]

ঔরঙ্গজেব তাঁর অগ্রজ দারাকে পরাজিত করে যখন সিংহাসনে বসেন, তখন তাঁর সর্বপ্রথম বাসনা জাগে দারার দুই পত্নীকে বিবাহ করবার জন্য -একজন রাজপুত রমণী, অন্যজন খ্রিস্টিয়ানী। যিনি রাজপুত রমণী তিনি নিজ সতীত্বের প্রমাণ স্বরূপ আত্মহত্যা করেন, অন্যজন বিবাহে সহমত হন। যিনি সহমত হন তাঁর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন - ''ইতিহাস এই গণিকার নাম কীর্ত্তিত করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন .....।''[৩৭]

একজন নারী কেবল মুসলমান বলেই 'গণিকা' তক্‌মা পাওয়ার উপযুক্ত ? বঙ্কিমচন্দ্র কোন হিন্দু নারীর উদ্দেশ্যে তো এমন শব্দ ব্যবহার করেন নি। যে রাজপুত রমণী আত্মহত্যা করেছেন তিনি তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করেছেন। কিন্তু যিনি বেঁচে থাকতে চান, -তারও তো ব্যক্তিগত ইচ্ছে আছে। এখন বেঁচে থাকতে হলে যদি ক্ষমতার কাছে মাথা নোয়ানোই একমাত্র বিকল্প হয় তাহলে সে পথে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। একজন নারী স্বেচ্ছায় জীবনের কোন পথ নির্বাচন করবেন সেটা পুরোপুরি তাঁর ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় পড়ে। কোনও সমাজ বা বঙ্কিমচন্দ্র সেটা ঠিক করে দেবেন না। ফলে একজন 'নারী' হিন্দু হোক বা মুসলিম সকলের কাছ থেকে সবসময়ে তাঁর সমান সম্মান প্রাপ্য। যিনি তা করবেন না - ইতিহাস তাকে ক্ষমা করবে না।

উদিপুরী বেগমের পাশে রয়েছেন ঔরঙ্গজেবের প্রধান মহিষী যোধপুরী বেগম। জাতিতে ইনি রাজপুত হিন্দু, কিন্তু -

‘মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাঁহার সুখ ছিল না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানী রাখিতেন। হিন্দু পরিচারিকা দ্বারা তিনি সেবিতা হইতেন; হিন্দুর পাক ভিন্ন ভোজন করিতেন না -এমন কি, ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন।’[৩৮]

এমন শুচিতা প্রিয় ও শুচিতা রক্ষাকারী মহিষীও যখন জেবউন্নিসা ও উদিপুরী বেগমের উদ্দেশ্যে ‘রাক্ষসী’[৩৯] ও ‘ডাকিনী’[৪০] শব্দ প্রয়োগ করেন, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মুসলমান বিদ্বেষী এই হিন্দু রমণী একই সঙ্গে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ হয়েও উপন্যাসে হাজির হয়েছেন।

‘মৃণালিনী’ উপন্যাসে মহম্মদ আলি ও পশুপতির কথোপকথন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একটি গুরুত্ব পূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছিলেন, প্রসঙ্গটি ছিল মহম্মদ আলির ভাষা প্রয়োগ, উভয়ের কথোপকথন কালে মহম্মদ আলি কথা বলছে সংস্কৃতে, কিন্তু -

‘তাঁহার সংস্কৃতের তিন ভাগ ফারসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ যেরূপ সংস্কৃত, তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই।’[৪১]

উক্ত বক্তব্যে যে তীক্ষ্মশ্লেষ প্রকাশিত হচ্ছে, তার থেকে ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসও রক্ষা পায় নি। উপন্যাসে জেবউন্নিসা-মবারক বা জেবউন্নিসা-নির্মলকুমারীর সংলাপের মধ্যে দিয়ে যে ফারসি-বাংলা শব্দের সমাহার ঘটেছে, তার দ্বারা ঔপন্যাসিক মোগলদের ভিন্ দেশীয় পরিচয়কে আরও দৃঢ় করতে পেরেছেন।

‘‘জেবউন্নিসার বড় রাগ হইল। বড় হেমাকৎ-বাদশাহজাদী মেহেরবানি ফারমাইয়া ইয়াদ্ করিতেছেন -তবু নফর হাজির হয় না - বড় গোস্তাকী।’’[৪২]

‘‘মবারক বলিল, ‘‘আমার বহুৎ বহুৎ তস্লিমাৎ, শাহজাদীর অপেক্ষা আমার নিকট বেশ্কিস্মৎ আর দুনিয়ায় কিছুই নাই। কেবল এক আছে। খোদা আছেন, ‘‘দীন্’’ আছে। গুনাহ্ গারী আর আমা হইতে হইবে না।’’[৪৩]

''জেব। মোগল বাদশাহের তক্তে তাউস্ লইয়া যাইতে আসিয়াছিস্ ?

নির্ম্মল। না। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।

জেব। চিঠি কি হইবে ? পুড়াইয়া রোশনাই করিবি ?

নির্ম্মল। না উদিপুরী বেগম সাহেবাকে দিব।''[৪৪]

ফারসি শব্দের পাশে এমন হোঁচট খাওয়া বাংলা শব্দের প্রয়োগ ঔপন্যাসিকের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল। তা না হলে উপন্যাসে অন্যান্য মুসলিম চরিত্র গুলি যে ভাষায় কথা বলেছে জেবউন্নিসা-মবারকের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োগ ঘটাতে পারতেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু তা না করে মুসলিমদের অভারতীয় সুলভ মর্যাদাই তিনি ভাষা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে দিতে দেয়েছেন।

চঞ্চলকুমারীর যে ছবি ভাঙবার ঘটনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের সূত্রপাত, তারই সূত্র ধরে নারী ও ভূমির ওপর অধিকার নিয়ে ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহ পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। ঔরঙ্গজেবের আকাঙ্ক্ষা কেবল রূপনগর রাজ্য অধিকারেই সীমিত নয় -রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণও তার অন্যতম উদ্দেশ্য। যবনের হাত থেকে আত্মসম্মান ও দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য রাজকুমারী কীভাবে বীর প্রবর রাজসিংহকে আহ্বান করেন ও মোগলদের দুর্দম প্রতাপের বিরুদ্ধে পার্বত্যযুদ্ধে কী কৌশলে রাজপুতদের জয় হয় -এই বিবরণই এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য।

ধর্ম ও জাতির মধ্যে সংঘাতে এবং শক্তি ও আধিপত্যের প্রতিযোগিতায় নারীর শরীর এক অন্যতম প্রতীক। ভারতীয় পুরুষের অতীত পরাক্রম প্রমাণ করবার প্রচেষ্টায় নারীর উপস্থিতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। -কিন্তু ঠিক কোন ভূমিকায় ? দেশ ও নারীর রক্ষায় পুরুষের গৌরব, সেইজন্য নারীর কোমলতা, অসহায়তা ও নিষ্ক্রিয়তাকে তার কাম্য চারিত্রিক গুণ বলে মেনে নেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।[৪৫] লুপ্ত আত্মসম্মান পুনরুদ্ধার এবং জাতীয়তাবোধকে সাকার রূপ দেবার সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে প্রবল পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি একজন নারীর

পক্ষে কতখানি অপমানকর, তা বোঝবার বোধ সাহিত্যসম্রাট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জনপ্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না।

রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী ঔরঙ্গজেব রাজ সিংহকে আজ্ঞা দেন যে, তাঁর অধীনস্থ রাজপুতানাকে জেজেয়া দিতে হবে, রাজ্যে গো-হত্যা করতে দিতে হবে এবং সব দেবালয় ভাঙতে দিতে হবে।[৪৬] একথা শোনবার পর থেকেই রাজসিংহ যুদ্ধে উদ্যোগী হন। উক্ত তিনটি শর্তই হিন্দুদের ধর্মবোধে আঘাত করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সবচেয়ে গুরুতর তৃতীয়টি, -যেখানে সব দেবালয় ভাঙতে দিতে হবে এমন শর্ত রয়েছে। এখন, আমরা একটু অন্য কথা বলব। কাশ্মীরের কবি কল্‌হন তাঁর 'রাজতরঙ্গিনী' লিখেছেন একাদশ শতকে। সেখানে রাজ সভাতে একটা মাইনে করা চাকরি হচ্ছে 'দেবোৎপাট -নায়ক' এর। অর্থাৎ দেবমূর্তি গলিয়ে সেই টাকাটা রাজকোষে এনে রাখাই একজনের চাকরি। এই লোকটি ব্রাহ্মণ, সে মাইনে পাচ্ছে এই জন্য যে, সে দেবমূর্তি গলাবে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' -তেও বলা হয়েছে যে যখন রাজকোষের টাকা কমে যাবে তখন দামি ধাতুর মূর্তি গলিয়ে টাকা নিয়ে এস।[৪৭] এখন এই কাজ গুলো কিন্তু কোন মুসলমান ব্যক্তি করছে না, করছে হিন্দু ব্যক্তিরা। এই হিন্দুদের উদ্দেশ্যে ঔপন্যাসিক কি বলবেন ?

বিদেশি ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসের অলিখিত প্রমেয় ছিল ভারতে মুসলমান রাজত্বের স্বেচ্ছাচারিতা এবং দুর্নীতি। এই নৈরাজ্য প্রমাণ করা সাহেব ইতিহাসবিদদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল কারণ এর থেকেই ইংরেজ রাজত্বের প্রয়োজনীয়তা ও ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করা যেত। হিন্দু লেখকদের উদ্দেশ্য ছিল আলাদা, মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রাজপুতদের পরাক্রমের বিবরণ, পরাধীন জাতির কাছে উদ্দীপক মন্ত্রের মত কাজ করবে। যাই হোক, কারণ ভিন্ন হলেও কার্যত ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং হিন্দু ঔপন্যাসিক উভয়েই মুসলমান শাসকদের শত্রুর ভূমিকায়

উপস্থিত করতে ব্যগ্র ছিলেন। কাল্পনিক হিন্দু স্বর্ণযুগের নির্মাণে ইংরেজ ও এদেশীয়দের ভূমিকা একত্রে অনস্বীকার্য।

উপন্যাসে ঔরঙ্গজেব চাতুরীতে কেবল রাজসিংহের কাছেই নয়, নির্ম্মল কুমারীর কাছেও পরাজিত। দিল্লির বাদশাহ একজন রাজপুত দাসীর কাছে কৌশলে পরাজিত হলে, হিন্দুদের আত্মশ্লাঘা যেন আরও বেশি জয় যুক্ত হয়।

'বাদশাহ বাকশূন্য। যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত, পৃথিবীময় যাঁহার গৌরব ঘোষিত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাস, তিনি আজ এই অনাথা, নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত-পরাস্ত। ঔরঙ্গজেব পরাজয় স্বীকার করিলেন। মনে মনে বলিলেন, ''এ অমূল্য রত্ন, ইহাকে, নষ্ট করা হইবে না। আমি ইহাকে বশীভূত করিব।'' প্রকাশ্যে অতি মধুর স্বরে বলিলেন, ''তোমার নাম কি, পিয়ারী ?''[৪৮]

উপন্যাসের প্রায় শেষে রাজপুত ও মোগলদের যুদ্ধে কৌশলে বন্দী মোগলেরা যখন মৃতপ্রায়, তখন রাজসিংহ তার রাজপুতোচিত বক্তব্যে হিন্দুর মহানুভবতা প্রমাণ করেছেন -

''হিন্দু, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন যোগান পরমধর্ম্ম বলিয়া জানে। অতএব হিন্দু, শত্রুকে ও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।''[৪৯]

উপন্যাসটি শেষ হয়েছে চারবছর ধরে উভয়ের যুদ্ধের পর সন্ধির মধ্যে দিয়ে। কাহিনির নাম চরিত্রকে জয়ী করে রাজসিংহের যে ইতিহাস ঔপন্যাসিক পাঠকের সামনের তুলে ধরেছেন তার মধ্যে দিয়ে হিন্দুর বাহুবল উপযুক্ত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুর বাহুবল প্রকাশ করতে গিয়ে মুসলমানদের সম্পর্কে যে একপেশে ধারণা ঔপন্যাসিক পোষণ করেছেন তা ইতিহাস বা উপন্যাস উভয়ের পক্ষেই হানিকর। ইতিহাসকে এমন ভাবে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আমাদের নয়। ইংরেজরা এদেশে আসবার পর শাসনদন্ড যখন মুসলমানদের হাত থেকে নিজেদের হাতে নিতে চাইলেন, তখন তাদের বিস্তর ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছিল। পাশাপাশি তারা একথাও বুঝেছিল যে,

দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু -মুসলমান পাশাপাশি সহাবস্থান করবার পরও উভয়ের মধ্যে ঐক্য ভাব নেই। কারণ মুসলমানদের শাসনকালে মুসলমান প্রজারাই হিন্দু প্রজাদের থেকে বেশি সুযোগ -সুবিধা ভোগ করেছে। সত্যের এই স্বরূপ যখন ইংরেজরা বুঝতে পারল, তখন তারা তাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুদের বেশি গুরুত্ব দিতে লাগল। দীর্ঘ দিন পর শাসকের কাছ থেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করে হিন্দুরা শাসকের স্তাবকতা ও মুসলিমদের বিরোধিতা করতে লাগল।

অনুরূপ সময়ে মুসলমানেরা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে, এতকাল ধরে চলে আসা সুযোগ-সুবিধের উপযুক্ত মর্যাদা না পেয়ে, শাসক গোষ্ঠীর এবং তাদের শিক্ষা দীক্ষার সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ফলে ইংরেজরা, তাদের মতো করে মুসলিম চরিত্র এবং ইতিহাসকে নির্মাণ করতে থাকে। হিন্দুদের মনেও ধীরে ধীরে ইতিহাস সম্পর্কে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় এবং পরবর্তী কালে উপন্যাস-প্রবন্ধ ইতিহাসে তার প্রতিফলন দেখা দেয়। আমরা এই অধ্যায়ে এটাই বলতে চাইছি যে, পত্র - পত্রিকায় 'মধ্যযুগ' -এর বিষয়গত উপাদান নিয়ে চর্চার পর, উপন্যাস-প্রবন্ধে 'মধ্যযুগ -এর রাজনৈতিক ও সামাজিক সময়কাল' সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চেষ্টায় অজস্র ভুলপাঠ ছিল। সব ভুল আজকে ঠিক করা সম্ভব নয়, তাই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ভুল গুলি চিহ্নিত করেই (সব ভুল চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, তাহলে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি হবে) ক্ষান্ত রইলাম।

প্রাবন্ধিক ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

BENGALI LITERATURE

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 'The Calcutta Review' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল যার নাম ছিল 'Bengali Literature',

মূলত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের ‘কবিচরিত’ ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত হরিশচন্দ্র মিত্রের ‘মিত্র প্রকাশ’ -এর সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি লেখা ও ছাপা হয়। রচনাটিতে বাংলা সাহিত্যের কিছু পুরনো ও নতুন কবি লেখকদের আলোচনা ও তাঁদের রচনার সংক্ষিপ্ত মনোগ্রাহী সমালোচনা আছে। প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছাপা হয়নি। কিন্তু পরে জানা গেছে যে সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। অনেকে অনুমান করেন যে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল সম্পর্কে কিছু তীক্ষ্ম মন্তব্য করবার জন্যেই সম্ভবত বঙ্কিম স্বনামে আত্মপ্রকাশ করেন নি।[৫০]

প্রবন্ধটিতে বঙ্কিম জয়দেবকে শুরুর দিকের প্রায় প্রথম সংস্কৃত-বাঙালি কবি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনিও যে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের সর্বকালের সেরা কবিদের সাথে একাসনে বসবার মর্যাদা প্রাপ্ত হন না, সে কথা জানাতেও ভোলেননি। প্রাচীন বাঙালি কবি লেখকদের কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক শুরু করছেন ‘বিদ্যাপতি’ থেকে। প্রাচীন লেখকদের নির্দিষ্ট সময়কাল, ভাষা ও লেখাকে তিনি আনুমানিক তিনশো বছর পুরনো বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্যাপতি যে প্রাবন্ধিকের বিশেষ পছন্দের ছিলেন তা আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়।

বিদ্যাপতির পরেই প্রবন্ধে প্রাচীন কবিদের মধ্যে উল্লেখ পাওয়া যায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর। প্রাবন্ধিকের অনুমান অনুযায়ী ইনি আকবরের সময়ে বর্তমান ছিলেন, পরবর্তী প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে তিনি ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ -এর উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই বইটির সময় কাল সম্পর্কে কোন অনুমানের পথে প্রাবন্ধিক যান নি।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে আলোচ্য প্রবন্ধটি দুটি নির্দিষ্ট লেখার সমালোচনা প্রসঙ্গে রচিত হয়েছিল, এবং সেই সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম কেন কেবলমাত্র ‘বিদ্যাপতি’, কবিকঙ্কণ’, ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ এবং আরেকটু পরে ‘কৃত্তিবাস’ ‘কাশীরাম’, ও ‘ভারতচন্দ্র’ - এর উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থেকেছেন তা বুঝতে পারি নি। কারণ ১৮৭১ সালে তিনি যখন এই প্রবন্ধটি লিখছেন, তার বেশ কিছু সময় আগে থেকেই রামপ্রসাদ - সম্পর্কিত তথ্যাদিও প্রকাশিত হতে শুরু

করেছে, এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রামপ্রসাদ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। এই নীরবতার কারণ ব্যক্তিগত অনীহা না আরও অন্য কিছু তা বোঝা যায় নি।

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবি লেখকদের তিনটি শ্রেণিভুক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণিতে রয়েছেন 'Lyric Poets'[৫১] -রা। এই শ্রেণিভুক্ত বিদ্যাপতি সহ সেই সমস্ত বৈষ্ণব কবিরা যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ বা চৈতন্যকে অবলম্বন করে পদাবলি রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক 'কীর্তন' সম্পর্কেও নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন -

'They are exclusively Vaisnavite, and their songs either celebrate the amours of Krishna or the holiness of Chaitanya. They are stillsung by bands of Bairagis and are popularly known under the name of Kirttan. Their number is immense. The present writer has in his possession a collection which contains more than three thousand of these songs, and he believes that there are other collections equally voluminous. The music to which they are set is peculiar, and is not ordinarily under stood even by the professional musicians of Bengal.....Many of there songs are probably very modern'.[৫২]

দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত হয়ে রয়েছেন সেই সমস্ত লেখকেরা যাঁরা সমকালে চৈতন্যের দ্বারা অথবা পুরাণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কেবল চরিতামৃতের উল্লেখ প্রাবন্ধিক আগেই করেছেন, এছাড়া আলাদা করে আর কোন চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের নাম প্রাবন্ধিক করেন নি। পুরাণ প্রভাবিত লেখার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং লেখকদের মধ্যে কৃত্তিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাস উল্লেখযোগ্য, সংস্কৃত থেকে বাংলায়

অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁরা যে কেবল আক্ষরিক অনুবাদে সীমিত না থেকে ভাবানুবাদেও ব্রতী হয়েছিলেন, এই বিশিষ্টতার জন্যই আজও তাঁদের জনপ্রিয়তা প্রবল বলে প্রাবন্ধিক অনুমান করেন এবং এক্ষেত্রে মূল বা অনুবাদ কোন অংশেরই রসভঙ্গ হয় নি। মুকুন্দরামকেও পুরাণ প্রভাবিত রচয়িতাদের শ্রেণিভুক্ত করে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন -

'Mukundaram Chakravartti - Kabi Kankan - Though he followed no Sanskrit Original, belongs to the same school, and deservedly enjoys an higher reputation than either krittibas or Kasidas. Many passages of his book are touchingly beautiful, but we cannot afford space for extracts. The language of these poets shows no traces of Hindi : but it is still very different from modern Bengali. In poetic power they are decidedly inferior to the best of the Vaisnava poets.'[৫৩]

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়েছিলেন যে সমস্ত লেখকেরা প্রাবন্ধিক তাঁদের তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত করেছেন। সমকালে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারতচন্দ্র রায়; যিনি তখন তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' এবং 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের জন্য জনপ্রিয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তাঁর রচিত হীরা মালিনী চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য, ভারতচন্দ্র সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন -

'He is the father of modern Bengali. His Versification, too, is very good, and it is the model followed by many distin guished poets of the present day, ...'[৫৪]

অত্যন্ত সংক্ষেপে ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিক পুরনো বাংলা ভাষার কবিদের যে পরিচয় দিয়েছেন তা সমকালীন অন্যান্য প্রবন্ধের গঠন, বিষয় ও প্রকাশ ভঙ্গির থেকে একটু আলাদা। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক যে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আমরা সাহিত্যের যে অংশকে 'মধ্যযুগ' নামে অভিহিত করছি, এবং বিষয় বৈচিত্র্য ও কবিদের নিরিখে তার মধ্যেও যে সূক্ষ্ম বিভাজন গুলি করছি, তারই মোটামুটি একটি আদি স্বরূপ এই প্রবন্ধে উল্লেখিত। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রবণতা ছাড়া মননশীল প্রবন্ধেও যে সাহিত্যের বিভাজন সম্ভব ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে তা এখানে দেখানো হয়েছে। শ্রেণিবিন্যাসের সাথে আমরা সম্পূর্ণ সহমত নাও হতে পারি। কিন্তু প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত মেধাপূর্ণ সমালোচনার প্রশংসা অবশ্যই করব।

বাঙ্গালির বাহুবল

পরাধীন বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন ছিল জাতিকে নিজ শক্তির, সাহসের মুখোমুখি দাঁড় করানোর। তাকে নিজের সাহসের, স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের গল্প শোনানোর। সেই তাগিদেই জন্ম 'বাঙ্গালির বাহুবল' নামক প্রবন্ধের। প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১২৮১ বঙ্গাব্দে, প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[৫৫] প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন যে উন্নতিকামী বাঙালির জীবনে উন্নতি নাই, তার কারণ তাদের 'বাহুবল' নেই।[৫৬] বঙ্কিমচন্দ্র সমকালে তাঁর বেশ কিছু লেখাপত্রের মধ্যে দিয়ে এমন আক্ষেপ করেছিলেন যে বাঙালিদের নিজস্ব কোন ইতিহাস নেই, থাকলে অন্তত বাঙালি তার পূর্বজদের স্বরূপ অনুধাবন করে নিজেদের উদ্দীপিত করবার চেষ্টা করতে পারত।

জাতিকে তার পূর্বগৌরব স্মরণ করাবার জন্য প্রাবন্ধিক পর্যায়ক্রমে যে কথাগুলি বলেছেন তার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমত -

'দিগ্বিজয়ী আরবেরা তিনশত বৎসরে পশ্চিম ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে। পশ্চিম ভারতবর্ষীয় দিগের বীর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।'[৫৭]

উপরিউক্ত তিনটি বাক্য থেকে কয়েকটি কথা বেশ পরিষ্কার -

(ক) আরব নামক জাতি তাঁদের বৈশিষ্ট্যের সুবাদে অত্যন্ত বীর ও সাহসী ছিলেন; সেই কারণেই তাঁরা দিগ্বিজয় করতে পেরেছিলেন।

(খ) কিন্তু দিগ্বিজয়ী হয়েও তাঁরা ভারতবর্ষের পশ্চিম অংশ তিনশো বছরেও অধিকার করতে পারে নি, কারণ পশ্চিম ভারতীয়রা তুলনায় বেশি সাহস ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন।

(গ) উক্ত কথাগুলি আজকে আমরা জানতে পারছি এইজন্য, যেহেতু পশ্চিম ভারতীয়দের ইতিহাস ও বীরত্বের চিহ্ন সংরক্ষিত।

''দ্বিতীয়ত -শুনা যায় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়নগরী বড় সমৃদ্ধশালিনী হইয়াছিল। .....অন্যত্র তাঁহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক।''[৫৮]

উপরিউক্ত বাক্যগুলি থেকেও কয়েকটি ধারণা পরিষ্কার -

(ঘ) বাংলায় পাল ও সেন বংশের রাজত্বের কোন লিখিত প্রমাণ নেই, (অন্তত সেই সময় পর্যন্ত সামান্য কিছু নিদর্শন ছাড়া) ফলে তাঁদের সম্পর্কে মৌখিক কিংবদন্তীই প্রচলিত।

(ঙ) গৌড়নগরের সমৃদ্ধশালী হওয়ার কাহিনিও কিংবদন্তীর মধ্যেই বেঁচে আছে।

(চ) গৌড়ের বাইরেও যে তাঁরা রাজ্য জয় করতে পেরেছিলেন, -এ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা প্রমাণের ভিত্তিতে অমূলক।

বাঙালিদের সম্মিলিত নিচেষ্টাতাই যে এই কিংবদন্তী গড়ে তোলবার পক্ষে সহায়ক তা বলাই বাহুল্য, প্রাবন্ধিক প্রকৃত বাহুবলের অধিকারী হয়ে বাঙালিকে এই নিচেষ্টতা দূরীকরণ করতে বলেছেন। প্রকৃত বাহুবল অর্থে -

'উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়',[৫৯]

বাঙালি জাতির প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন তারা ব্যক্তিগত অধ্যাবসায়ের দ্বারা, সাহস সঞ্চয় করে, ঐক্যবদ্ধ পদ্ধতিতে যে কোন কাজে শারীরিক শক্তিকে সম্মিলিত করে উদ্যমী হয়ে উঠবে। বঙ্কিমচন্দ্র আশাবাদী যে -

'বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।'[৬০]

ভারত-কলঙ্ক

বৈশাখ ১২৭৯-র 'বঙ্গদর্শন'[৬১] পত্রিকায় 'ভারত-কলঙ্ক' নামাঙ্কিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পরাধীন ভারতীয় জাতির পূর্বপুরুষরা যে পরাধীন ছিলেন না, বিভিন্ন উদাহরণ, তথ্য প্রসঙ্গ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে বোঝাতে চেয়েছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ তৎকালীন হিন্দুরা বিদেশি শক্তির কাছে বারবার অধীনতা স্বীকারের মধ্যে দিয়েই যে ক্রমে বাহুবলহীন হতে শুরু করেছিল একথা প্রাবন্ধিক বিশ্বাস করতেন।[৬২] বঙ্কিমচন্দ্র এই সূত্রেই ভারতীয়দের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা বারবার অনুভব করতেন। সমকালীন বা পূর্ববর্তী ভিনদেশীয় ইতিহাস রচয়িতাদের লেখাপত্রে যে এদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস চিত্রিত হবে না তা বলাবাহুল্য, কারণ প্রত্যেক রচয়িতাই তাঁর নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের মতো করেই ইতিহাসের নির্মাণ করবেন। সে ক্ষেত্রে নিজের দেশ বা জাতির পরাজয় স্বীকার করে অন্যদেশ বা জাতিকে মহৎ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করবেন এমনটা হতে পারে না, এমনকী

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যখন 'বাঙালির ইতিহাস' কেন্দ্রিক বিভিন্ন লেখালেখি করছেন, সেখানে তিনি নিজেও অন্যজাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেদের গরিমাকেই বড়ো করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। দেশ -কাল নির্বিশেষে প্রত্যেক ইতিহাসকারই এমনটা করেন, এর ফলে যেটা হয় যে প্রকৃত সত্য আড়ালে থেকে গিয়ে নিজস্ব মতামতটাই প্রধান হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম এবং ইউরোপীয় উভয় ঐতিহাসিকদের লেখাপত্র পড়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে -

'অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠা ভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাস বেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ্য নির্ণীত হয় না।'[৬৩]

দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়[৬৪]-দের সাহায্যেও যে সত্য উঠে আসবে তা প্রকৃত নাও হতে পারে নিরপেক্ষতা না থাকার কারণে।

প্রাচীন হিন্দুজাতির 'রণনৈপুণ্য'[৬৫]-কে অগ্রাহ্য করে তাদের হীনবল প্রমাণের চেষ্টা করেন যারা, তারা একথা বলতে পারেন মূলত কয়েকটি কারণ অবলম্বন করে। প্রাবন্ধিকের নিজ বক্তব্য অনুযায়ী উক্ত কারণ গুলি এই রকম -

'প্রথম, -হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই; - আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না।'[৬৬]

'দ্বিতীয় কারণ - যে সকল জাতি পররাজ্যপহারী, প্রায় তাহারাই রণপন্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট

হইয়া, পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীর গৌরব লাভ করে নাই।'[৬৭]

'তৃতীয় কারণ-হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি ?'[৬৮]

প্রাচীন ভারতীয় রাজারা তৎকালীন ভারতীয় ভূ-খন্ডের বাইরে দেশজয়ের পরিকল্পনায় অনিচ্ছুক থাকলেও পারস্পরিক আক্রমণে উৎসাহ প্রদর্শন করতেন। ভারতীয়দের পরাধীন হওয়ার আরও একটি কারণ তাঁদের ঐক্যহীনতা। পারস্পরিক আক্রমণে সেই ঐক্য কোন ভাবেই রক্ষিত হত না। ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা দেশান্তরী হতে চাইতেন না এই জন্যও যেহেতু তারা বিধর্মীদের এবং তাদের ধর্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন,[৬৯] এবং এক্ষেত্রে অন্তত মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের মনোভাব উপন্যাস প্রবন্ধে আমরা অচিরেই বুঝতে পারি। বলাবাহুল্য নিজের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধ গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের যে তথ্য প্রমাণ উপস্থিত করেছেন সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট উৎস নির্দেশ করেন নি। ফলে তথ্যাদি এবং মতামত কোথাও কোথাও একীভূত হয়ে গেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত সাধারণ ভারতবাসীর কাছে 'স্বাতন্ত্র্য', 'স্বাধীনতা' জাতীয় শব্দগুলি অপরিচিত ছিল। স্বদেশি বনাম স্বদেশি বা স্বদেশি বনাম বিদেশি রাজায় যুদ্ধ হলে সাধারণ মানুষের মনোভাবে খুব বেশি পরিবর্তন হত না, কারণ রাজা যেই হোক না কেন, তাদের অবস্থার পরিবর্তন যে তার ফলে হবে না, একথা জনসাধারণ নিশ্চিত ভাবে অনুভব করতে পেরেছিল। ফলে নিজ রাজ্য, সম্পত্তি রক্ষায় রাজারা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হতেন, তখন কোন কারণে রাজা বন্দী হলে বা মৃত্যু প্রাপ্ত হলে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে যেত, প্রতিনিধি স্বরূপ নতুন করে আর কেউ যুদ্ধে উদ্যোগী হত না।[৭০] কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের আগে যেদিন থেকে জনসাধারণ অনুভব করতে শেখে যে তাদের সাম্প্রদায়িক ভাবনা বা ধর্ম ভাবনা আঘাত প্রাপ্ত হতে শুরু

করেছে, সেইদিন থেকেই সমবেত প্রতিবাদ শুরু হয়, ফল সিপাহী বিদ্রোহ। যে বিদ্রোহ ধর্মের, সম্প্রদায়ের, জাতির এক নতুন তাৎপর্য বয়ে আনে জনগণের কাছে।

এখন রাজা এদেশী হোক বা ভিন্ দেশিয়, এর ফলে সাধারণের মধ্যে যখন কোন তাপ উত্তাপ নেই, তখন পরাধীনতার এক নতুন ব্যাখ্যা উঠে আসে দেশীয় ঐতিহাসিকদের কাছে। তাঁরা মনে করেন তার অর্থ এই যে, পরাধীন জাতি পরাধীনতা স্বীকারের মধ্যে দিয়ে নিজেদের কৃতার্থ করে ফেলে, 'যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি ?''[৭১] -এই মনোভাব ঐ পরিচয়েরই দ্যোতক। উভয়কেই সমান বিবেচনায় ভিন্দেশীয়দেরও তারা আপন করে নিয়েছে, যে ভিন্দেশীয়রা বরাবর 'সর্ব্বরত্ন প্রসবিনী' ভারতবর্ষকে তার সম্পদ শৌর্যের লোভে ক্রমাগত আক্রমণ করে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশীয় জনগণ তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা পায় নি কারণ, স্বদেশিও বিদেশি কোন পক্ষের সাথেই তাদের -''একতা বোধ নাই।''[৭২]

বাঙ্গালার ইতিহাস

'বাঙ্গালার ইতিহাস' নামক সমালোচনা মূলক প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৭৩] প্রবন্ধটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনার সমালোচনা রূপে প্রকাশিত, রচনাটির নাম -'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'।[৭৪] ইতিহাস না থাকার একটি নতুন কারণ প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে আমাদের জানিয়েছেন - 'দেবভক্তি'।[৭৫] পুরাণ অবলম্বন করে বাংলায় যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে তার উদ্দিষ্ট অবশ্যই কোন না কোন দেবদেবী, কিন্তু সেই সমস্ত লেখাপত্রে দেব মাহাত্ম্য কীর্তনের সাথে সাথে এমন অনেক তথ্য সংকেতও রয়েছে যার দ্বারা তৎকালীন জনজীবন সংক্রান্ত অনেক সূত্র আমরা পাই যা পরবর্তীকালের ইতিহাস গঠনে সহায়ক। কিন্তু ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ্যা আমাদের মানসিকতা এমন ভাবে গড়ে তুলেছিল, যার ফলে পূর্বজদের রচিত সাহিত্যে জনসমাজের পরিচয় না খুঁজে আমরা

কেবলই দেখলাম দেব মাহাত্ম্য চিত্রণ এটা সাহিত্যের একটি ভুল পাঠ, যার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও অছন্ন ছিলেন। এটা ঠিক যে আজকে বাঙালির ইতিহাসের যেটুকু পরিচয় আমরা পাই তার দ্বারা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে বাঙালি জাতি বরাবরই ধর্মভীরু, (যদি মূর্তি পুজো মান্যতাকেই কেবল ধর্ম বলা যায় তাহলে) এবং তারা চারছত্রের দ্বারা নিজেদের জীবন কথা অঙ্কন করবার স্থানে দেবমাহাত্ম্য অঙ্কন করে গেছে। এখন ঘটনা হচ্ছে যে 'ইতিহাসচর্চা' যে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার ফল তা আমরা আগেই বলেছি। ইংরেজ আগমনের পরেই বাঙালি তথা ভারতবর্ষ 'ইতিহাস' শব্দটির সাথে প্রথম পরিচিত হয়। তার আগে পর্যন্ত ইতিহাস খায় না মাথায় দেয় - এই বোধটার সাথেই এদেশবাসীর পরিচয় ছিল না। ফলে তারা ইতিহাস শিখবে কি করে? দেবমাহাত্ম্য অঙ্কন তারা ইতিহাসের প্রয়োজনে করে নি, পরম্পরা ক্রমে চলে আসা জীবন বোধ অনুযায়ী করেছিল। যে বোধ তাদের নিজ জীবন চিত্র অঙ্কনের আগে দেবমহিমা অঙ্কনে প্রবৃত্ত করে। এই বোধ প্রকৃত পক্ষে 'বিনয়ের বোধ' -মজ্জায় মিশে থাকা পিতা-পিতামহের শিক্ষা। আর ইউরোপীয়দের বোধ - 'গর্ব্বিত বোধ'।[৭৬] এখন ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র যে এদেশীয়দের 'বিনীত বোধ'-এর তুলনায় ইংরেজদের 'গর্ব্বিত বোধ' -কেই বেশি প্রাধান্য দেবেন, এতে আশ্চর্য কি ?

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনাটির সমালোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক মূলত যে পাঁচটি বক্তব্যের ওপর আলোকপাত করেছেন তার মধ্যে কোন কোনটির সাথে প্রাবন্ধিকের পূর্বোক্ত বক্তব্যের অনৈক্য দেখা যায়। প্রথমত তিনি জানিয়েছেন -

'সিংহল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরাজিত,.....যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ...ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ ঔপনিবেশিকতা দেখান নাই।'[৭৭]

‘ভারত-কলঙ্ক’ প্রবন্ধে বঙ্কিম জানিয়েছিলেন যে ভারতীয়রা কখনই নিজ গন্ডীর বাইরে রাজ্য জয়ে যায় নি। এখন সিংহলদ্বীপ-যবদ্বীপ-বালিদ্বীপ বাঙালির উপনিবেশ ছিল এমন প্রমাণ যদি পাওয়া যায়, তাহলে পূর্বোক্ত প্রবন্ধের বক্তব্য খানিকটা নস্যাৎ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, প্রাবন্ধিক সমালোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন -‘বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় দেবপালদেব ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া কীর্ত্তিত। লক্ষ্মণসেনের জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্ততঃ ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন।’[৭৮]

এ প্রসঙ্গে ‘বাঙ্গালির বাহুবল’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়ে ছিলেন -

‘বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গ প্রভুত্বের কোন কিম্বদন্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছু নাই।’[৭৯]

বলাবাহুল্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস’ রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার আগে বঙ্কিমের ‘ভারত-কলঙ্ক’ এবং ‘বাঙ্গালির বাহুবল’ নামক প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়, যার ফলে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের তথ্যাবলীর সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক তথ্যের কিছু অমিল পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ‘প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস’ সম্পর্কে জানিয়েছেন -

‘অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য।’[৮০]

প্রাবন্ধিক যে খুব ভুল বলেননি, তার প্রমাণ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনাটিকে স্মরণে রাখলে বোঝা যায়।

মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী সহ বখ্তিয়ার খিলজি যে বাংলা জয় করেছিলেন এই কিংবদন্তী বঙ্কিমচন্দ্র কোনও দিনই মেনে নেন নি। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত

‘মৃণালিনী’ উপন্যাসই তার প্রধান পরিচয়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও এই মত সমর্থন করতেন। সেই সমর্থনের উল্লেখ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন -

‘পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদয় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দর বন সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিল; পূর্ব্বে চট্ট গ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৯ পৃষ্ঠা’।[৮১]

চতুর্থ এবং পঞ্চম যে বক্তব্য দুটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তারা উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক। প্রাবন্ধিক বাংলা সাহিত্যের মানসিক ঔজ্জ্বল্যের পরিচয় স্বরূপ চৈতন্যদেব, তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পদাবলিকার, সমকালীন নৈয়ায়িকদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে এই ঔজ্জ্বল্যের অন্যতম কারণ পাঠান রাজত্ব, এবং এর পরে বাংলায় ভালো লেখা পাওয়া যায় না কারণ মোগল রাজত্ব।[৮২] প্রাবন্ধিক সমালোচনা প্রসঙ্গে অবলীলায় যখন কথাগুলি বলেছেন তখন এটা মেনে নিতেই হয় যে, বক্তব্যগুলির প্রতি প্রাবন্ধিকের সমর্থন ছিল। কিন্তু ১৮৭১ -এ প্রকাশিত ‘Bengali Literature’ -প্রবন্ধে বঙ্কিম নিজে মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ভারতচন্দ্রের প্রভূত প্রশংসা করেছেন, বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রতি ব্যক্তিগত পক্ষপাত সত্ত্বেও। তার পরেও বৈষ্ণব শাস্ত্রের পরে বাংলায় ভালো সাহিত্য আর রচিত হয় নি এমন কথা প্রাবন্ধিক কী ভাবে মেনে নিলেন তা অনুমান করা শক্ত। ফলে বিদ্যাপতি থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত ‘Bengali Literature’ অনুযায়ী সমস্ত রচনাই

যদি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সহ অনবদ্য হয়, তাহলে পাঠান - মোগল রাজত্বের প্রসঙ্গ সে ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে পড়ে।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' প্রত্রিকার ১২৮৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়।[৮৩] প্রবন্ধটি তার পূর্ব ইতিহাস বিষয় প্রবন্ধ গুলিরই অনুবর্তী। -বিষয় ও বক্তব্য মোটামুটি একই। তা সত্ত্বেও দুই-একটি বিশেষ কারণে প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ উপনিবেশের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সময়কে, বিশেষ করে মুসলমান শাসনকে যে নেক নজরে দেখতেন না তার প্রমাণ উপন্যাস গুলিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধেও এ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আভাস অবশ্যই আছে, কিন্তু এই নির্দিষ্ট প্রবন্ধে তিনি তাদের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন। মুসলমান লিখিত ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য -

'আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে সে বাঙ্গালি নয়।'[৮৪]

'সেই গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোল কল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিন্‌হাজ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয় ! বিশ্বাস না করিবে কেন ?'[৮৫]

ভিন্‌জাতীয় ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের কথা নিজেদেরই লিপিবদ্ধ করবার জন্য সম্মিলিত বাঙালিকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রাবন্ধিক। ইতিহাস অন্বেষণের পথনির্দেশ জানাতে গিয়ে তিনি শুরু করেছেন বাঙালির উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন থেকে। এই প্রশ্নটি প্রাবন্ধিকের মনে এসেছিল

ভিন্‌দেশীয় ঐতিহাসিকদের ইতিহাস পড়ে, যেখানে তারা, বাঙালিরা পুরোপুরি আর্য না অনার্য এই প্রশ্নে মশগুল ছিলেন।[৮৬] এই প্রশ্নাবলীর উত্তর অন্বেষণের রাস্তায় হেঁটে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র এসে থামছেন মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যায়ে। এই পর্যায়ে এসেই প্রাবন্ধিক তাঁর বক্তব্যকে শেষ করেছেন কিছু মোক্ষম প্রশ্ন তুলে, এবং তিনি মনে করেন যে শেষ পর্যায়ের এই প্রশ্নগুলিই বাঙালির ইতিহাস রচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করবে।

'এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। .....ইহার অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোক - কৃষিজীবী। .....অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল ? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল ? কেন মুসলমান হইল ? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে ? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই'।[৮৭]

প্রাবন্ধিকের এই মন্তব্যের সাথে আমাদের সংযোজন কেবল এইটুকুই যে অন্বেষণের এই পথ কেবল মুসলমান শাসন পর্যন্ত এসেই কেন থেমে গেল? ইংরেজ উপনিবেশেও বাঙালিরা তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগের ইতিহাস নিয়ে বর্তমান ছিল। তাহলে সমসময় পর্যন্ত ইতিহাসের কালসীমাকে কেন টেনে আনলেন না, প্রাবন্ধিক ? কেবল মাত্র মুসলিম ঐতিহাসিকরাই যে নিজ জাতির গুণ কীর্তন করে অন্যজাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন তা নয়, ইতিহাসের ভালো ছাত্র বঙ্কিমের এটা জানা উচিত ছিল, বা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরাও সমদোষে দুষ্ট। তাহলে কেবল মাত্র মুসলিমদেরই কটুকথা বলেছেন কেন তিনি ? - ব্যক্তিগত জায়গা থেকে ? না সরকারি চাকরিতে পদোন্নতির আশায় ? আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, যে মোগল শাসনের প্রতি বারবার অনাস্থা প্রকাশ করেছেন প্রাবন্ধিক, সেই মোগল শাসনের শেষ পর্যায়ে এসেও বাঙালিরা ফার্সি পড়ছে এবং উত্তম

রূপে শিখছে, উদাহরণ - ভারতচন্দ্র। পাঠান - মোগল রাজত্বের সমকালে বাংলায় যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে সেই সাহিত্যে কোথাও কিন্তু প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে 'প্রবলভাবে' মুসলিম শাসন বা চরিত্র সম্পর্কে তীক্ষ্নবাণ বর্ষিত হচ্ছে না। যাঁরা সমসময়ে বর্তমান তাঁরা প্রায় উদাসীন এই ভাবনা - চিন্তা সম্পর্কে। অথচ ইংরেজ উপনিবেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা -দীক্ষায় লালিত শিক্ষিত বাঙালিরা মুসলিমদের সুনজরে দেখছেন না, সমসময়ের বিভিন্ন লেখা পত্রে ক্রমাগত -ভুল 'মুসলিম পাঠ' করে যাচ্ছেন। জাতির চরিত্র ও ইতিহাস নির্মাণে এই প্রবণতা ছিল ভয়ংকর। সেই ভুলের কুফল আমরা আজও প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে বহন করে চলেছি। যদি ভবিষ্যৎও এই পরিণামকে বয়ে নিয়ে যায়, তাহলে তার দায় বঙ্কিমচন্দ্র ও সমসাময়িক লেখকেরা এড়াতে পারবেন না।

ঔপন্যাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কাঞ্চনমালা

'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক এই উপন্যাস সম্পর্কে জানিয়েছিলেন ১ ফাল্গুন ১৩২২[৮৮]-এ যে -

'১২৯০ (১২৮৯) সালে যখন ঁসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক তখন 'কাঞ্চনমালা' 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ হইয়াছিল'।[৮৯]

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়।[৯০] এবং পত্রিকায় প্রকাশের প্রায় তেত্রিশ বছর পরে উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।[৯১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস যখন বঙ্গদর্শনে ছাপা হচ্ছে, তখন তাঁর বয়স ২৯ বছর।[৯২] উপন্যাসের মূল চরিত্র রাজা অশোক, তাঁর মহিষী তিষ্যরক্ষা, অশোকের প্রথম স্ত্রীর পুত্র কুণাল, কুণাল পত্নী কাঞ্চনমালা প্রমুখেরা।

উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ সংঘাতের আভাস আছে এবং পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং জয়গানের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উপন্যাসটি তার চরিত্র -নির্বাচন, প্রেক্ষাপট চয়ন বা সমকালীন কিছু ঘটনা নির্দেশের মধ্যে দিয়ে নির্দ্বিধায় ঐতিহাসিক তক্‌মায় উপনীত হয়েছে। যে সময়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাসটি লিখছেন, লক্ষণীয় হল সেই সময়ের নিরিখে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনপ্রিয় হিন্দু-মুসলমান ছককে তিনি ব্যবহার করেন নি। বরং আলাদা করে বৌদ্ধ প্রভাবকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে এই উপন্যাসটি লিখেছেন। তাঁর এই বৌদ্ধ প্রভাবের প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন -

'আমাদের দেশে আধুনিককালে বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনায় অগ্রণী ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি যখন নেপালে প্রাপ্ত পুথি নিয়ে সংস্কৃতে - অল্পবিস্তর প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষায় -লেখা মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রের বিবরণ লিখতে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁর অসুস্থতার দরুন ভালো সহকারীর আবশ্যক হয়। অনুকূল দৈব সংঘটনায় সেই কাজে রাজেন্দ্রলাল হরপ্রসাদকে গ্রহণ করেছিলেন (১৮৭৮ খৃঃ)। হরপ্রসাদ তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। মিত্র ও শাস্ত্রীর এই যুক্ত প্রচেষ্টার ফল The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (১৮৮২ খৃঃ)। ..... বৌদ্ধশাস্ত্রের বিশেষ করে মহাযান দর্শন ও তান্ত্রিক সাহিত্য আলোচনার ফলে তাঁর ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়েছিল। আর সংস্কৃত পুথির সাগর মন্থন করায় তাঁর ইতিহাসবোধ গভীর ও সূক্ষ্ম হয়েছিল। তিনি ইতিহাসের বই পড়ে ঐতিহাসিক হন নি, পুথি ঘেঁটে প্রাচীন দলিল হাতড়ে, নানা দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ক্রিয়াকর্ম আচার ব্যবহার অনুধাবন করে তাঁর ইতিহাস জ্ঞান মজ্জাগত হয়েছিল। এইজন্যে বাঙালি ঐতিহাসিকদের মধ্যে অগ্রণী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম, এবং পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকের নামমালায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম সর্বাগ্রগণ্য।'[৯৩]

উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংঘাতের প্রসঙ্গ থাকলেও, কাহিনিতে মূল প্রতিপক্ষ রূপে উভয়ে চিহ্নিত নন, বরং উপন্যাসের নায়ক কুণালের প্রতিপক্ষ রূপে

তারই বিমাতা তিষ্যরক্ষা আবির্ভূত। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের সাথে উপন্যাসের এক সূক্ষ্ম যোগ রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় -

'তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, পন্ডিতের বংশধর। তিনি নিজে খুব বড়ো পন্ডিত ছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক বড়ো পন্ডিতের তুলনায় তিনি অসামান্য ছিলেন। তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়েছিল টোলে। কিন্তু তার পর শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি কলেজে। তিনি ছিলেন এম.এ পাশ পন্ডিত। .....হরপ্রসাদের আচার - ব্যবহার যথাসম্ভব ব্রাহ্মণ পন্ডিতের মতো ছিল।'[৯৪]

নিজে শিক্ষা এবং দীক্ষায় পুরোপুরি ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে ব্রাহ্মণত্বের অভিমান যে ঔপন্যাসিক ত্যাগ করতে পারেন নি, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই উপন্যাসের ব্রাহ্মণ প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র 'কুঞ্জরকর্ণ'। বৌদ্ধধর্মাচারী অশোকের সামনে বন্দী অবস্থায় অশোককেই 'বিধর্মী'[৯৫] সম্ভাষণ করে 'ইষ্টদেবের নাম করিতে করিতে[৯৬] সে যখন 'দেহত্যাগ'[৯৭] করল তখন তার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত পরাজয় স্বীকার অবশ্যই ছিল কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের নতি স্বীকার ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পরাজিত হলেও ঔপন্যাসিক নিজ মুন্সীয়ানায় সেই পরাজয়কেও বীরের মর্যাদা দান করেছেন। তা না করলে তাঁর নিজের অহমিকাবোধই হয়ত কোথাও আঘাত প্রাপ্ত হত।

উপন্যাসে বৌদ্ধধর্মের মান -মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ঔপন্যাসিক কোথাও কার্পণ্য করেন নি। বৌদ্ধধর্মের যা কিছু ভালো তার সবই তিনি এখানে হাজির করেছেন। সমকালে সমাজে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ উভয়ের কাছেই বৌদ্ধধর্ম কতখানি জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ আমরা এই কাহিনিতে পাই। এমনকি কুণালের প্রভাবে এক চন্ডালের হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের প্রসঙ্গও পাই। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যে জনজীবনে সুদূর প্রসারী ও শুভফলদায়ক ছিল সে কথাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে।

'কুণাল .....বলিতে লাগিলেন, ''হে ত্রিরত্ন ! হে ধর্ম ! হে সঙ্ঘ ! হে বুদ্ধ ! হে বোধিসত্ত্ব ! প্রত্যেক বুদ্ধ ! শুদ্ধ বুদ্ধ ! জীবনমুক্তগণ, তোমরা সাক্ষী,

আমরা স্ত্রী পুরুষ অদ্য শুভদিনে, শুভক্ষণে, সদ্ধর্মের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও প্রচারের জন্য জীবনের অংশ উৎসর্গ করিলাম। যাহাতে সদ্ধর্মের উন্নতি নাই, যাহাতে বুদ্ধদেবের মহিমা ঘোষণা নাই, এমন কার্য আমরা কখনো করিব না। অদ্যাবধি ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, বিদ্যা যদি কখনো চাই, সে কেবল ঐ একমাত্র কার্যের জন্য। হে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বগণ, আমাদের চিত্তস্থৈর্য সম্পাদন করো।'' সহসা মঠায়তনের দীপ হাসিয়া উঠিল। .....বোধিসত্ত্বগণ যেন বলিলেন, ''তোমাদের মঙ্গল হউক''।[৯৮]

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান দুটি চরিত্র রাজপুত্র কুণাল ও তার মহিষী কাঞ্চনমালা। চরিত্র দুটি আলাদা ভাবে ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি, বরং দুইজনেই খানিকটা আবেগপূর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন। ফলে আলাদা করে চরিত্র হয়ে ওঠার বদলে উপন্যাসে এরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদের প্রতিনিধি রূপেই চিত্রিত হয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে সময়ে 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস লিখছেন তার বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আমদানি করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং সমসময়েও তিনি সমান ভাবে সক্রিয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলিতে বাংলায় মুসলমান শাসনের যে রাজনৈতিক দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেই দিকটিই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে 'মধ্যযুগ' -নামক ধারণা নিয়ে স্থান পেয়েছে। একই ভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বৌদ্ধধর্মের প্রসার কেন্দ্রিক যে সময়কে তাঁর উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন সেই সময়ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত 'প্রাচীন যুগ' নামে ঠাঁই পেয়েছে এবং উভয়েই যে সময়ে বর্তমান, সেই সময় নাকি 'আধুনিক যুগ'।

উভয় ঔপন্যাসিকই এই কাজটি যে খুব সচেতন ভাবে করেছেন তা একেবারেই নয়, বরং নিজেদের বক্তব্যের প্রয়োজনে উভয়েই একটি করে প্রেক্ষাপট নির্বাচন করেছেন এবং দৃষ্টিভঙ্গির বদলের সাথে সাথে তা এক নতুন নাম - পরিচয় নিয়ে পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে। কিন্তু উভয় 'যুগ' -ধারণার নির্মাণে ফারাক এই যে উপস্থাপনার তারতম্যের জন্য মুসলমান শাসনকে আমরা 'অপদার্থ' ও 'অসহিষ্ণু', 'হিন্দুধর্মের প্রতি খড়্গহস্ত'-এই রূপে দেখি, অন্যদিকে বৌদ্ধপ্রভাবের 'সেকাল' -কে

'মঙ্গলময়' রূপে দেখি। দুই ক্ষেত্রেই আমরা মুসলমান শাসন= 'মধ্যযুগ' এবং বৌদ্ধ প্রভাব= 'প্রাচীনযুগ' কে সমার্থক করে দেখি।

'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের গুণকীর্তন করলেও মাত্র একবার 'যবন ও মুসলমান'-দের প্রতি একটু কটাক্ষপাতও করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহলাভ করেছিলেন।[৯৯] বলাবাহুল্য বঙ্কিমের রচনাগুলিও হরপ্রসাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। ফলে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হরপ্রসাদ ও জানিয়েছেন -

'কুণালের পর অনেকেই আঁধির আশ্রয়ে জয়লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রাণী হিংসা নিবারণার্থ উহার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যবন ও মুসলমান পশ্চিম হইতে আসিয়া অনেকবার জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই জানেন, যে আঁধি তাঁহাদের অনুকূল, আর হিন্দুর প্রতিকূল ছিল। এই আঁধিতেই হিন্দুকে বরাবর পরাজিত করিয়াছে। নহিলে বুদ্ধি ও ভুজবলে কাহার সাধ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হয়?'[১০০]

মুসলমান শক্তি ও শাসন সম্পর্কে তৎকালীন প্রায় প্রতিটি হিন্দুর মনোভাব উক্ত বক্তব্যের মধ্যেই প্রকাশিত।

বেনের মেয়ে

'বেনের মেয়ে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অন্যতম পরিণত উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় বড়দিন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে।[১০১] উপন্যাসের 'মুখপাত' অংশে এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন -

' 'বেনের মেয়ে' ইতিহাস নয়; সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজকালকার 'বিজ্ঞান-সঙ্গত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না।

..... 'বেনের মেয়ে' একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই।'[১০২]

ঘটনা চক্রে এই উপন্যাসকে লেখক নিজে ঐতিহাসিক আখ্যা না দিলেও কাহিনিতে এমন অনেক ঐতিহাসিক চরিত্র এবং উপাদান রয়েছে যার প্রায় সবটা বুঝতে পাঠককে ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু 'সময়' গত দিক দিয়ে সর্বদা ঔপন্যাসিক সময় ক্রম মেনে চলেন নি এই উপন্যাসে। উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য চরিত্র মায়া, - এবং তার জীবনের ওঠা পড়ার ১৮/২০ বছরের ইতিহাসের মধ্যে যে সমস্ত ঐতিহাসিক মানুষেরা এসেছেন তাঁরা সকলেই যে সমসময়ে বর্তমান ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই, বরং বর্তমান ছিলেন না, সেই প্রমাণই সমধিক।[১০৩] কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাসের প্রয়োজনে অনিবার্য ছিল এই কালাতিক্রমণ। গল্পের শুরুতে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লেখক আমাদের জানিয়েছেন -

'শকাব্দ ৯২২, সংবৎ ১০৫৭, ইস্ বি ১০০০ বৎসর, মাস বৈশাখ, তিথি পূর্ণিমা, জায়গা সাতগাঁ-গাজনের ভারি ধুম লাগিয়াছে। তারা পুকুরের রূপা বাগ্‌দি এখন সাতগাঁয়ের রাজা। .....রূপা লুই-সিদ্ধার চেলা।'[১০৪]

পূর্ববর্তী 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বৌদ্ধ প্রভাবের যে সমৃদ্ধশালী অধ্যায় চিত্রণের দ্বারা উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন তার থেকে প্রায় ৩৬ বছর পরে লেখা 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসের সূচনা তিনি করেছেন ঠিক সেইখান থেকেই। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে -

'চিত্তরঞ্জন দাশ - সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে ১৩২৬ -এর অগ্রহায়ণ অবধি ১৪ টি সংখ্যায় 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছিল উনিশটি।'[১০৫]

'বেনের মেয়ে' উপন্যাসটিতে কেবল বৌদ্ধ প্রভাবের সমৃদ্ধিই নয়, তার বিলয় এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানও ব্যক্ত। এখন এই উপন্যাসের কালসীমা ১৮/২০ বছরের মধ্যে আবর্তিত। এত অল্প সময়ের মধ্যে সমৃদ্ধি, বিলয়, পুনরুত্থান ঘটা সম্ভব ছিল না। যাই

হোক, মোটামুটি যে কালের কথা ঔপন্যাসিক বলেছেন সেই সময় সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য ছিল এই রকম -

'তবে এতে এ -কালের কথা নাই। সব সেই সে কালের, যে কালে বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।'[১০৬]

লেখকের বক্তব্য থেকে এটা একেবারে পরিষ্কার যে, যে সমৃদ্ধি-বিলয় ও পুনরুত্থানের গল্প তিনি আমাদের শুনিয়েছেন সেই গল্পের সময়ে বাংলা অভাবহীন, পরিপূর্ণ ছিল।

উপন্যাসটি যখন লেখা শুরু হয়, তার বেশ কিছু বছর আগেই স্বয়ং ঔপন্যাসিকের হাত ধরে আবিষ্কৃত হয়েছে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' পুথি।[১০৭] এই আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যের কালসীমা বেশ কিছু বছর পিছিয়ে গেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সমকালে অনেকেই এই পুথিকে বাংলা সাহিত্যের সাথে মিলিয়ে পড়তে চান নি। (এ প্রসঙ্গে পরে আমরা আলোচনা করব) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজে এই বিষয়ে একটুও বিচলিত ছিলেন না, বরং তিনি চর্যার অস্তিত্ব, তার ভাষা -ভাব ইত্যাদির ব্যাখ্যার জন্য উপন্যাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং 'বেনের মেয়ে' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপন্যাসে 'চর্যাগীতি'-র ২৯ সংখ্যক পদের উল্লেখ আছে, যা লুই পা রচিত।[১০৮]

'ভাব ন হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহেঁ কো পতি আই।।
লূই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা।।
জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী।'[১০৯]

উপন্যাসে সাতগাঁয়ের তারাপুকুরের রাজা রূপনারায়ণ সিংহ। তিনি জাতিতে বাগ্‌দি এবং তাঁর গুরু লুই পা। 'বিহার' প্রতিষ্ঠা ও দানের উদ্দেশ্যে গাজনের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের শুরু। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে উপন্যাসে মাঝে মাঝেই লেখক

তার পাঠকদের বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে নানা তথ্য দিয়েছেন, যা উপন্যাসের গতিকে ব্যাহত মোটেই করে নি, বরং পটভূমি বুঝতে আরও বেশি সাহায্য করেছে। কাহিনিতে এই বৌদ্ধবাদীদের বিপরীতে রয়েছেন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এবং তাদের সাহায্যকারী বণিক বা 'বেনে সম্প্রদায়'। ঔপন্যাসিকের সক্রিয় ব্রাহ্মণ্যসত্তার পরিচয় এই উপন্যাসেও আমরা পেয়েছি তাঁর 'ভুরসুটনগর' ও 'সিদ্ধল গ্রাম', এই দুটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামের বর্ণনায় ও সৃষ্ট ব্রাহ্মণ চরিত্র গুলির মধ্যে দিয়ে।

কাহিনিতে রাজা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্য তার অধিকাংশ প্রজাই বৌদ্ধ। পাশাপাশি হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রজাদের কথাও পাওয়া যায়। একই সাথে বৌদ্ধদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সামান্য সম্পর্ক থাকলে ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধানের কথাও পাওয়া যায়। গল্পে বৌদ্ধ -ব্রাহ্মণ্য বিরোধের সবচেয়ে মোক্ষম সময়টি আসে তখন, যখন সাত গাঁয়ের অন্যতম বড় ধনী বেনে বিহারী দত্তের মেয়ে মায়া হারিয়ে যায়। বিহারী দত্তের সম্পূর্ণ সন্দেহ যায় বৌদ্ধদের ওপর এবং ব্রাহ্মণদের সাথে মিলিত হয়ে বিহারী বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উভয় পক্ষের মিলিত যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ -

'মহাবিহার ও গঙ্গার মধ্যস্থলে মহাসভা হইয়া গেল, রূপা-রাজার বৌদ্ধরাজ্য নাশ ও হরিবর্মার হিন্দু রাজ্য স্থাপন হইয়া গেল।'[১১০]

উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বাংলায় মুসলমান আক্রমণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে এবং মোটামুটি ভাবে এই আক্রমণ পূর্ব সময় পর্যন্তই কাহিনির সময়সীমা। এখন এই সীমার মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাবের সমৃদ্ধি, বিলয় এবং হিন্দুরাজ্যের পুনরুত্থান হলেও লেখক শুরুতেই জানিয়েছেন যে এই সময়ের মধ্যেই বাংলার 'সব ছিল', অভাবহীনতা, পরিপূর্ণতা ছিল। অন্যদিকে যুদ্ধে বৌদ্ধদের পরাজয় ঘটলেও বৌদ্ধ বিহারের প্রধানপুরুষ গুরুপুত্রের প্রতি, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রতি ব্রাহ্মণরা কোন হৃদয়হীন আচরণ করেন নি, তাদের প্রতিপত্তি ও সম্পত্তির পরিমাণ কমেছে বটে, কিন্তু 'গুরুপুত্র এখন মহারাজাধিরাজ হরিবর্মার বিশাল সাম্রাজ্যে মহাবিহারের অধিকারী।'[১১১]

'.....রূপা-রাজার পরিবার বর্গের প্রতিপালন। সে একটি বৈ বিবাহ করে নাই, তাহারো সন্তানসন্ততি হয় নাই। রাজা তাহাকে হাজার টাকা মাসিক দিবেন, আর তাহাকে গঙ্গার ওপারে চাকদহের কাছে বাস করিতে দিবেন। সে সেখানে ইচ্ছামতো ধর্ম কর্ম করিতে পারে।.....কিন্তু ইহাতে মহারানী অধিরানীর আপত্তি আছে। তিনি বলেন - তিনি কোনো বৌদ্ধক্ষেত্রে বাস করিবেন। আপাতত হরিহরপুরে থাকিবেন।'[১১২]

এবং এই সমস্ত দাবিই মহারাজ হরিবর্মা শেষ পর্যন্ত মেনে নেন। হিন্দুদের সাথে দীর্ঘদিন পাশাপাশি সহাবস্থানের পরেও হিন্দুদের কাছে বৌদ্ধরা 'বিধর্মী', -এবং তাদের সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণার স্বরূপ আগেই বললাম। কিন্তু যে মুসলমানদের হিন্দুরা এর আগে কখনো সামনে দেখেই নি, সেই মুসলমানদেরকেও হিন্দুরা চিহ্নিত করছে এই ভাবে -

'প্রবল শত্রু হিন্দুদিগের সীমান্তে হানা দিতেছে। পূর্বেও অনেকবার এরূপ হানা দিয়াছে। কিন্তু যাহারা দিয়াছে, তাহারা ঠাকুর মানিত, দেবতা মানিত, ব্রাহ্মণ মানিত, ... কিন্তু এ এক বিচিত্র জাতি আসিয়াছে। ইহাদের ধর্মও বিচিত্র। ইহাদের মতে দেবতা-মানা মহাপাপ, প্রতিমা ভাঙা মহাপুণ্য।.....রাজপুতেরা যদি রক্ষা না করিত, কাসিমের পুত্র মহম্মদ সিন্ধু জয় করিয়া ঐ পথে বরাবর অনেক দূর আসিয়া পড়িত। তাহারা তিনশত বৎসর ধরিয়া এক প্রান্ত রক্ষা করিতেছে। আবার আর-এক প্রান্তে বিপদ উপস্থিত। এ-সময়ে কেবল যুদ্ধ, আত্মরক্ষা, বিপক্ষ-দমন ও বিপক্ষ-নাশন ..... সমস্ত সামর্থ্য, সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য প্রয়োগ করুন।'[১১৩]

উপন্যাসের শুরুতে ঔপন্যাসিক যদিও জানিয়েছেন যে এখানে 'সমকাল'-এর কোন প্রসঙ্গ নেই, কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, সাহিত্য সমকাল বর্জিত নয়। আর এই সমকালই লেখককে তাঁর লেখার দৃষ্টিকোণ, বিষয় নির্বাচন, চরিত্র চিত্রণে প্রভাবিত করে। সমকালে বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর রচনার সান্নিধ্য এবং সমকালীন দর্শন হরপ্রসাদকেও তৎকালীন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। হিন্দুদের প্রবল শত্রুরূপে মুসলমানদের

চিহ্নিত করে তিনি সেই বোধেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে চর্যার প্রসঙ্গ, ও বৌদ্ধদর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় লেখকের ব্যক্তিগত মেধা-মনন-গবেষণা ও ব্যক্তিগত পক্ষপাতের পরিচয় আছে, যদিও সেই পক্ষপাত তাঁর ব্রাহ্মণ্য সত্তাকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে নি। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 'চর্যাগীতি'-কে তার প্রাচীনতার নিদর্শন রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে বৌদ্ধযুগের 'সব পেয়েছির দেশ' -এর ধারণাকেও। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় বা মুসলমান শাসন সম্পর্কিত ধারণাকে আমরা আজও বদলাতে পারি নি। সেই কারণে 'মধ্যযুগ' আজও কিছু ভুল ধারণার মধ্যে বেঁচে থাকে। কয়েকশো বছরের সাহিত্যকে কেন 'মধ্যযুগ' নাম দিয়ে ইতিহাসের পাতায় ফ্রেমবন্দী করে রাখা হয় এই প্রশ্ন কেউ করেন না, করলেও গোঁড়া রক্ষণশীলেরা আপত্তি করেন। আমরা বৌদ্ধপ্রভাব কেন্দ্রিক দুটি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে এটাই বলবার চেষ্টা করেছি যে, 'মধ্যযুগ' -কে মান্যতা দিতে হলে একখানা 'প্রাচীন' -এর প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন সম্পূর্ণ করেছে এই ধরনের উপন্যাস ও সমকালীন অন্যান্য লেখা গুলি। সচেতন ভাবে একেবারেই এ কাজ হয়নি, তবে সমকালের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এমনটা হয়ে গেছে। এবং এই সমস্ত লেখাপত্রের মধ্যে দিয়েই পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত 'ধারণা' গড়ে উঠেছে।

প্রাবন্ধিক ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

VERNACULAR LITERATURE OF BENGAL BEFORE THE INTRODUCTION OF ENGLISH EDUCATION

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English Education' নামক প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম কম্বুলেটোলা রিডিং ক্লাবের বাষিক অভিভাষণে পড়া হয়েছিল, পরে বই আকারে

প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে।[১১৪] প্রবন্ধটিতে সচেতন ভাবে যুগ বিভাজনের কোন প্রসঙ্গ নেই। বরং বক্তা এবং প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একজন একনিষ্ঠ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্বেষণ করেছেন ও সেটিকে প্রকাশ করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই রচনাটি ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। এর আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র দত্তও ইংরেজি ভাষায় প্রাচীন সাহিত্য কেন্দ্রিক কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে একাধিক প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা একটুও পরিলক্ষিত হয় নি। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রই নন, সম্ভবত সচেতনভাবে ১৮৯১ এর আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত লেখাপত্রে কোথাও গবেষণার ছাপ পড়ে নি।

এই প্রবন্ধটির বেশ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অর্থাৎ প্রাবন্ধিক বেশ চমৎকার ভাবে নিজের মত করে প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাবন্ধিক যে কাজটি করেছেন তা বেশ লক্ষণীয়। কাজটি হল, মূলত জনপ্রিয় যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক এবং তাঁদের রচনা কর্ম রয়েছে তাঁদের সম্পর্কে প্রাবন্ধিক খুব বেশি শব্দ ব্যয় করেন নি। সম্ভবত সেই সমস্ত কবি এবং তাঁদের সৃষ্টি নিয়ে পূর্বে বিভিন্ন লেখালেখির মধ্যে দিয়ে এত আলোচনা হয়েছে যে নতুন করে একই কথা প্রাবন্ধিক বলতে চান নি, একই সঙ্গে বলাবাহুল্য যে সমসময়ে জনপ্রিয় কবি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সমাজে অনেক মৌখিক কাহিনি প্রচলিত ছিল, যার মধ্যে দিয়ে সঠিক তথ্য উদ্ধার করা বেশ কঠিন কাজ ছিল।

প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক সম্ভবত ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তার ক্রমানুসারে সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, এবং তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও মতামত প্রকাশ করেছেন। আজকের সময়ের নিরিখে তাঁর সমস্ত তথ্য এবং মতামত যে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য তা একেবারেই নয়, বরং উল্টোটাই বেশি সম্ভব। কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তথ্য ও চিন্তা -ভাবনার মধ্যে নতুনত্ব বেশ কিছু জায়গায়

ছিল। বৌদ্ধ প্রভাব সমন্বিত কিছু রচনা এবং তাদের ভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রাবন্ধিক বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করেছেন।

আলোচনার শুরুতেই প্রাবন্ধিক যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি হল যে, ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা লেখ্য সাহিত্যরূপে সংস্কৃতের প্রাধান্যের যুগে, হঠাৎ করে সমাজে প্রচলিত প্রাচীন ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়োজন অনুভুত হল কেন?[১১৫] প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে প্রাবন্ধিক স্পষ্টকরে কিছু বলেন নি। কিন্তু আমাদের অনুমান যে, রাজ সভার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় যে ভাষার ব্যবহার হত, সেই ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় খুব বেশি ছিল না, একই সঙ্গে নিজেদের ভাষা-সাহিত্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও লেখ্যরূপে তারা কোনদিন অনুভব করে নি। এই অনুভবের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচন্ড আলোড়নের, যা তারা প্রথম অনুভব করে তুর্কি আক্রমণের দ্বারা। আমরা একথা একেবারেই বলতে চাইছি না যে, তুর্কি আক্রমণের ফলেই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, বরং আমরা বলছি যে, সাহিত্যের যে বীজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তুর্কি আক্রমণের ফলে তা বিকাশের সঠিক পথ পেয়েছে। কারণ তুর্কি আক্রমণের ফলাফলের পেছনে সেনরাজা ও রাজবংশের ব্যর্থতা ছাড়াও যে সাধারণ মানুষের অবদান ছিল, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এবং সাধারণ মানুষের গুরুত্ব উপলব্ধির সাথে সাথেই যে সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য।

প্রবন্ধটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উল্লেখযোগ্য কীর্তি বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা। বৈষ্ণব সাহিত্য বলতে অবশ্যই পরিচিত স্রষ্টা ও সৃষ্টি নয়। বরং তার বাইরের বহুল পদকর্তা, যাঁদের একটি তালিকাও তিনি এই প্রবন্ধে সংযোজিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু পদকর্তার অপ্রচলিত রচনার নাম পরিচয়ও এই প্রবন্ধে আছে। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত রাজনীতির উল্লেখও এক্ষেত্রে নজরকাড়া। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন -

'After writing the Charitamrita he gave it to Jiva Gosvami to see it, and the Gosvami, who thought that if this book in Bengali were published the Sanskrit works written by his uncles Rup and Sanatan and by himself would not be studied, locked the book up and did not return it to the kaviraj. But a pupil of the kaviraj clandestinely prepared a copy of the work, which enabled it to be published in spite of the Gosvami's exertions to suppress it. We learn this incident from the Vivartavilas by a pupil of the kaviraj who does not reveal his name .....'.[১১৬]

বৈষ্ণব সাহিত্যের বেশ কিছু নতুন প্রবন্ধের প্রতি প্রাবন্ধিক আলোকপাত করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা'। সম্ভবত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই লেখাটিতেই প্রথম এই বইটির উল্লেখ ও সমালোচনা পাওয়া যায়।

'Narettama's songs are well known. Thay are, though not entirely, but certainly in a great measure, free from Maithilism. But his greatest work is a short metrical treatise on Bhakti entitled Prembhakti Chandrika, which is regarded as the quintessence of a lac of works. It expresses high sentiments and teaches noble precepts within the shortest possible compass, and many of its verses have become house -hold sayings with us.'[১১৭]

একটি রচনাকে কেবলমাত্র ভক্তি সাহিত্যরূপেই নয়, বরং একাধিক দৃষ্টিভঙ্গিও 'ভক্তি-সাহিত্য'-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি 'ভক্তিরত্নাকর'

প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আমাদের দেখিয়েছেন। একটি রচনার গুরুত্ব সমকালীন ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের নিরিখেও হতে পারে, তার অন্যতম নিদর্শন 'ভক্তিরত্নাকার'।

'The work is a mine of information about the Chaitanya religion. To a historical student the Bhaktiratnakar will always repay a careful perusal. It gives the topography of Navadvipa and Brindavan as exact as the topography of Gaya, Kapilavastu and Kushinagar given by Hiouen Thsang, noting down every place connected with events in the life of Krishna and Chaitanya. There are topographies of holy places to be found every where in the world. ..... There descriptions however are exceedingly dry reading. But it is a pleasure to go through the topography given by Narahari. It is like a picture drawn with consummate art which with the help of proper light and shade appears truly life-like'.[১১৮]

বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনার শেষে প্রাবন্ধিক শুরু করছেন দুর্গা মাহাত্ম্য বা চন্ডী মাহাত্ম্য কেন্দ্রিক আলোচনা, যার শুরুতেই তিনি মাধবাচার্যের প্রসঙ্গ আনছেন। প্রাবন্ধিক মাধবাচার্যকে কেবল চন্ডীই নয়, বরং ভাগবত অনুবাদক রূপেও হাজির করেছেন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং একাধিক মাধবাচার্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১১৯] মাধবাচার্য এবং মুকুন্দরামের রচনার উপাদানগত ঐক্য প্রসঙ্গেও প্রাবন্ধিকের অভিমত মেনে নেওয়া যায় না।

'His first work is Bhagavat Sara a metrical work of considerable length giving the substance of the

Srimadbhagavata as explained in the Vaishnava works. The language is simpler and more businesslike than that of Narahari. His second work is Durga Mahatmya or Chandi. It describes the origin and spread of the worship of Mangal Chandi. It is the same story which has been related by the great Mukundaram Chakravarti with so much power in what is known as kavi kankan Chandi.'[১২০]

চন্ডী মাহাত্ম্যের কবি মাধবাচার্য-মুকুন্দরামের পর, বিষহরির পাঁচালি বা মনসার ভাসান, অনুবাদ সাহিত্য, ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গ ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, বলাবাহুল্য এই বর্ণনা মোটেও রচনার সময়ের ক্রম অনুসারে হয় নি। যদিও তথ্যের দিক দিয়ে প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম, তবুও এই তথ্য গুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তা জানালে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সুবিধা হত।

ANCIENT BENGALI LITERATURE UNDER MUHAMMADAN PATRONAGE

'Ancient Bengali Literature Under Muhammadan patronage' নামক প্রবন্ধটি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, (Proceedings, Asiatic Society of Bengal)[১২১] প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয় মূলত, মুসলমান পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কন। এবং এই রূপরেখা আঁকতে গিয়ে প্রাবন্ধিক মূলত মহাভারতের অনুবাদের কথাই বলেছেন। যে মুসলিম শাসকদের সৌজন্যে মহাভারতের অনুবাদ হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই অনুবাদই মুসলিম ধর্মের বিপরীতে উগ্র হিন্দুত্ববাদের পরিচায়ক স্বরূপ হয়ে ওঠে। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরও অনেক সাহিত্য রচিত

হয়েছে কিন্তু এখানে তার আলোচনা হয় নি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রবন্ধটি রচিত হলেও আগের প্রবন্ধের মত এটিও তথ্যের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যের দীন-হীন চেহারার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে অনুবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মুসলিম রাজশক্তির সক্রিয় ভূমিকা মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অনুবাদের ক্ষেত্রে ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণের কাহিনি অনেক আগে থেকেই সমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাওয়া তথ্য -প্রমাণের হিসেবে, লেখ্য রূপে মুসলমান শাসনের সময়েই তার বিকাশ। মহাভারত সম্পর্কে এযাবৎ যাবতীয় আলোচনার মাঝেও নতুন যে তথ্য প্রাবন্ধিক সন্নিবেশিত করেছেন, তা আমরা উদ্ধৃত করলাম।

'a Muhammadan General of Husain Shah undertook to have it translated under his own patronage. His name was Paragol khan. .....He employed a native bard Paramecvar, who was dignified with the title of Kavindra. The Mahabharat that was translated was Jaimini's and not Vaisampayana's. .....It is curious that the Jaimini Bharata is not to be found in its entirely in Sanskrit. The only parva, that is extant, is the Acvamedha Parva. But the Bengali version contains the whole of the Jaimini Bharata .....Paragol's son, Chuti Khan, had ordered Crikar Nandi, another poet, to give a full account of the wars described in that Parva .....Chuti Khan was as great a patron of Bengali literature as his father ..... wrote the Acvamedha Parva, under the patronage of Chuti Khan,

was Crikar Nandi or Crikaran Nandi. He treats his work as a supplement to the greater work of Kavindra Paramesvara. The language of the work is very good Bengali'.[১২২]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আগের প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে, নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি সাহিত্যের প্রাচীন রূপকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যার মধ্যে প্রতীচ্যের আবওহাওয়া সংযুক্ত হয় নি। অর্থাৎ যাকে আমরা বর্তমানে 'আধুনিক যুগ' বলছি, তারপূর্বের চেহারাই পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিধৃত। সচেতন ভাবে যুগ বিভাজনের প্রসঙ্গ সেখানে না থাকলেও সাহিত্যের গুণগত ও গঠনগত বিভাজনের একটা ছোঁয়া নামকরণে দেখা যায়। এই প্রবন্ধে আমরা দেখলাম যে নামকরণে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গ এসেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তথাকথিত জাতীয়তাবাদের গন্ধ নেই। বরং সাহিত্যকে নিরীক্ষণের একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাবন্ধিকের বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত।

Notices Of Sanskrit MSS, Vol. (Xi)

'Notices of Sanskrit Mss' নামক রচনাটি প্রকৃতপক্ষে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের।[১২৩] সেই প্রবন্ধ সংগ্রহের একাদশ খন্ড ১৮৯৫ -এর ভূমিকা থেকে বাংলা পুথি বিষয়ে আলোচনা এখানে হয়েছে।[১২৪] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রাবন্ধিক আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন, সেগুলি নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, সমসময়ে অনুবাদ সাহিত্যের পাশাপাশি সমাজে চন্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রমুখের কথা মৌখিক এবং লিখিত আকারে প্রচলিত ছিল। লক্ষণীয় বিষয় হল, চন্ডী, মনসা বা ধর্মঠাকুরের আখ্যান সমাজের অভিজাত মহলে প্রচলিত ছিল না, এগুলি মূলত সমাজের অনভিজাত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালের নিয়মে অনভিজাত শ্রেণির সংখ্যা এবং তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অভিজাত শ্রেণি,

বিশেষত ব্রাহ্মণ -কায়স্থেরা আলোড়িত হয় এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বাংলা অনুবাদে মনোনিবেশ করে। পাশাপাশি এমনটা অনুমান করলেও হয়ত খুব ভুল হবে না যে অভিজাত হিন্দুরা তৎকালীন মুসলমান রাজশক্তির বিপরীতে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যের ধ্বজা বলবৎ রাখবার জন্যও প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করেছিল, যদিও ইতিহাস কেবল মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতারই সাক্ষ্য দেয়। (লক্ষ করলে দেখা যাবে, কৃত্তিবাস ব্রাহ্মণ এবং মালাধর বসু পারিবারিক বংশ পরিচয় সূত্রে কায়স্থ ছিলেন)।

প্রবন্ধটিতে যে সমস্ত বাংলা গ্রন্থ ও পুথির সংক্ষেপে উল্লেখ রয়েছে, সেইগুলি হল - বিপ্রদাস পিপিলাই এর ‘মনসামঙ্গল’, Dvija Vamci Das -এর ‘মনসা’, রূপরামের ‘ধর্মমঙ্গল’, কৃত্তিবাসের ‘রামায়ণ’, গুণরাজ খানের ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী এবং সঞ্জয়ের ‘মহাভারত’, মাধবাচার্যের ‘কৃষ্ণমঙ্গল’, চূড়ামণি দাসের চৈতন্য জীবনী, শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ 'Krsna prakaca ratna', নরহরি চক্রবর্তীর ‘প্রেমবিলাস’, জগৎরাম এবং তার ছেলে রামপ্রসাদের ‘অদ্ভূত রামায়ণ’, কৃষ্ণরাম দাসের ‘কালিকামঙ্গল’, বীরসিংহের ‘হরিহরমঙ্গল’ ইত্যাদি।[১২৫]

মনসার ভাসান বা মনসা সাহিত্যকে সর্বাধিক প্রাচীন আখ্যান রূপে গণ্য করে এই প্রবন্ধে প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের অভিমত -

'.....Bengali literature at its earliest stage, that is in the 14th and 15th centuries, was confined to the lower orders of people and to the aboriginal deities, -Manasa, Mangal Chandi and Dharma.

That during the 15th century the higher class of Hindus took to writing Bengali for the purpose of propagating their own faith.

That the Saiyad Dynasty patronized Vernacular literature as a means of conciliating Hindus of all classes.

That by the middle of the 16th century the followers of Chaitanya made the Vernacular the principal medium of preaching their religion, and wrote a very large number of works in Bengali.

With the decline of the activity of Chaitanya's followers, the Brahmanists took up the Vernacular, and during the whole of the last century wrote a very large number of excellent works.'[১২৬]

BENGALI BUDDHIST LITERATURE

'Bengali Buddhist Literature' নামক প্রবন্ধটি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে, 'The Calcutta Review' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১২৭] প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন -

'The discovery of a Bengali Buddhist Literature is an event of some importance in Literary History. The interest of the discovery is enhanced by the fact that the literature is one thousand years or more old and that it may lead to a further discovery of a more ancient Literature of the same kind.'[১২৮]

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে যখন এই লেখাটি প্রকাশিত হচ্ছে তার অনেক আগে থেকেই বাংলা সাহিত্য এবং তার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা লেখালেখি শুরু হয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের হাত ধরে সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় মশগুল যখন দেশি পন্ডিতেরা, সেই সময় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে 'চর্যার' আবিষ্কার আলোড়ন সৃষ্টি করে পন্ডিত ও পাঠক মহলে। আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বয়ং। এই আবিষ্কারের সাথেসাথেই বাংলা সাহিত্য পাঠের ধরন, চিন্তার ধরন, বদলে যায়। ১৯১৭ -এর আগে সাহিত্যের ইতিহাস কেন্দ্রিক বিভিন্ন লেখাপত্রে বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই প্রবন্ধটি সেই সমস্ত ভাবনা - চিন্তা ও আলোচনার উর্ধ্বে। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্য নিষ্ঠ ও বিশদ আলোচনা এই প্রবন্ধের প্রাণ স্বরূপ।

চর্যার আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা শুরু হত বিদ্যাপতি থেকে। যদিও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও উচ্চারণে কোথাও কোথাও বাংলা ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। বিদ্যাপতির পরেই আলোচিত হতেন চন্ডীদাস। কিন্তু 'কৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কারের পর চন্ডীদাস সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয়। কারণ পদাবলির ভাব-ভাষা ও কৃষ্ণকীর্তনের ভাব ও ভাষায় বিস্তর প্রভেদ। কৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে প্রাবন্ধিকের মতানুসারে চতুর্দশ শতকে স্থাপিত করে, চন্ডীদাস সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের দুটি অনুমান -

'One that the songs have been modernized by those who sing them and that the epic which hasbeen recently discovered in an old script has not yet undergone the process of Modernization. The other explanation is that there were two Chandidasas, one older and the other younger. Whichever explanation is found correct in the long run it would not be very wrong if Krishna Kirtan is

placed in the middle of the 14th century and thus if the beginning of the Vaisnab Literature in Bengali be placed about that time.'[১২৯]

অর্থাৎ এখন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন চেহারায় প্রথম স্থান কৃষ্ণকীর্তনের, ('চর্যা' সম্পর্কে আলোচনা তখনও চলছে) তার পর পদাবলি সাহিত্যের। জয়দেবকে আমরা সংস্কৃত কবি রূপেই গণ্য করলাম। পদাবলি সাহিত্যের পর অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে। সমস্যা দেখা দিয়েছে এর মধ্যে ধর্মঠাকুরকে নিয়ে। ধর্মঠাকুর এবং তার আখ্যান সমূহ যে বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত এমন আলোচনা অনেক আগে থেকেই চলছিল, সমস্যা হল এরই মাঝে মুসলিম ধর্মের অনুপ্রবেশ। প্রাবন্ধিকের চোখে এই উভয় ধর্মের মিশ্রণে ধর্ম ঠাকুরের চেহারা এবং তার প্রভাব অন্য তাৎপর্য বহন করে এনেছে। ধর্মঠাকুরের প্রতি আস্থাবান শ্রেণির কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন -

'They appealed to Dharmaraja, their god, who is the Second Member of the Buddhist traid, namely, Dharma which in later Buddhism meant the Stupa. He assumed the form of a Musalman with a black cap on his head. His associates such as Siva and Visnu, Durga and others, assumed the forms of Musalman saints. Siva became Adam, and Durga become Eve and so they assailed the Brahmans and broke their power. The passage is a significant one. It shows how the Buddhists and Musalmans united against the Brahmans and how Muhammadans absorbed a good deal of the Buddhist population in Bengal. The story given

in the Dharma Mangal goes back to the time of the rise of the palas in Bengal. But the originator of the Cult by his own admission seems to have flourished after the Musalman conquest of Bengal, how long after, cannot be said.'[১৩০]

সমকালীন সময়ে সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি প্রাচীন পুথির অন্বেষণ, বিশ্লেষণ, প্রকাশ ইত্যাদি কাজও নিজের মত করে চলছিল। প্রাচীন পুথির অন্বেষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাশাপাশি আবদুল করিম সাহেব, শিবরতন মিত্র মহাশয় প্রমুখেরা সচেতন ছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যার। বাংলা সাহিত্যের বয়স নির্ধারণে চর্যার গুরুত্ব অপরিসীম। এই চর্যা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রবন্ধে এবং অন্যান্য নানা জায়গায় যে তথ্য, মতামত ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছেন, আজ পর্যন্ত মূলত তার ওপর ভিত্তি করেই চর্যার পাঠ চলে আসছে। প্রাবন্ধিক নিজেকেই এই প্রবন্ধে অখ্যাত HE নামে অভিহিত করেছেন।

'One fine morning, on a plamleaf manuscript in the early 12th century Bengali script, of a collection of Bengali songs with Sanskrit commentary attached. About the date of the script he had no doubt. It was Bengali on the face of it, much older Bengali handwriting. .....The songs belong to 20 different authors, whose signatures are invariably attached to the last lines of their songs. The authors therefore must belong to the 10th century at least, and all this afforded food to his thought, reflection and study for several years.

The songs belong to 20 different authors, all called Siddhacharyyas. Of these again Lui is called the Adi Siddhacharyya, the first Siddhacharyya. Darik, another Siddhacharyya, says that it is through the grace of Lui that he has attained the twelfth stage of progress and has now become fully equal to Buddha. Darik seems therefore to be an immediate disciple of Lui. Krishnacharyya was Siddhacharyya. From his language he appears to have been a Bengali.....

Professor Bendall thought that they were written in Prakrit or Buddhist Prakrit. These words Prakrit and Apabhransa are used very loosely. The Bengali, even the modern Bengali, is often called by our old class Pandits, as Prakrit. ..... so these words are often used in a loose and unscientific way. The scientific way of dealing with Sanskritic languages would be to name them after the district and the century. ..... So these songs should be described as written in the dialect of Western Bengal in the 10th and 11th centuries. Sometime one song may be tinged with the idiom of the dialect of that particular follower of Lui who wrote it. .....

Professor Bendall calls them Prakrit, in another he calls them Buddhist Prakrit, in another he calls them

Apabhransa. He found that they do not conform to the rules of Prakrit grammar and so he qualifies the expression by adding Buddhist to it. But as yet no work in Buddhist Prakrit is Known . .....

The comparisons are drawn from natural objects such as lotus, mountains, rivers, etc, but what strikes one as peculiar is the oft -repeated simile with boats and their constituent parts, the oars, helms, ropes. pegs, and so on. Another fruitful source of comparison is the milking of cows. The authors seem to have been substantial boatmen, cowherds and men in a similar position.

These songs do not seen to be the first of their kind in Bengali. .....

The guru imparts this knowledge in a language which they call Sandhyabhasa, or twilight language, the use of which is sanctioned by Buddha himself in Mahayana - Sutras. .....It has brought together the two great Buddhist ideas of Sunyata and Karuna and made them harmonize with each other and it has produced that attractive doctrine of union or monism before which pales the Advaita doctrine of Samkara'.[১৩১]

বলাবাহুল্য সমসময়ে সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত চর্চা, রচনার প্রয়াস, প্রতীচ্যের আলোকে সাহিত্য দর্শন বা ইংরেজি ভাষায় ইতিহাস চর্চা সমাজের এক

শ্রেণির শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষ চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি বা মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে জানলেও ইতিহাসের ভাবনা তাদের মধ্যে ছিল না।

****

সংক্ষিপ্ত টীকা ঃ-

১) মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসে অতীত ঃ ইতিহাস ও কল্পইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, থীমা, ২০০৩, পৃঃ - ১৩।

২) ঐ, পৃঃ -৩২।

৩) ঐ, পৃঃ -৯।

৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দুর্গেশনন্দিনী', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ -৬৫।

৫) মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসে অতীত ঃ ইতিহাস ও কল্পইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, থীমা, ২০০৩, পৃঃ - ৪১।

৬) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দুর্গেশনন্দিনী', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ -৮৯।

৭) ঐ, পৃঃ - ১০৯।

৮) Ranajit Guha, Elementary Aspects of Presant Insurgency in Colonial India, Oxford, 1983.

৯) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দুর্গেশনন্দিনী', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ - ১১৩।

১০) ঐ, পৃঃ - ১২৯।

১১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মৃণালিনী', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ -২০৫।

১২) ঐ, পৃঃ -১৯১

১৩) ঐ, পৃঃ -২১৪,২১৫।

১৪) ঐ, পৃঃ -২৪২,২৪৩।

১৫) ঐ, পৃঃ -২৪৬।

১৬) ঐ, পৃঃ -২৫৩।

১৭) যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), ''উপন্যাস প্রসঙ্গ'', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আনন্দমঠ', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ -৪২।

১৮) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আনন্দমঠ', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ -৭২২।

১৯) ঐ, পৃঃ -৭৪২।

২০) ঐ, পৃঃ -৭৬৮।

২১) মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসে অতীত ঃ ইতিহাস ও কল্পইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, থীমা, ২০০৩, পৃঃ -৪০।

২২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আনন্দমঠ', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ -৭২৯।

২৩) ঐ, পৃঃ -৭২৯।

২৪) ঐ, পৃঃ -৭২৯।

২৫) ঐ, পৃঃ -৭৫০।

২৬) ঐ, পৃঃ -৭৫০।

২৭) ঐ, পৃঃ -৭৫৭।

২৮) ঐ, পৃঃ -৭৫১।

২৯) ঐ, পৃঃ -৭৫১।

৩০) ঐ, পৃঃ -৭৭১।

৩১) ঐ, পৃঃ -৭৮৮।

৩২) নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসচর্চা, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, কৃষ্টি, ২০০১, পৃঃ-৩৪,৩৫।

৩৩) যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), ''উপন্যাস প্রসঙ্গ'', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রাজসিংহ', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ-৩৯।

৩৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রাজসিংহ', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ-৬১০।

৩৫) ঐ, পৃঃ -৬১৮।

৩৬) ঐ, পৃঃ -৬২২।

৩৭) ঐ, পৃঃ -৬২২।

৩৮) ঐ, পৃঃ -৬২৪।

৩৯) ঐ, পৃঃ -৬২৪।

৪০) ঐ, পৃঃ -৬২৪।

৪১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মৃণালিনী', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ -২১৩,২১৪।

৪২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রাজসিংহ', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ -৬৭৬।

৪৩) ঐ, পৃঃ -৬৭৬।

৪৪) ঐ, পৃঃ -৬৭০।

৪৫) মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসে অতীত ঃ ইতিহাস ও কল্পইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, থীমা, ২০০৩, পৃঃ -৬৪।

৪৬) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রাজসিংহ', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ -৬৬৫।

৪৭) নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসচর্চা, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, কৃষ্টি, ২০০১, পৃঃ -৩৭।

৪৮) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রাজসিংহ', বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), প্রথম খন্ড, চতুর্থ প্রকাশ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭২, পৃঃ -৬৭৪।

৪৯) ঐ, পৃঃ -৭০৩।

৫০) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'ভূমিকা', রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, নতুন সংস্করণ, কলিকাতা, সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯১, পৃঃ (ঝ)।

৫১) Bankim Chandra Chattopadhay, 'Bengali Literature', Bankim Rachanavali, see- Jogesh Chandra Bagal (Edited), 3rd print, Calcutta, Sahitya Sansad, 1998, page -103.

৫২) ঐ, পৃঃ -103,104।

৫৩) ঐ, পৃঃ -104।

৫৪) ঐ, পৃঃ -105।

৫৫) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম - ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ -১০১।

৫৬) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালির বাহুবল', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪১১, পৃঃ -২০৯।

৫৭) ঐ, পৃঃ -২০৯,২১০।

৫৮) ঐ, পৃঃ -২১০।

৫৯) ঐ, পৃঃ -২১৩।

৬০) ঐ, পৃঃ -২১৩।

৬১) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম - ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ -৮১।

৬২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ভারত কলঙ্ক', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪১১,

৬৩) ঐ, পৃঃ -২১৭।

৬৪) ঐ, পৃঃ -২১৭।

৬৫) ঐ।

৬৬) ঐ, পৃঃ -২১৮।

৬৭) ঐ, পৃঃ -২১৯।

৬৮) ঐ, পৃঃ -২১৯।

৬৯) ঐ, পৃঃ -২১৯।

৭০) ঐ, পৃঃ -২১৯,২২০।

৭১) ঐ, পৃঃ -২১৯।

৭২) ঐ, পৃঃ -২২২।

৭৩) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম - ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ -১০৫।

৭৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ''পাদটীকা'', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪১১, পৃঃ -৩০৪।

৭৫) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪১১, পৃঃ -৩০৪।

৭৬) ঐ, পৃঃ -৩০৪।

৭৭) ঐ, পৃঃ -৩০৫।

৭৮) ঐ, পৃঃ -৩০৫।

৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালির বাহুবল', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪১১, পৃঃ - ১৯৪।

৮০) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪১১, পৃঃ -৩০৫।

৮১) ঐ, পৃঃ -৩০৫।

৮২) ঐ, পৃঃ -৩০৬।

৮৩) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার, বঙ্গদর্শন পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নৈহাটি, কাঁটালপাড়া, বঙ্কিম - ভবন গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬, পৃঃ - ১৩৫।

৮৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪১১, পৃঃ -৩১০।

৮৫) ঐ, পৃঃ -৩১০।

৮৬) ঐ, পৃঃ - ৩১১, ৩১২।

৮৭) ঐ, পৃঃ -৩১৩।

৮৮) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, উপন্যাসের ''ভূমিকা'', 'কাঞ্চনমালা', রচনা সংগ্রহ (১), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ-৮০।

৮৯) ঐ, পৃঃ -৮০।

৯০) সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), ''প্রাসঙ্গিক তথ্য'' (বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশের সূচি), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কাঞ্চনমালা', রচনা সংগ্রহ (১), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ -১৯১।

৯১) সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), ''প্রাসঙ্গিক তথ্য'' (সূত্র), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কাঞ্চনমালা' রচনা সংগ্রহ (১), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ -১৮৯।

৯২) সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), ''পরিশিষ্ট'', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কাঞ্চনমালা', রচনা সংগ্রহ (১), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ -৫৮৬।

৯৩) সুকুমার সেন, ''প্রারম্ভ -বচন'', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কাঞ্চনমালা', রচনা সংগ্রহ (১), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ -১৪, ১৫, ১৬।

৯৪) ঐ, পৃঃ -১৪।

৯৫) সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), ''প্রাসঙ্গিক তথ্য'' (সূত্র), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কাঞ্চনমালা' রচনা সংগ্রহ (১), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ- ১৮০।

৯৬) ঐ, পৃঃ - ১৮১।

৯৭) ঐ, পৃঃ - ১৮১।

৯৮) ঐ, পৃঃ - ১০৫, ১০৬।

৯৯) সুকুমার সেন, ''প্রারম্ভ -বচন'', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কাঞ্চনমালা' রচনা সংগ্রহ (১), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ - ১৭, ১৮।

১০০) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কাঞ্চনমালা,' রচনা সংগ্রহ (১), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ - ১৪৬।

১০১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ''প্রথম প্রকাশের মুখপাত'', 'বেনের মেয়ে', রচনা সংগ্রহ (১), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ - ১৯৮।

১০২) ঐ, পৃঃ - ১৯৮।

১০৩) সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), ''প্রাসঙ্গিক তথ্য'', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বেনের মেয়ে', রচনা সংগ্রহ (১), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ - ৩৯১, ৩৯২।

১০৪) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বেনের মেয়ে', রচনা সংগ্রহ (১), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ - ১৯৯।

১০৫) সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), ''প্রাসঙ্গিক তথ্য'' (নারায়ণ পত্রিকা প্রকাশের সূচি), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,

‘বেনের মেয়ে’, রচনা সংগ্রহ (১), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ - ৪০৮।

১০৬) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ‘‘প্রথম প্রকাশের মুখপাত’’, ‘বেনের মেয়ে’, রচনা সংগ্রহ (১), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ - ১৯৮।

১০৭) সুকুমার সেন, ‘‘প্রারম্ভ -বচন’’, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ‘কাঞ্চনমালা’ রচনা সংগ্রহ (১), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ - ১৪।

১০৮) সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), ‘‘প্রাসঙ্গিক তথ্য’’, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ‘বেনের মেয়ে’, রচনা সংগ্রহ (১), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ - ২৪৫।

১০৯) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ‘বেনের মেয়ে’, রচনা সংগ্রহ (১), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮০, পৃঃ -২৪৫।

১১০) ঐ, পৃঃ -৩০৬।

১১১) ঐ, পৃঃ -৩২১।

১১২) ঐ, পৃঃ -৩১১,৩১২।

১১৩) ঐ, পৃঃ -৩৬৭,৩৬৮।

১১৪) সুকুমার সেন, ‘‘পাদটীকা’’, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English Education', রচনা-সংগ্রহ (২), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর

সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -৮০৭।

১১৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English Education', রচনা-সংগ্রহ (২), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -৮১০।

১১৬) ঐ, পৃঃ -৮১৬।

১১৭) ঐ, পৃঃ -৮১৮।

১১৮) ঐ, পৃঃ -৮২০।

১১৯) সুকুমার সেন, ‘‘পাদটীকা’’, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English Education', রচনা-সংগ্রহ (২), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -৮২২।

১২০) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English Education', রচনা-সংগ্রহ (২), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০-২, পৃঃ -৮২২।

১২১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'Ancient Bengali Literature under Muhammadan patronage', রচনা-সংগ্রহ (২), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -৮৩৪।

১২২) ঐ, পৃঃ -৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪।

১২৩) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ‘‘চতুর্থ পাদটীকা’’ 'Ancient Bengali Literature under Muhammadan patronage', রচনা-সংগ্রহ (২), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -৮৩২।

১২৪) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ‘‘শিরোনাম উল্লিখিত তথ্য’’, 'Notices of Sanskrit Mss', রচনা-সংগ্রহ (২), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -৮৩৫।

১২৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'Notices of Sanskrit Mss', রচনা-সংগ্রহ (২), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ- ৮৩৭-৮৩৯।

১২৬) ঐ, পৃঃ ট্র ৮৩৬, ৮৩৭।

১২৭) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'Bengali Buddhist Literature', রচনা-সংগ্রহ (২), দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -৮৫৯।

১২৮) ঐ, পৃঃ -৮৪০।

১২৯) ঐ, পৃঃ -৮৪৩,৮৪৪।

১৩০) ঐ, পৃঃ -৮৪৫।

১৩১) ঐ, পৃঃ -৮৪৯, ৮৫০, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৮, ৮৫৯।

=ঃ তৃতীয় অধ্যায় ঃ=

বর্তমানে ‘মধ্যযুগ’ বলতে আমরা কেবল একটা নির্দিষ্ট সময়কে বুঝি না, একই সঙ্গে বড়ু চন্ডীদাস থেকে ভারতচন্দ্র বা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ থেকে ‘অন্নদামঙ্গল’ পর্যন্ত সাহিত্য সম্ভারকেও বুঝি। ইতিহাসের এই বোধ আজ অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ, তথ্যসমৃদ্ধ ও পরিশীলিত পর্যায়ে এসে উপস্থিত হলেও ইতিহাসচর্চার প্রথা বেশ পুরনো। মোটামুটি ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একদল মেধাপূর্ণ ব্যক্তিরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে বিষয় নিয়ে তাঁরা চর্চা করছিলেন, সেই বিষয়গুলি ছিল সম্পূর্ণ এদেশীয়, অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রভাববর্জিত বাংলার নিজস্ব সাহিত্য, যার লেখক ও পাঠক গোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল বাঙালি। এই বাঙলা সাহিত্যকে নিয়ে এদেশীয় শিক্ষিত বাঙালিরাই যখন চর্চা শুরু করে, তখন পাশ্চাত্য থেকে এক বিলিতি কাঠামোর আমদানি হয়, যার নাম ছিল ‘যুগবিভাজন প্রক্রিয়া।’ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একদল নবযুবক ইংরেজি ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস সম্ভবত পড়েছিলেন। এবং সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই সম্ভবত বাংলায় ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাঁরা সম্ভবত লক্ষ করেন নি, তৎকালীন ইংরেজদের এবং সমকালীন বাঙালিদের পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রেক্ষিত ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তবে গোড়ার দিকে এই চর্চার চেহারা যুগবিভাজনের আকার ধারণ করে নি। উত্তর -প্রত্যুত্তর, যুক্তি-প্রতিযুক্তি, প্রশ্নহীন আনুগত্য, উনিশ শতকীয় ইতিহাসবোধ এই সমস্ত কিছুর মিশ্রণেই শুরুর দিকে পথচলা ইতিহাসচর্চার। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই চর্চার সাথে সমকালীন অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্য বা সাহিত্য চর্চার প্রভাব এসে সংযুক্ত হয় নি। এই অধ্যায়ে আমরা মূলত ১৮৫০ থেকে ১৯২০ -এর মধ্যে রচিত সাহিত্যেতিহাসচর্চার স্বরূপ ও গঠন বোঝবার চেষ্টা করেছি। মূল বক্তব্যের বিষয় অবশ্যই ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ থেকে ‘অন্নদামঙ্গল’ পর্যন্ত।

On Bengal Works and Writers

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক আদি রচনার মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করতে কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'On Bengal Works and Writers' -এর। রচনাটি ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ বঙ্গাব্দে 'লিটারেরি গেজেট' নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়, যার স্থূল বিবরণ তর্জমা করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে।[১] তবে রচনাটিকে ঠিক ইতিহাস না বলে বরং ইতিহাসের উপাদান রূপে গ্রহণ করা চলে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে Literary Gazette -এর সম্পাদককে লিখিত একটি চিঠিতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাঁর আত্মজীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলেন।[২] যেখানে তিনি জানিয়েছিলেন -

'I seldom wrote in prose until the year 1829, in which, and in the following year I wrote "The Vision a tale," "One Bengali Poetry," and "On Bengal Works and Writers," Published by you in the Literary Guzette.'[৩]

বাংলার প্রাচীন কবিদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রথমেই কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কথা বলেছেন। এর মধ্যে কৃত্তিবাসের রচনাকে 'অপভাষাপূর্ণ'[৪] এবং কাশীরাম দাসকে 'শূদ্র'[৫] রূপে চিহ্নিত করেছেন। কৃত্তিবাসের রচনা যে সমকালে নিম্ন শ্রেণির লোকেদের মধ্যে প্রচারিত ছিল[৬] এই উল্লেখের দ্বারা প্রাচীন কবি ও তাঁদের কাব্য সম্পর্কে বাঁকা কটাক্ষও করেছেন। এর পরে কবিকঙ্কণের প্রকৃত নাম হিসেবে লেখক 'গোবিন্দানন্দ' নামের উল্লেখ করেছেন এবং ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণকে সমকালীন রূপে পরিগণিত করে উভয়ের রচনাকেই অপভাষা পূর্ণ রূপে উল্লেখ করেছেন।[৭] তবে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের তিনি প্রভূত প্রশংসা করেছেন।[৮]

কাশীপ্রসাদ ঘোষের এই রচনার মধ্যে দিয়ে প্রাচীন কবি ও কাব্য সম্পর্কে কৃপার মুষ্টিভিক্ষা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নেই। আসলে প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে এমন রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক বুদ্ধিজীবীই বহন করতেন।

On Bengali Poetry

৮ এপ্রিল ১৮৫২য় বেথুন সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্ত 'On Bengali Poetry' নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েছিলেন।[৯] রচনাটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য ক্যালকাটা রিভিউ এর জানুয়ারি সংখ্যায় ছাপা হয়। ত্রৈমাসিক 'ক্যালকাটা রিভিউ' সেই সময় উপযুক্ত সময়ে প্রকাশিত হয় নি বলে বিলম্বিত সংখ্যা ১৮৫২ -য় হরচন্দ্রের লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল।[১০] হরচন্দ্রের এই প্রকাশিত বক্তৃতাটি মূলত চারটি বিষয়ে বিভক্ত -

'1) Kabikankan Chandi

2) Annada -Mangal and Bydya Sundar

3) Ganga bhakti Tarangini

4) Panchali, Nos, 1,2,3 and 4.'[১১]

হরচন্দ্র দত্তের লেখাটিতে চমৎকার ভাবে 'The laghu bhanga tripadi', 'Laghu tripadi', 'the dirgha bhanga tripadi' সহ আরও এমন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। তবে লেখক জানিয়েছেন যে -

'Dr. Yates thus explains them.'[১২]

অর্থাৎ এই ব্যাখ্যাগুলির ক্ষেত্রে ইয়েটস্ -এর কাছে লেখক ঋণী। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের আলোচনার মধ্যে দিয়ে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত

রূপরেখা তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যদিও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আলোচনায় তাঁর রচনার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতেও ভোলেন নি প্রাবন্ধিক। একই সঙ্গে প্রাচীন কবিদের সম্পর্কে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত দীনতাপূর্ণ মনোভাব জানাতেও কুণ্ঠা করেন নি।[১৩]

বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বেথুন সোসাইটিতে 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-টি প্রথম পাঠ করেন ১৩ মে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৯ বঙ্গাব্দ)।[১৪] ঐ লেখাটি ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ১৪ মে ১৮৫২-য় 'সংবাদ সাগর' পত্রিকার গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।[১৫] বক্তৃতাটি প্রথম মুদ্রিত পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে।[১৬] এই বক্তৃতাটি ছিল আসলে ১৮৫২-র ৮ এপ্রিল হরচন্দ্রদত্তের বেথুন সোসাইটিতে পঠিত একটি প্রবন্ধের যোগ্য উত্তর স্বরূপ।[১৭] হরচন্দ্র দত্ত তাঁর প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলা কবিতাকে যেভাবে আক্রমণ করেন এবং সোসাইটির কয়েকজন সভ্য তাঁকে যেভাবে সমর্থন করেন,[১৮] সেই ভঙ্গি রঙ্গলালের পছন্দ হয়নি। ফলে হরচন্দ্রের সেই বক্তৃতার প্রতিবাদ স্বরূপই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রঙ্গলালের বাংলার প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে যেমন লেখাপড়া এবং ভাবনা - চিন্তা ছিল, তেমনি ছিল পারম্পর্য ক্রমে যুক্তি সাজাবার ক্ষমতাও। অন্তত তাঁর বক্তৃতার গঠনে তাঁর এই ক্ষমতার প্রকাশ রয়েছে। হরচন্দ্র ও তাঁর সমর্থকদের প্রতি বিনয়ী কটাক্ষ প্রদর্শন স্বরূপ রঙ্গলালের বক্তব্য -

'আমারদিগের আবার কবিতা - তাহার আবার কথা, আমি নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সেই জন্যই এই সভ্য সমাজে উল্লেখ করিতেছি, বাঙ্গালাদেশে কবিতা সতী আবির্ভূতা আছেন, একথা শুনিলে ইংরেজী বিদ্যোজ্জ্বল বুদ্ধিনববাবুরা আমাকে উপহাস করিতে

পারেন, অতএব এই সভার মধ্যে যে যে মহাশয় সেই ভাবের ভাবী, তাঁহারা হাস্য করুন, আমি প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে আমি চরিতার্থ মানিব। সত্য বটে, আমারদিগের দেশে একজন মিল্টন অথবা একজন শেক্সপিয়র জন্মেন নাই, ...।'[১৯] হরচন্দ্র দত্তের আগে রঙ্গলাল কৈলাসচন্দ্র বসুর সমালোচনা করেছেন। তিনি বেথুন সোসাইটিতে প্রায় একই বিষয় নিয়ে বক্তৃতাকালে জয়দেব স্বাধীনদেশে জন্ম গ্রহণ করেন[২০] -এ বিষয়ে যে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করেই রঙ্গলাল তাঁর ভুলের সংশোধন করেছেন। এর দ্বারা রঙ্গলালের বিচক্ষণতাও প্রমাণিত। একই ভাবে হরচন্দ্র দত্তও যখন কবিকঙ্কণকে বাংলার আদিকবি রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সেখানেও কবিকঙ্কণের আদি বাঙালি কবিদের পর পর উল্লেখ করে রঙ্গলাল প্রমাণ করেছেন যে কবিকঙ্কণ বাংলার প্রথম আদি কবি নন।[২১]

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কাশীদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে অনুবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যায়। বাংলা সাহিত্যেতিহাস চর্চায় সম্ভবত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি অনুবাদের স্বরূপ নিয়ে যে কয়েকটি কথা বলেছেন তা বাংলা সাহিত্যে প্রথম - 'কাশীদাস মূল কাব্য রচক ছিলেন না, অনুবাদক ছিলেন বলিয়া তাঁহার শক্তির প্রতি সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নহে; যেহেত্ত তেঁহ ব্যাসকৃত মহাভারতের প্রকৃত অনুবাদ করেন নাই; অনুবাদ দুই প্রকার হয়, এক মর্ম্মানুবাদ, অপর ভাষানুবাদ, কিন্তু কাশীদাস ইহার কোন নিয়মেই রচনা করেন নাই, মর্ম্মানুবাদ হইলে জৈমিনী ভারতের ভিন্ন প্রকার বিবরণ সকল সংগ্রহ করিতেন না, ...।'[২২]

রঙ্গলালের বক্তব্যে বৈষ্ণব কবিদের কোন আলোচনা না থাকায় বৈষ্ণব ধর্ম ও তার কবিদের সম্পর্কে তাঁর বা সমকালের অন্যান্য বিদগ্ধজনদের মনোভাব জানা যায় না। ভারতচন্দ্র সম্পর্কে উনিশ শতকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলত দুইরকম। একদল যাঁরা তাঁর সমালোচনায় নির্মম, অপর দল তাঁর গুণগ্রাহী। ভারতচন্দ্র সম্পর্কে রঙ্গলাল এক জায়গায় বলেছেন -

'ভারতচন্দ্রের কবিতায় অসাধারণ কবিতাশক্তি আছে একথা আশু অগ্রাহ্য হইবেক; সত্য বটে, ভারতচন্দ্র কোন মহাকবির ন্যায় উচ্চতর ভাব সকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই, ...।'[২৩]

এখন 'উচ্চভাব' কি বিষয় সে কথা রঙ্গলাল স্পষ্ট করে বলেন নি। সমকালে উচ্চভাব বলতে কি কেবল অশ্লীল প্রসঙ্গের বর্জন ছিল ? - তাও স্পষ্ট নয়। রঙ্গলাল তাঁর নিজের কাব্যে যে বিষয় ও ভাবের আমদানি করেছেন, সেই ভাবসমূহই কি প্রকৃত 'উচ্চভাব' সম্পন্ন ছিল ? আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ওপর নির্মম আক্রমণের প্রতিবাদ স্বরূপ রঙ্গলাল ইংরেজি সাহিত্য থেকে উদাহরণ চয়ন করে ভারতচন্দ্রের ওপর আরোপিত দোষসমূহকে খন্ডন করতে চেয়েছেন। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত বাঙালিদের ইংরেজি সাহিত্য অবলম্বন করেই সমুচিত জবাব প্রদান নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী রাখে। এই স্থলে রঙ্গলাল ভারতচন্দ্রের দোষগুণ উভয়েরই বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে কবিওয়ালা প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্যে দিয়ে রঙ্গলালের প্রাচীন কবি ও তাঁদের কাব্য বিষয়ক আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই আলোচনা ও তর্ক - বিতর্কের মধ্যে দিয়েই পরবর্তীকালের 'মধ্যযুগ' বা প্রাচীন কবি ও কাব্য সম্পর্কিত বোধের পরিপুষ্টি ঘটেছে।

কবিজীবনী

১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের লুপ্তপ্রায় জীবনবৃত্তান্ত ও অপ্রকাশিত রচনা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪] এ প্রসঙ্গে ১২৬২ বঙ্গাব্দে ঈশ্বরগুপ্ত জানিয়েছিলেন -

'ইহার পূর্ব্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবন চরিত প্রকাশ করেন নাই, - এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই -আমরা প্রথমেই ইহার পথ প্রদর্শক হইলাম।'[২৫]

একথা ঠিকই যে জীবনচরিত বলতে ঠিক যা বোঝায় বা যাকে আমরা জীবনী বলছি, সেই ধরনের কোন লেখা ঈশ্বরগুপ্তের আগে কেউই প্রকাশ করেন নি। তবে ঈশ্বরগুপ্ত ও যে জীবনী রচনার ব্যাকরণ অনুসারে জীবনী লিখেছেন, তাঁর লেখাগুলি পড়লে সেকথাও পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। সংবাদ প্রভাকরে যে সমস্ত কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত তাদের মধ্যে কেবলমাত্র 'ভারতচন্দ্র' ছাড়া আর কোন লেখাই আলাদা করে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়নি।[২৬]

ঈশ্বরগুপ্ত জীবনী রচনার যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন, তার শুরুটা তিনি করেছিলেন ভারতচন্দ্রকে দিয়ে। তার আগে পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের কোন কবি বা তাঁর জীবনী নিয়ে আলাদা করে কোন আলোচনা ঈশ্বরগুপ্ত করেন নি। বিশেষ করে বৈষ্ণব কবিদের অনুল্লেখ চোখে পড়বার মত। সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কবিদের সম্পর্কে জীবনী রচনার উপযুক্ত প্রামাণ্য তথ্য পাওয়ার অসুবিধে ছিল, অথবা ব্যক্তিগত পক্ষপাত অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের প্রতি বেশি ছিল বা আর অন্য কোন কারণ ছিল। কারণ যাই হোক না কেন, একথা স্বীকার করতে কোন সংশয়ই নেই যে, ব্যক্তিগত আনুগত্য বা প্রশ্নহীন আত্মনিবেদনের প্রকাশ এই রচনাগুলির মধ্যে থাকলে ও, কবিদের ব্যক্তিগত জীবন ও রচনা সম্পর্কে এত নতুন তথ্যের সমাবেশ এর আগে আর ঘটে নি। ভারতচন্দ্রের বংশ পরিচয় ও জন্ম সাল সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত জানিয়েছেন -

' ঁনরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপতি ''ভুরসুট'' পরগণার মধ্যস্থিত ''পেঁড়ো'' নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি অতি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন, সর্ব্ব সাধারণে তাঁহারদিগ্যে সম্মান পূর্ব্বক ''রাজা'' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি ''ভরদ্বাজ গোত্রে'' মুখোপাধ্যায় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য ''রায়'' এবং ''রাজা'' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন .....।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারিপুত্র, ...সর্ব্ব কনিষ্ট ''ভারতচন্দ্র রায়''। এই বিশ্ব বিখ্যাত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনী মন্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।'[২৭]

ঈশ্বরগুপ্তের রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো তাঁর ভাবনা চিন্তা ও লেখায় প্রবেশ করেনি। ফলে জীবনী রচনার একনিষ্ঠ যুক্তিবোধের পরিবর্তে, তাঁর রচনায় ঠাঁই পেয়েছে আবেগ সমৃদ্ধ অলৌকিকে বিশ্বাস। ভারতচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা, বিবাহ, তাঁর সঙ্গে তাঁর সহোদরদের সম্পর্ক, পারস্য ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় গুলি, এমনকি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাল্পনিক সংলাপও এই রচনায় ঠাঁই পেয়েছে। ভারতচন্দ্র সম্পর্কিত এই তথ্যগুলি লেখক কোথা থেকে পেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন -

'ভারতচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র, জ্যেষ্ট পরীক্ষিত রায়, মধ্যম রামতনু রায় এবং কনিষ্ট ভগবান রায়, এইক্ষণে জ্যেষ্ট ও কনিষ্টের বংশ নাই, মধ্যম রামতনু রায়ের পুত্র পুজ্যবর শ্রীযুত তারকনাথ রায় মহাশয় মূলাযোড়ে বাস করিতেছেন, ইনি অতি বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সদ্বিদ্বান্, এবং সুরসিক, অতিশয় প্রাচীন হইয়াছেন, উত্থানশক্তি নাই বলিলেই হয়, বয়স প্রায় ৮১ বৎসর গত হইয়াছে। এই মহাশয়ের অপার কৃপায় তাঁহার পিতামহ রায় গুণাকরের ''জীবন-বৃত্তান্ত'' এবং এই সকল অপ্রকাশিত কবিতার অধিকাংশই প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি এতদ্রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করিলে এতৎ প্রাপণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না।'[২৮]

ভারতচন্দ্রের 'সত্যনারায়ণ'-এর ওপর দুটি রচনা ঈশ্বরগুপ্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রথমটি ত্রিপদী ছন্দে লেখা যথা -

'গণেশাদি রূপ ধর, বন্দ প্রভু স্মরহর,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরী, সত্যপীর নাম ধরি,

প্রণমহ বিধির বিধাতা।।'[২৯]

দ্বিতীয়টি চৌপদী ছন্দে রচিত। যথা -

'শুন সবে এক চিত সত্যপীরগুণগীত,
দুই লোকে পাবে প্রীত, সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ, বন্দ সত্য নারায়ণ,
সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ, যার যেই ভাবনা।।'[৩০]

লেখকের অনুমান যে এই উভয় কবিতা রচনা কালেই কবির বয়স ১৫ বছরের বেশি হয় নি।[৩১] ভারতচন্দ্রের জন্ম-মৃত্যু বা রচনার সাল তারিখ নির্ণয়ের সম্ভবত প্রথম যুক্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা এখানেই। দুটি রচনার সময়কাল লেখক নির্ণয় করেছেন এই ভাবে -

'এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে তিনি কোন্ খানি প্রথম বিরচনা করেন তাহা নিশ্চিত রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না, - কিন্তু অনুমানে এরূপ স্থির হইতেছে যে, ত্রিপদীটিই সর্ব্বাগ্রে রচনা করিয়াছিলেন।- যেহেতু চৌপদীটি ইহার অপেক্ষা অল্পাংশেই উত্তম হইয়াছে।'[৩২]

ঈশ্বরগুপ্ত যখন জীবনী লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন, তার আগে পর্যন্ত কবি বা মনীষীর জীবন চরিত রচনা সম্বন্ধে জনমানসে কোন ধারণা না থাকায় বা লেখকের সামনে ও নির্দিষ্ট কোন আদর্শ না থাকায় গঠনগত দিক দিয়ে রচনার কিছু ত্রুটি অবশ্যই লক্ষ করা যায়। তবে একথা ঠিক যে, ঈশ্বরগুপ্তের এই সংগৃহীত তথ্যই পরবর্তীকালে বিভিন্ন লেখকদের আলোচনার উৎস হয়েছিল। যদিও তাঁদের মধ্যে কেবল রামগতি ন্যায়রত্ন ছাড়া আর কারও লেখাতেই ঈশ্বর গুপ্তের রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৩৩] ঈশ্বরগুপ্তের লেখায় জীবনী বর্ণনা, সাহিত্য রচনার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ এবং অগ্রজদের সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলি মিলেমিশে একীভূত হয়ে গেছে। ভারতচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে পূর্বে অনুল্লিখিত অনেক নতুন পদের বর্ণনা ঈশ্বরগুপ্ত করেছেন। যেমন, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের

পোষা একখানি 'ধেড়ে' -কে লক্ষ করে রাজার সাক্ষাতেই ভারতচন্দ্র 'ধেড়ে' ও 'ভেড়ে'-র সমানরূপ বর্ণনা করে যে পদ রচনা করেন তা উল্লেখযোগ্য।[৩৪]

'ধেড়েকুলে জন্ম পেয়ে বিলে খালে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াইতে ঘুষ্ খেয়ে, লোকে দিত তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাচ, বেড়াইতে পাছ্ পাছ্ ,
এখন্ বাছের বাছ্ , দিতে লও কেড়ে।।'[৩৫]

সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সি, হিন্দি ভাষা মিশ্রিত কবিতাও এই আলোচনায় ঠাঁই পেয়েছে।

কেবল ছোট ছোট অপ্রচলিত পদের উল্লেখই নয়, 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের ছোট উদ্ধৃতি এবং তার ছোট ছোট টীকাও লক্ষণীয়। বিদ্যাসুন্দরের ব্যাখ্যায় নায়ক-নায়িকার শ্রেণিবিভাগ উল্লেখযোগ্য।[৩৬] অগ্রজের জ্ঞান ও পান্ডিত্য প্রকাশে যে বিনয়ী মনোভাব ঈশ্বরগুপ্ত দেখিয়েছেন তা সর্বদাই যে প্রশ্নহীনতায় উত্তীর্ণ হয়েছে তা নয়। 'অন্নদামঙ্গল' প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য -

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার আশ্রয় লওয়াতেই নানাকারণে এই 'অন্নদামঙ্গল'- অনেক প্রকারে দোষশূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে।'[৩৭]

'অন্নদামঙ্গল' এর দোষযুক্ত বা দোষমুক্ত হওয়ার জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের সভার কি গুরুত্ব ছিল তা স্পষ্ট নয়। কবি তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা ও পরিশ্রমের দ্বারা পরিশীলিত আকারে পরিবেশন করবেন তাঁর কাব্য এবং তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সমকালীনতার প্রভাবে সমাদৃত হবে বা হবে না সেই রচনা। এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষক, রচয়িতাকে প্রশ্রয় ও সুযোগ দিতে পারেন কিন্তু কাব্যের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর কোন কৃতিত্বই থাকে না। ফলে পরিশেষে ঈশ্বরগুপ্তের এই মতামতের সাথে সহমত পোষণ করা যায় না একবারেই।

১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংবাদ প্রভাকরে রামপ্রসাদ সেনকে নিয়ে সম্ভবত তিনটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনটি-র উল্লেখ করবার কারণ -মুদ্রিত 'কবিজীবনী' অংশে প্রকাশের সাল তারিখ সহ এই তিনটি রচনার উল্লেখই রয়েছে।

তিনটি রচনার নাম একই - 'কবিরঞ্জন ঁ রামপ্রসাদ সেন।' এর মধ্যে তৃতীয় রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপ্রভাকরে, মঙ্গলবার, ১ চৈত্র, ১২৬১ সালে। ইংরেজি ১৩ মার্চ, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে।[৩৮] এই লেখাটি প্রকৃতপক্ষে একাধিক প্রভাকর পাঠকের অনুরোধে মুদ্রিত একাধিক রামপ্রসাদী পদের ও সংগীতের সংক্ষিপ্ত সংকলন। এই নামকরণ যুক্ত গীতগুলি পাঠকের কাছে নতুন। যেমন- 'সীতার বিলাপোক্তি সংগীত', 'শিবসংগীত', 'নৌকাখন্ডের সংগীত', 'শব-সাধন বিষয়ক সংগীত[৩৯] ইত্যাদি।

দ্বিতীয় রচনাটি প্রকাশিত হয় সংবাদ প্রভাকরে, শুক্রবার, ১ মাঘ ১২৬০ সালে। ইংরেজি ১৩ জানুয়ারি, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে।[৪০] সাধু ভাষায় পরিষ্কার চলমান গদ্যে লিখিত এই রচনাটি সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকের কাছে প্রেরিত একটি পত্র। পত্র প্রেরকের নাম ও পরিচয় এক্ষেত্রে অনুল্লিখিত। রামপ্রসাদের প্রথম লেখাটি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হওয়ার পর রামপ্রসাদের গ্রামের কোন ব্যক্তি উক্ত চিঠি পাঠিয়েছিলেন সে কথার স্বীকারোক্তি চিঠিতেই রয়েছে।[৪১] রামপ্রসাদের জীবনী ও গীতপদের দীর্ঘ সংকলন লিখিত আকারে প্রায় প্রথম প্রভাকরের পাঠকদের সামনে আসছে, সাধারণ মানুষ তার সাথে পরিচিত হচ্ছেন, - ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার এই জায়গাটি থেকেই প্রেরক এই পত্রটি পাঠিয়েছিলেন, সম্পাদক প্রয়োজনবোধ অনুসারে সেই চিঠিটি সংযুক্ত করেছেন।

প্রথম লেখাটি প্রকাশিত হয় সংবাদ প্রভাকরে, গুরুবার, ১ পৌষ ১২৬০ বঙ্গাব্দে, ইংরেজি ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে।[৪২] এই লেখাটি ছিল জীবনী ও সাহিত্য কেন্দ্রিক। কিন্তু তারও আগে প্রভাকরে রামপ্রসাদের কয়েকটি সংগীত লিপিবদ্ধ হয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্ত জানাচ্ছেন -

'আমরা আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকর পত্রে মহাত্মা ঁ রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত কয়েকটী গীত প্রকটন করিয়াছিলাম। তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, যেহেতু ইহার তুল্য বঙ্গভাষা-ভাষিত অমূল্য গীত রত্ন

এ পর্য্যন্ত কোন কবি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।'[৪৩]

ভারতচন্দ্রের জীবনী ঈশ্বরগুপ্তর হাতে যতখানি তথ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, রামপ্রসাদের রচনা ততখানি হয় নি। এর কারণ সম্ভবত ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম ঈশ্বরগুপ্তের তথ্য সংগ্রহের প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত জনশ্রুতি ছাড়া তথ্যনিষ্ঠ আর কোন উপাদান ঈশ্বরগুপ্তের হাতে আসেনি। জনরব ও অলৌকিক প্রবাদ এর মিশেলেই রামপ্রসাদের জীবনী গড়ে উঠেছে। রামপ্রসাদের প্রচলিত পদগুলি থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানবার কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। হয়ত সেই প্রচেষ্টা খুব বেশি ফলদায়কও হত না।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের আলোচনায় অবধারিত ভাবেই এসে পড়েন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। উক্ত দুই কবির কবি প্রতিভাকেই তিনি সমাদর জানিয়েছিলেন। এবং উক্ত দুই কবির হাতেই 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য জন্মলাভ করায় তার একটা তুলনা টানবার প্রচেষ্টাও এসে পড়ে।

'রামপ্রসাদ সেন দুঃখী ছিলেন এবং রচনাকল্পে কোন ব্যক্তির আনুকূল্য, প্রাপ্ত হয়েন নাই, আপনার মনে যেমন উদয় হইয়াছিল, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ভারতচন্দ্রি বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের এক এক স্থলে এমত সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ভারতচন্দ্রী রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যেখানে পরমার্থ প্রসঙ্গ এবং কালী নামের গন্ধ পাইয়াছিলেন সেই সেই স্থানে রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন।'[৪৪]

রামপ্রসাদের বিভিন্ন পর্যায়ের শাক্ত সংগীত গুলির রাগিণী ও তাল সহ উল্লেখে সম্পাদক কৃতিত্বের দাবীদার। কিন্তু এই গীত বা পদগুলি সংরক্ষণ বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্যা উৎপন্ন হয় তার উল্লেখ করতে ও গ্রন্থকার ভোলেন নি।

‘পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা রামপ্রসাদি পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, একাল পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, যেখানে যাহা প্রাপ্ত হই তাহাতেই এক একখানা বিড়ম্বনা দেখিতে পাই। হয় মাঝে মাঝে পোকায় কাটিয়াছে, নয় লেখকেরা লেখার দোষে প্রমাদ করিয়াছেন, ইহাতেই ভাবার্থ স্থাপন করণে ঘোরতর বিপদ ঘটিতেছে।’[৪৫]

কবিকলাপ ও কবিচরিত

ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তীকালে হরিশচন্দ্র মিত্রের ‘কবিকলাপ’ -এর সন্ধান পাওয়া যায়, যার প্রথম প্রকাশ ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে।[৪৬] এরপরে যে লেখাটির সন্ধান পাওয়া যায়, তা হল হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের ‘কবিচরিত’, প্রথম প্রকাশ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ।[৪৭] (বলাবাহুল্য এই লেখাগুলির কেবল উল্লেখই পেয়েছি আমরা। সামনে দেখবার সুযোগ হয় নি।)

বঙ্গভাষার ইতিহাস

‘বঙ্গভাষার ইতিহাস’ (প্রথম ভাগ) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে। রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।[৪৮] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকেন্দ্রিক লেখালেখির তালিকায় এটিই প্রথম ‘ইতিহাস’ নামযুক্ত রচনা। রচনাটির ‘পূর্ব্বপীঠিকা অংশে লেখক জানিয়েছেন -

‘প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, ‘বঙ্গভাষার ইতিহাস’ নামক একটী প্রবন্ধ জ্ঞানদীপিকা সভার দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশন সময়ে মৎকর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। .....এই পুস্তক রচনা সময়ে নিম্নলিখিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রের

সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি - Calcutta Review, Westminster Review কবিচরিত এবং বিবিধার্থ সংগ্রহ।'[৪৯]

ঐ একই অংশ থেকে আমরা একথাও জানতে পারি যে, রচনাটির বিষয়ে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় লেখককে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন।[৫০]

বঙ্গভাষার ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি রচনা, যার শুরু হয়েছে বঙ্গভাষার উৎপত্তি কেন্দ্রিক বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এবং শেষ হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্য লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখক কোন রকম গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষকের পরিচয় দেন নি। পূর্বসূরীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য গুলিকে তিনি নিজের মত করে লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে কতখানি 'ইতিহাস' হয়ে উঠেছে এই লেখাটি তা বিতর্কিত বিষয়। তবে নিজের মত করে লেখক চেষ্টা করেছেন প্রাচীন কবিদের সময়কাল সম্পর্কে মোটামুটি একটি আন্দাজ দেওয়ার। এক্ষেত্রে লেখক মূল ইতিহাসকে অবলম্বন করেছেন এবং তার সাথে মিলিয়ে সাহিত্যের সময়কালকে জানবার একটি চেষ্টা করেছেন। যুগ বিভাজনের কোন প্রসঙ্গ বা নীতিকে তিনি এক্ষেত্রে অবলম্বন করেন নি।

বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময়কাল সম্পর্কে লেখক নির্দিষ্ট করে কিছু না বললেও, নিজস্ব বিবেচনা দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত ভাষা থেকে।[৫১] একই সঙ্গে বিদ্যাপতিকে চৈতন্যের একশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বিদ্যাপতির রচনায় হিন্দি শব্দের বাহুল্য লক্ষ করে লেখক অনুমান প্রকাশ করেছেন যে -

'আগে বাংলায় হিন্দীভাষা প্রচলিত ছিল।'[৫২]

কেবল বিদ্যাপতির রচনাই নয়, পাশাপাশি চন্ডীদাসের রচনা অবলম্বন করেও লেখকের অনুমান যে, হিন্দির অপভ্রংশেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি।[৫৩] বাংলা ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা লেখক এখানেই শেষ করেছেন।

এর পরেই লেখকের আলোচনার বিষয় হয়েছে - 'প্রাচীন রচনা ও গ্রন্থকর্ত্তাগণ'। এর শুরু লেখক করেছেন বিদ্যাপতিকে কেন্দ্র করে। বিদ্যাপতির রচনা পাঠ করে লেখক মোটামুটি নিশ্চিত যে বিদ্যাপতি 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী' ছিলেন।[৫৪] প্রাচীন কবিদের তালিকায় বিদ্যাপতিকে প্রথম মান্যতা দেওয়ার কারণ সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন -

'বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা রচয়িতা এ পর্যন্ত আমাদিগের নয়ন পথের পথিক হয় নাই, সুতরাং বিদ্যাপতিকেই প্রথম বাঙ্গালি রচয়িতা বলিয়া আখ্যাত করা গেল।'[৫৫] বিদ্যাপতির পরেই চন্ডীদাসের আলোচনায় লেখক তাঁকে 'বড়ু' উপাধি ধারী[৫৬] রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং 'শ্রীরাধা গোবিন্দ কেলীবিলাস' গ্রন্থের প্রণয়ন কর্তা রূপে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৭] পাশাপাশি পদাবলিকার গোবিন্দ দাসকে বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের সমকালবর্তী রূপে বিবেচনা করেছেন।[৫৮]

এরপরেই উল্লিখিত হয়েছেন জীব গোস্বামী। 'করচাই' গ্রন্থের গ্রন্থনকর্তা রূপে।[৫৯] আনুমানিক ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে বাবরের সময়কালে জীব গোস্বামীকে স্থাপিত করেছেন মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।[৬০] এরপরে এসেছেন বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কৃষ্ণদাসকে লেখক ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সময়কালে 'চরিতামৃত' -এর পাশাপাশি 'ভক্তমাল' গ্রন্থ প্রণেতা রূপেও উল্লেখ করেছেন।[৬১]

পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত কৃত্তিবাস। লেখক জানিয়েছেন -

'চৈতন্য-চরিতামৃত রচনার পর কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রচারিত হয়। প্রকৃত গুণ ধরিয়া বিবেচনা করিলে কৃত্তিবাস বঙ্গদেশের প্রথম কবি। ..... অনেকে অনুমান করেন, প্রায়

৩০০ শত বৎসর হইল, তিনি এ দেশে বিদ্যমান ছিলেন। এটী সত্য হইলে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে কৃত্তিবাস, সম্রাট আকবরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।'[৬২]

কৃত্তিবাসের পরে উল্লিখিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশ থেকে কবিকঙ্কণের ব্যক্তিগত জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার থেকেই লেখকের পর্যবেক্ষণ -

'কবিবরের মিশ্রই প্রকৃত উপাধি ও চক্রবর্তী ডাক উপাধি মাত্র'।[৬৩]

মুকুন্দরাম সম্পর্কে সমকালে একশ্রেণির মানুষের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত ছিল, লেখক সেই ধারণার সমর্থক ছিলেন না।

'বঙ্গীয় কবিগণের জীবনী লেখক মহোদয় গণ ইঁহাকে প্রথম প্রহেলিকা রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।'[৬৪]

'বঙ্গীয় কবিগণের জীবনী লেখক' বলতে সম্ভবত লেখক 'কবিচরিত' প্রণেতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায়কে বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত -

'আদি কবি বিদ্যাপতির রচনাতেও প্রহেলিকা দেখা যায়, অতএব আমরা চক্রবর্ত্তী কবিকে উপরোক্ত প্রশংসা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হই।'[৬৫]

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রণেতা রূপে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের আগেও প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন লেখক এবং বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি রূপে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বররুচির এবং তাঁর একটি সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[৬৬] প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর পরে ও রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের আগে 'দেব' উপাধি ভূষিত কাশীরাম দাসের উল্লেখ পাই।[৬৭] রামপ্রসাদের সময়কাল রূপে ১৭২২ বা ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দ চিহ্নিত।[৬৮] তবে তাঁর সাথে আজু গোসাঞীর উত্তর-প্রত্যুত্তর মন্ডিত যে সংলাপের উল্লেখ করেছেন লেখক তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পরিশেষে ভারতচন্দ্রকে 'রসমঞ্জরী' প্রণেতা ও 'চন্ডীনাটক' রচনায় ব্রতী রূপে চিহ্নিত করে

প্রাচীন কবি-রচয়িতা সম্পর্কিত আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এরপরে আলোচিত হয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিরা।

আসলে ইতিহাসকে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে, ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য বা বক্তব্য অনুযায়ী ইতিহাসের উপাদান বা পূর্ববর্তী মতামত সমূহের পরিবর্তন ঘটে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের ক্ষেত্রে তথ্য বা উপাদান প্রাচুর্যহীন হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী রচয়িতাদের লিখিত মতামত বা তথ্য সমূহের উপর বিশ্বাস করা ছাড়া অন্য পন্থা নেই। একজন ঐতিহাসিকের যে নির্মোহ এবং আবিলতাহীন দৃষ্টিভঙ্গি থাকবার প্রয়োজন তা খানিকটা হলেও মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছিল। কিন্তু গবেষকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। সমগ্র রচনাটির অবলোকন করলে বোঝা যায় যে, নামে ইতিহাসের উল্লেখ থাকলেও লেখকের প্রকৃত অভিপ্রায় সম্ভবত ইতিহাস রচনার ছিল না।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

রামগতি ন্যায়রত্নের ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। এবং এর কয়েক মাস পরেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।[৬৯] দুটি ভাগ একত্রে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৭০] এই গ্রন্থেই আমরা প্রথম বাংলা সাহিত্যকে পরিমাপ করবার একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড বা কালদন্ড পাচ্ছি, যার সাম্মানিক নাম ‘যুগবিভাজন’। এই যুগবিভাজনের নামকরণ এই গ্রন্থে হয়েছে ‘আদ্যকাল, মধ্যকাল ও ইদানীন্তনকাল’[৭১] নামে। ‘কাল’ শব্দটির দ্বারা সময়কে চিহ্নিত করে সময়কেই বিভাজনের যে পদ্ধতি রামগতি ন্যায়রত্ন অবলম্বন করেছিলেন সে প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল -

‘বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে আমরা আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন নামে তিনটী কালের কল্পনা করিয়াছি, এবং প্রথম হইতে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে

আদ্যকাল, চৈতন্যদেব হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে মধ্যকাল এবং ভারতচন্দ্র হইতে আদ্যপর্য্যন্ত কালকে ইদানীন্তনকাল নামে অভিহিত করিয়াছি।'[৭২]

ঠিক কি কারণে এমন 'নামকরণ' গ্রন্থকার করে ছিলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন উত্তর তিনি দেন নি। 'ইদানীন্তন কাল' বলতে যদি আধুনিক যুগকে বোঝান হয়, এবং 'আদি' বলতে যদি প্রাচীনত্বকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তাহলে মাঝে 'মধ্য' শব্দটি এল কোথা থেকে? এবং এই শব্দটির দ্বারা ঠিক কি বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে সেই বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। বাংলা সাহিত্যে 'মধ্যকাল' -এর ব্যবহার রামগতি প্রথম করেছেন, একথা স্পষ্টভাষায় প্রমাণিত। কিন্তু এই যুগবিভাজন এবং 'মধ্য'র উৎস খুঁজতে গিয়ে আমরা হাজির হয়েছিলাম ইংরেজি সাহিত্যের দোরগোড়ায়। সেখানে গিয়ে দেখি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস কেন্দ্রিক সম্ভবত সবচেয়ে পুরনো যে বইটি রয়েছে সেটি হল Taine -এর 'History of English Literature`, (এ প্রসঙ্গে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এই বইটির সবচেয়ে পুরনো দুটি সংস্করণ আমরা দেখেছি। দ্বিতীয় যে সংস্করণটি আমরা দেখেছি তার একটি প্রতিলিপি আমরা পরিশিষ্টে সংযোজিত করেছি। প্রথম যে সংস্করণটি আমরা দেখেছি তার সাথে দ্বিতীয় সংস্করণের স্বরূপগত কিছু ফারাক থাকলে ও বিষয়গত বা উপস্থাপনা গত তেমন কোন বড় পার্থক্য নজরে আসে নি। কিন্তু সমস্যা হল যে সংরক্ষণের অভাবে প্রথম সংস্করণের যা অবস্থা, সেখান থেকে গ্রন্থপঞ্জির জন্য তথ্য সংগ্রহ বা প্রতিলিপি সংগ্রহ করা কোনটাই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যদিও প্রথম সংস্করণের শুরুর অংশে 'New Edition' শব্দটি লেখা ছিল। অর্থাৎ আমাদের দেখা প্রথম সংস্করণের ও পুরনো সংস্করণ রয়েছে।

যে প্রতিলিপিটি আমরা পরিশিষ্টে সংযোজিত করেছি সেই সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন H. VAN LAUN. ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ৩১ তারিখে।[৭৩] এই সংস্করণের সূচিপত্র অংশটিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তৃতীয় অধ্যায়, যার নাম

'The New Tongue' (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) - এই অধ্যায়ের অধ্যায় বিভাজনের দ্বিতীয় অংশের প্রথম লাইন -

'How the middle age degenerated -'[৭৪]

লক্ষণীয় শব্দ 'middle age'। কেবল দ্বিতীয় অংশেই নয়, একই অধ্যায়ের তৃতীয় অংশে দুই বার এবং ষষ্ঠ অংশে আরও একবার[৭৫] আমরা এই শব্দের উল্লেখ পাই। - এখন এ প্রসঙ্গে আমাদের অনুমান যে, সম্ভবত ইংরেজি সাহিত্যের 'Middle Age' -ই বাংলায় পরবর্তী কালে 'মধ্যকাল' বা 'মধ্যযুগ' রূপে চিহ্নিত হয়েছে। একই সঙ্গে এমন সম্ভাবনাও একেবারে নস্যাৎ করা যাচ্ছে না যে, রামগতির 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' রচনারও আগে Taine -এর এক বা একাধিক সংস্করণের প্রচলন ভারতবর্ষ তথা বাংলায় ছিল। ফলে রামগতি ন্যায়রত্ন ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের সময় বিভাজন -এর আদর্শে প্রাণিত হয়েই যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিভাজন করেন নি, একথা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না।

'ইদানীন্তনকাল' বা 'আধুনিক যুগ' -এর আগে পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে যে সময়কালকে 'আদ্যকাল' বা 'মধ্যকাল' বা আর অন্য কোন নামে অভিহিত করা হচ্ছে, সেই সময়কালে বাংলায় রাজত্ব করছেন মুসলমান শাসকরা। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে জন ক্লার্ক মার্শম্যান লেখেন 'Outline of the History of Bengal Compiled for the use of the youths in India. ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এই বইটির বাংলায় অনুবাদ করেন গোবিন্দচন্দ্র সেন।[৭৬] বইটির বিষয়বস্তু ছিল আদিশূর থেকে বেন্টিঙ্কের সময়কাল পর্যন্ত।[৭৭] তবে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ও আগে ১৮১৩ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক চার্লস স্টুয়ার্ট লেখেন 'History of Bengal from the first Mahamedan invasion until 1757'. এই বইটির বিষয়বস্তু ও কালসীমা তুর্কি বিজয় থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত।[৭৮] একথা ঠিক যে ইংরেজদের ভারতবর্ষের ইতিহাস দর্শনকে এদেশীয়রা পুরোপুরি মেনে নিতে পারে নি

বলেই পরবর্তীকালে ভারতীয় বা বাঙালিরা তাঁদের নিজেদের ইতিহাস লিখতে শুরু করে। কিন্তু ইংরেজদের মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কিত ধারণাকে হিন্দুরা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতেও পারে নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে ইতিহাস বিষয়ের আমদানি, ইতিহাসের বিষয় ও স্বরূপের জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলির দ্বারা প্রথম থেকেই 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' -এর বীজ হিন্দুদের মধ্যে বপন করা হয়েছিল। এটা ঠিক যে ইংরেজদের পুরো ভারতীয় ইতিহাস দর্শন এদেশের মানুষরা মেনে নেয় নি, কিন্তু যেখানে মুসলমান প্রসঙ্গ এসেছে সেই জায়গায় এসে তাঁরা ভেবেছে। ফলস্বরূপ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরেজদের অনুসরণে ও অনুকরণে পুরো মুসলমান রাজত্বের সময়কালকে আধুনিকতার পূর্ববর্তী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং 'Middle Age' -এর তর্জমায় 'মধ্যকাল' বা 'মধ্যযুগ' (বা কিছুটা 'আদিকাল' অন্তত 'চর্যা' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' -এর আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা এবং এই সভার দ্বারাই স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনার প্রবর্তন হয়। এরপর থেকেই শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে সাধারণ ভাবে ইতিহাস বোধ ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হতে থাকে।[৭৯] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঠিক পরের দিন কর্তৃপক্ষ পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই পাঠ্যক্রমে বলা হয় যে Language বিভাগে ইংরেজি আবশ্যক ভাষা। এছাড়া নির্দিষ্ট এগারোটি ভাষার মধ্যে যে কোন দুটি ভাষা ছাত্র-ছাত্রীরা পছন্দ অনুসারে গ্রহণ করতে পারবে, তার মধ্যে একটি ভাষা ছিল বাংলা (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।[৮০] এ প্রসঙ্গে বাংলার যে পাঠ্যক্রম তৈরি হয়, তার মধ্যে 'অন্নদামঙ্গল' ছাড়া বাকি যে আটটি বিষয় ছিল তার সব কয়টি সংস্কৃত (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' -ও এর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু আমাদের অনুমান তার কোনটাই কৃত্তিবাস বা কাশীদাসের নয়,

কারণ পাঠ্যক্রমে সংস্কৃতানুসারী বিষয়ের আধিক্য। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান যখন বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা দিচ্ছে তখন সেখানে কেবল মাত্র 'অন্নদামঙ্গল' ছাড়া, আর অন্য কোন গ্রন্থ স্থান পাচ্ছে না।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় সাম্মানিক স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু হয়। এই পাঠ্যক্রমকে অবলম্বন করে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষক রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের তত্ত্বধানে যে পরীক্ষা হয়, সেখানেও প্রশ্নপত্রে History of the Bengali Language and Literature -এর যা চেহারা, তার মূল বক্তব্য বাংলা হলেও বাইরের চেহারায় সাহেবীয়ানা প্রকাশিত। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এমনকি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের I.A. এবং I.Sc. পরীক্ষা, যেখানে কেবলমাত্র মহিলারাই পরীক্ষার্থী ছিলেন, সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও একই স্বরূপ প্রকাশিত, যেমন -

'Narrate briefly in simple Bengali Prose the Principal incidents of the life of Gouranga as depicted in your text'।[৮১]

এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন এবং যোগীন্দ্রনাথ বসু। পরীক্ষক ছিলেন কুমুদিনী বসু।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের চেহারা ছিল -

'এত দিনে এই অধ্যবসায় সম্পন্ন ধর্ম্ম-বীরের বাসনা চরিতার্থ হয়। বিদেশী ধর্ম্মবীর আপনাদের পবিত্র তীর্থ কপিলবস্তু, শ্রাবস্তী, বারাণসী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি দর্শন করিলেন। Why are these places regarded as tirthas by the Buddhists'?[৮২]

এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রধান পরীক্ষক ছিলেন বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পরীক্ষক ছিলেন বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রশ্নের মান সম্ভবত ৪ বা ৮ (বাংলায়)। (যেহেতু প্রশ্নপত্রে কেবল (৪) সংখ্যাটি লেখা ছিল, তাই এটি বাংলার সংখ্যা রূপে গ্রহণ করা হবে না ইংরেজির তা বুঝতে পারি নি।)

প্রশ্নপত্রের এত সমাহার এবং তার আলোচনার দ্বারা আমরা এটাই দেখতে চাইছি যে, প্রতিষ্ঠানের কাছে 'মধ্যযুগ' শুরুর দিকে ঠিক কিভাবে মান্যতা পেয়েছে। ১৮৫০ থেকে ১৯২০ -এর মধ্যে মধ্যযুগের অবয়ব ঠিক কী ভাবে ও কত রকম ভাবে গঠিত হয়েছিল সেই বিষয়েই আলোকপাত করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্ধৃত ও পরিশিষ্টের প্রশ্নপত্র গুলির মাধ্যমে আমরা অবয়ব নির্মাণের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরতে চেয়েছি।

THE LITERATURE OF BENGAL

রমেশচন্দ্র দত্তের The Literature Of Bengal নামক রচনাটির Revised Edition প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে।[৮৩] রচনাটির 'Preface' অংশে গ্রন্থকার জানিয়েছেন -

'ABOUT twenty years ago, I Published in a local magazine a series of biographical and critical essays on Bengali writers, and they were published in a collected form under the disguise of a nom de plume in 1877. The publication did not recive much attention at the time ..... I have accordingly virtually rewritten most portions of the book, including the first five chapters as well as the last eight chapters, and I have added two new chapters on the schools of logic and law at Nabadwip.'[৮৪]

রচনাটিকে গ্রন্থকার ১৮৯৫ - এর সংস্করণে সর্বমোট কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে বাংলা ভাষা এবং অক্ষর নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এবং এই অংশে বাংলা ভাষা ও তার অক্ষরের উৎস প্রসঙ্গে গ্রন্থকার জানাচ্ছেন -

'The different Prakrits have been modified into the different spoken dialects of modern India. It is probable that the Maharashtri and Sauraseni have been modified into the modern Hindi, and that the Magadhi Prakrit has been modified into the modern Bengali. Hindi received literary recognition in the twelfth century after - Christ, the Bengali in the fourteenth century.'[৮৫]

'Professor Max Muller holds that India had no written alphabet before the fifth century B.C., and that the Indian alphabet was then borrowed form the west.'[৮৬]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি জয়দেব সম্পর্কে আলোচনার পর তৃতীয় অধ্যায়ে কবি চন্ডীদাস সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত। এই অধ্যায়ের নামকরণ অংশটি লক্ষণীয়।

'EARLY BENGALI LYRIC POETRY -CHANDIDAS.

Fourteenth Century.'[৮৭]

প্রথম অংশে বিষয়ের প্রাধান্য, দ্বিতীয় অংশে নির্দিষ্ট রচয়িতা এবং তৃতীয় অংশে সময়ের নির্দিষ্টতা, - মানসিক দোলাচলতার পরিচয়বাহী। বাংলা সাহিত্যকে প্রশ্নহীন ভাবে নিদিষ্ট কাঠামোয় বিভাজিত করবার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পথের হদিশ না পাওয়ায় একসাথে তিনটি পথেরই সমাবেশ ঘটেছে রমেশচন্দ্র দত্তের লেখায়, পরবর্তী অংশে আমরা এর আরও পরিচয় পাব। গ্রন্থকার নিজেই নিজের পথ নির্বাচন করতে সক্ষম হন নি।

বাংলার প্রাচীন গীতিকবিদের আলোচনায় কেবল চন্ডীদাসের নাম দেখে একটু অবাক হলেও, অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতে সংক্ষেপে হলেও বিদ্যাপতির আলোচনা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিদ্যাপতির অবস্থান সম্পর্কে গ্রন্থকারের মতামত -

'Bidyapati, The earliest poet of Behar.'[৮৮]

বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতিকে যুক্তিসহ মিথিলার কবি রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেও, গ্রন্থকার সম্ভবত সেই যুক্তিসমূহে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই তিনি বিহারের কবিরূপে বিদ্যাপতিকে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু এই নির্দিষ্টতার ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব কোন যুক্তি বা অনুমান প্রকাশ করেন নি। বিহার ও মিথিলাকে লেখক একই ভৌগোলিক স্থানের অন্তর্ভুক্ত করতেন কিনা তাও স্পষ্ট নয়।

বিদ্যাপতির আলোচনা সংক্ষেপে করলেও চন্ডীদাসের আলোচনা তুলনামূলক দীর্ঘ। গ্রন্থকার সম্ভবত বুঝতে পারেন নি যে ক্রমানুসারে সাহিত্যের আলোচনায় ব্যক্তিগত পক্ষপাতের কোন জায়গা নেই। নামকরণেও নয়, বিশ্লেষণেও নয়। বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনায় লেখকের মতামত -

'Chandidas is cloying, and sometimes monotonous, Bidyapati is often artificial in his images ideas.'[৮৯]

পদকল্পতরু ও চন্ডীদাসের পদের ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন গীতিকবিদের পাঠ করবার প্রবণতা পূর্বসূরীদের অনুসারী।

চতুর্থ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে মহাভারত এবং কাশীরাম দাসের আলোচনা এবং তারা উভয়েই পঞ্চদশ শতাব্দীর সময়কালে ঠাঁই পেয়েছেন। এই অধ্যায়ের শিরোনাম -

'KASIRAM DAS AND HIS MAHABHARATA.
Fifteenth Century.'[৯০]

কবি-বিষয়-সময়কাল -এই ক্রম অনুসৃত হয়েছে। কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুবাদকে গ্রন্থকার, 'First great and national literary work in

Bengali language.'[৯১] - এই অভিধায় অভিহিত করেছেন। গ্রন্থকার মনে করেন যে কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুবাদকে অনুসরণ করেই কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।[৯২] এবং তাঁর এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে কৃত্তিবাস কে অবস্থানের দিক দিয়ে তিনি কাশীরাম দাসের পরবর্তী সময়ে ঠাঁই দিয়েছেন, পরবর্তী অধ্যায়ে তার প্রমাণও রয়েছে।

মূল সংস্কৃত মহাভারতের তুলনায় আকারে বাংলায় অনুদিত মহাভারত সংক্ষিপ্ত। এর মূলে রয়েছে অনুবাদকের নিজস্ব অনুবাদ পদ্ধতির মুন্সীয়ানা। এই মুন্সীয়ানার পন্থা প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের নিজস্ব দর্শন প্রশংসনীয়।

'.....giving an account of Dushyanta's hunt in thirty - one couplets, has been reduced to eight couplets by Kasiram. Section LXX, describing King Dushyanta's entry into Kanva's forest in fifty couplets, hasbeen reduced to ten couplets in Bengali.'[৯৩]

'Such is the method in which Kasiram Das has performed the great task which he imposed upon himself. The mere mechanical work of translating and condensing a great sanscrit epic into over thirty -six thousand Bengali couplets is a tremendous task. If we suppose that Kasiram composed fifteen couplets every day, and that he worked twenty days in every month, he must have laboured ten years of his life to bring this great work to completion.'[৯৪]

পঞ্চম অধ্যায়েও আলোচনা পঞ্চদশ শতাব্দীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এই অধ্যায়ে কৃত্তিবাস সম্পর্কিত আলোচনায় গ্রন্থকার প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন -

‘Krittibas's date is very uncertain; but it is probable that he produced his Bengali version of the Ramayana probably about the close of the same century.[৯৫]

পাশাপাশি একথাও গ্রন্থকার স্বীকার করেছেন যে,

‘Ramayana in fact is mainly the work of a single poet.’[৯৬]

উক্ত বক্তব্য থেকে একথা অনুমান করা যায় যে, রামায়ণকে একক কবির রচনা রূপে গণ্য করলেও, মহাভারতকে একক কবির রচনা রূপে সম্ভবত তিনি স্বীকার করেন নি।

কৃত্তিবাসের রচনা পুরোপুরি মূল অনুসারী নয়, বরং,

‘a new narration of the story of the ancient epic in his own way,’[৯৭] -এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বেশ কিছু উদাহরণও সন্নিবেশিত করেছেন।

‘The incidents of the war then follow generally in the same order as in Sanscrit. But Krittibas's account of the battles in his own, and he has introduced some new incidents and new warriors of which there is no mention in the Sanscrit. The account of Mahi-Ravana and Ahi Ravana and the childish episode of Hanuman carrying the solar orb under his arm find no mention in the Sanskrit epic.’[৯৮]

রামায়ণ প্রসঙ্গে আলোচনা হলে কমবেশি কথকতার প্রসঙ্গে আসেই। এই অধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পাঠান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা। ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দের একটি পুথির পাঠ এবং ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের ছাপা দুটি আলাদা পাঠকে পাঠ এবং উদ্ধৃত করে পাঠান্তর প্রক্রিয়ার যে নমুনা গ্রন্থকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য।[৯৯] এর দ্বারা একই বিষয়ের ওপর

একাধিক ঠিক-ভুল পাঠের হদিশ মেলে। একই সঙ্গে রচয়িতা - প্রকাশনা - সময়ও তার নিজের পরিচয় নিয়ে উঠে আসে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল আলোচনার বিষয় চৈতন্য, তাঁর ধর্মীয় ভাবনা, -মোটামুটি ভাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং এই সমস্তটাই ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চৈতন্য জীবনী আলোচনার উৎস নির্দেশ স্বরূপ নির্দিষ্ট কোন জীবনী গ্রন্থের পরিচয় নেই। সপ্তম অধ্যায়েও একই সময়কালের আলোচনায় একেবারে সংক্ষেপে চৈতন্যের মুষ্টিমেয় কিছু অনুগামী এবং তাঁদের রচনার উল্লেখ রয়েছে। একই সময়ের আলোচনায় অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে রঘুনাথ, রঘুনন্দন, তাঁদের দার্শনিকতার, বেদ-স্মৃতি ইত্যাদি চর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। সরাসরি সাহিত্যের সাথে এর যোগ না থাকলেও সমসময়ের অন্যান্য বিষয়ে চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এই লেখাগুলি থেকে পাওয়া যায়। রঘুনন্দন সম্পর্কে গ্রন্থকারের মতামত -

'While Chaitanya devoted himself to religious reform, while Raghunath spent his life in philosophical and logical studies, Raghunandan made his mark by an authoritative and exhaustive compilation of the rules of orthodox rites and observances for the people of Bengal. He divided this great work into twenty-eight chapters, each devoted to a separate subject, and he based his rules on a profusion of quotations from the highest authorities, He laboured for twenty - five years over this great work, and it remains a monument not only of his industry and learning, but also of his comprehensive genius.'[১০০]

দশম অধ্যায়ে সপ্তদশ শতকের মূল আলোচ্য বিষয় মুকুন্দরাম এবং তাঁর চন্ডী। গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ, কালকেতু-শ্রীমন্তর কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করবার পর পরিশেষে গ্রন্থকারের পর্যবেক্ষণ -

'Mukunda Ram never paints characters with super human virtues or vices.'[১০১]

'he hits off in a few lines a character, clear and distinguishable from all others. Kalketu is a boorish, strong, brave and simple - minded hunter, Fullara a poor dutiful wife, Murari Sil an astute shop-keeper, Bharu Datta an ease - loving, easy-going, elderly, well -to-do trader, Lahana and Khullana are rival wives, with all the faults and angry passions of rival wives, and Durbala is a scheming old servent, with all the mischievousness and self - importance of old servants in Hindu households.

pathos is a strong point in Mukunda Ram's writings. A sufferer himself, he has a ready sympathy for all sufferers; and poor Fullara and poor Khullana are not ordinary sufferers. Mukunda Ram's language is flowing, perspicuous and musical, and a quiet humour pervades his poetry.'[১০২]

একাদশ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় রামপ্রসাদ এবং তাঁর গীতসমূহ। রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পদের এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে। কালী বা শক্তি সম্পর্কে এবং তাঁর সাথে রামপ্রসাদের ভক্তি প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য -

'He was a Tantrika a devout worshipper of kali, and he was careless of this world, and lived in hir faith in Kali. Kali or Sakti, Durga or Chandi, is not an unapproachable deity; she is the ideal of a Hindu mother, tender and loving beyond expression, ministering to every want and helpful in every difficulty.'[১০৩]

রামপ্রসাদের গীতসমূহের সরলতা এবং মিষ্টতাই প্রধান সৌন্দর্য, যে সৌন্দর্য যুগে যুগে আকৃষ্ট করে আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলকে। যদিও লেখকের অনুমান যে রামপ্রসাদের শাক্তগীতি গুলি কেবল একশ্রেণির পথের ভিক্ষুকদের মধ্যে প্রচারিত ও জনপ্রিয় ছিল।[১০৪] যদিও এই অনুমানের পেছনে উপযুক্ত কোন কারণ নেই, এবং এই অনুমান একেবারেই যথার্থ নয়। 'বিদ্যাসুন্দর' প্রসঙ্গে গ্রন্থকার রীতিমতো হতাশা প্রকাশ করেছেন।[১০৫] রামপ্রসাদের ভক্তিগীতি সম্পর্কে পরিশেষে লেখকের পর্যবেক্ষণ -

'One great Charm of his poetry consists in the simple homely, similes always drawn from familiar objects of lowly village life. The cultivated rice-field, the ferry boat, the village market, the oil -mill, such are the objects of his similes round which he entwines his feeling songs with the most touching effect.'[১০৬]

দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচিত ভারতচন্দ্র রায়। লক্ষণীয় বিষয় হল, রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র, কারও সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে অগ্রজদের উল্লেখ নেই, বিশেষ করে ঈশ্বরগুপ্তের। অন্নদামঙ্গলের আলোচনায় লেখক বলছেন -

'.....the readers of Annada Mangal know that in describing the double conversion of Vyasa, who first

became a Vaishnava and then a Sakta or Saiva, the poet has partly explained and partly apologized for his own conduct.'[১০৭]

'অন্নদামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' -এর দীর্ঘ আলোচনার তুলনায় বেশি প্রাধান্য পেয়েছে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা। এমন আলোচনা সমকালে যে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল, লেখক ও পাঠক উভয়ের কাছেই, সে কথা এই সময়ের লেখার চরিত্র দেখে অনুমান করা যায়।

'Bharat Chandra with all his gifts is but an imitator of Mukunda Ram, and we confess that Bharat Chandra's artificial and polished strains strike us as lifeless, when compared with the simple and faithful pistures from nature, with which Mukunda Ram's work are replete. Mukunda Ram draws from nature, Bharat Chandra daubs his pictures with gorgeous colours, Bharat Chandra is the more polished and artificial poet, Mukunda Ram is the Truer painter and the greater poet.'[১০৮]

'Fullara and Khullana are women of flesh and blood with distinct characters; in Bidya we can discover no trait of characters except a capacity for voluptuous love. Durbala and Bharu Datta are powerfully drawn pourtraits from life; Hira Malini is an over -drawn caricature. And in all the higher qualifications of a poet, in truth in imagination, and even in true tenderness and pathos, such as we meet with

in almost every other Bengali poet Bharat Chandra is singularly and sadly wanting.'[১০৯]

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' প্রকাশিত হয়। এর আগে পর্যন্ত 'ভাষা ও সাহিত্যে'র ইতিহাসের যে লিখিত রূপ আমরা পেয়েছি তার গঠন অবশ্যই এর চেয়ে আলাদা। এই 'বক্তৃতা'-য় সাধু গদ্যে, সরল বাক্যবন্ধের মধ্যে দিয়ে বক্তা তৎকালীন সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরি করেছেন। বক্তৃতাটি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এর জন্মলগ্ন সম্পর্কে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন অংশে লেখক জানিয়েছেন -

'কয়েক বৎসর হইল আমি জাতীয় সভায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উপস্থিত মতে বক্তৃতা করি; সে বক্তৃতা করিবার সময় তাহা কাহারও দ্বারা আনুপূর্ব্বিক লিখিত না হওয়াতে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, কেবল তাহার সারমর্ম্ম 'ন্যাশনাল পেপর' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৭৯৮ শকের ১৯ এ বৈশাখ দিবসে মেদিনীপুরে ঐ বিষয়ে উপস্থিতমতে এক বক্তৃতা করি, তাহা লিখিত হইয়া ঐ বৎসরের ৪ঠা অগ্রহায়ণ দিবসে কলিকাতার বঙ্গভাষা সমালোচনী সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। সে অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা এক্ষণে সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। 'ভারত সংস্কারক' সম্বাদপত্রে এই বক্তৃতার যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সংশোধনকালে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।'[১১০]

ঐ একই বিজ্ঞাপন অংশে লেখক বক্তৃতার জন্য অন্যান্য বিভিন্ন বইয়ের সাথে যে দুটি বইয়ের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ তার নামও জানিয়েছেন বইদুটি হল -

পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ ও লংসাহেবের সঙ্কলিত ‘Descriptive Catalogue of Bengalee Books’[১১১] বলাবাহুল্য, এই কৃতজ্ঞতাবোধের সাথে মিশেছে বক্তার নিজস্ব জীবনদর্শনও।[১১২]

বক্তৃতার একেবারে শুরুতেই বক্তা খুব সংক্ষেপে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কীভাবে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত থেকে হয়েছে, আমাদের তা জানিয়েছেন। এর পরই তিনি প্রবেশ করেছেন সাহিত্য জগতে। বাংলা সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রাজনারায়ণ বসু শুরু করেছেন বিদ্যাপতি থেকে। বিদ্যাপতি সম্পর্কে সমসময়ে অন্যতম যে দুটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল তা হল প্রথমত - রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমা দেবীর সাথে বিদ্যাপতির প্রণয়, দ্বিতীয়ত -অন্তিমকালে তাঁর গঙ্গা স্মরণ ও গঙ্গার আগমন।[১১৩] মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত এই সমস্ত গল্প কাহিনির সাথে প্রকৃত কাহিনির কিছু পার্থক্য অবশ্যই ছিল, কিন্তু তৎকালে বিদ্যাপতির গুণমুগ্ধ পাঠকেরা এইসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন, বরং, হৃদয়াবেগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে প্রচলিত কাহিনির যে কোন একটিকে তাঁরা নিজ বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করতেন।

‘বিদ্যাপতি যেরূপ সাধক ছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত গর্হিত প্রণয়ের গল্প তাঁহার জীবনের সহিত সঙ্গত হয় না।’[১১৪]

বিদ্যাপতি ঠিক কোন ভাষায় কবিতা রচনা করেছিলেন এ সম্পর্কে সমকালীন সমাজে বেশ কিছু অনুমান প্রচলিত ছিল, এবং এই অনুমান পাঠকদের নিজস্ব যুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে বক্তার নিজস্ব যুক্তি এই রকম।

‘মিথিলা পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে পরিগণিত ও অনেকদিন অবধি সেনবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তথায় বঙ্গরাজ লক্ষ্মণসেনের অব্দ এখনও প্রচলিত আছে। এই সকল কারণ বশতঃ মিথিলা প্রদেশের লোকদিগের সহিত বঙ্গদেশের লোকদিগের বিলক্ষণ সখ্যভাব ছিল ও এই সখ্যভাব নিবন্ধন বঙ্গদেশের লোকেরা মিথিলার লোকদিগের নিকট হইতে অনেক মানসিক উপকার লাভ করিতে সমর্থ

হইয়াছিল। কথিত আছে যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রথমে মিথিলাপ্রদেশে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপে তাহা প্রচার করেন। আমাদিগের ব্রাহ্মণ পন্ডিতদিগের মধ্যে যে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত আছে, তাহা ত্রিহুতী ছাঁদের অক্ষর। মিথিলার সঙ্গে যখন বঙ্গদেশের এতদ্রূপ নিকট সম্বন্ধ ছিল, তখন ইহা অসম্ভব নহে যে, বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে এবং কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়াছিলেন।'[১১৫]

বক্তৃতার শুরুতে বক্তা জানিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর প্রয়োজন অনুসারে কোন কোন কবির দু-একটি অপ্রচলিত কবিতা পাঠ করবেন।[১১৬] সেই মত তিনি বিদ্যাপতির 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয় .....' এবং 'তাতল সৈকত, বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণীসমাজে .....'[১১৭] কবিতা দুটি পাঠ করেছেন।

বিদ্যাপতির পরেই অবধারিত ভাবে এসেছে চন্ডীদাস প্রসঙ্গ। কিন্তু বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে বক্তা যত কথা বলেছেন, চন্ডীদাস সম্পর্কে শব্দব্যয় সেখানে খুবই সামান্য। কেবলমাত্র কবির জন্মস্থান ও বিদ্যাপতি চন্ডীদাসের কাল্পনিক মিলন, এবং এ সম্পর্কে রূপনারায়ণ -এর একটি পদবর্ণনা করে বক্তা চন্ডীদাস প্রসঙ্গ শেষ করেছেন। বিদ্যাপতি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর যে ব্যক্তিগত পক্ষপাত ছিল তা এর থেকে বোঝা যায়। তবে এখানেই শেষ নয়, এমন নিদর্শন আমরা এর পরেও দেখব।

উক্ত দুই কবির পরেই এসেছেন চৈতন্যদেব। বক্তা জানিয়েছেন-

'চৈতন্যের শিষ্যেরা বাঙ্গালা ভাষার বিস্তর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।'[১১৮]

কিন্তু একথা বলবার পরেও সেই উন্নতির দু' একটি নমুনা তিনি আমাদের শোনান নি। বরং সংক্ষিপ্ত চৈতন্য জীবনী, চৈতন্যকেন্দ্রিক 'ধর্ম্ম' গ্রন্থ এবং গ্রন্থকর্তাদের নামোল্লেখ, পরিশেষে গোবিন্দদাসের একটি পদবর্ণনা করে তিনি বৈষ্ণবপদাবলি প্রসঙ্গ সমাপ্ত করেছেন। (উক্ত 'ধর্ম্ম' প্রসঙ্গে অন্যত্র আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।) সাহিত্যের রূপরেখা বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে চন্ডীদাস, চৈতন্যদেব এবং পরবর্তী গ্রন্থাবলি, গ্রন্থকার ও পদাবলি প্রসঙ্গ কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দের মধ্যে দিয়ে উল্লেখ

করে বক্তা কেবল নিজের বক্তব্যকেই সংক্ষিপ্ত করেছেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নিজের মমত্ব প্রকাশ করতে পারেন নি।

বৈষ্ণব প্রসঙ্গ শেষ করে বক্তা জানিয়েছেন -

'এক্ষণে আমরা কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের কালে আগমন করিতেছি।'[১১৯]

বক্তা উক্ত কবিদেরই এক একজনকে একটি নির্দিষ্ট 'কাল' বা 'সময়' রূপে বিবেচনা করেছেন; কিন্তু নিজের বক্তব্যের সুবিধার জন্য ক্ষেমানন্দের কথা আগে বলেছেন। অর্থাৎ বক্তব্যের সুবিধার্থে সাহিত্যের প্রবহমান ধারার ক্রম পরিবর্তন করেছেন। মৌখিক রূপে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্যই এমনটা সম্ভব হয়েছে, লিখিত আকারে পরিবেশিত হলে তা সম্ভব ছিল না। ক্ষেমানন্দ প্রসঙ্গে এক লাইনে বক্তা জানিয়েছেন -

'.....ইতর লোকদিগের মনোমোহনকারী প্রসিদ্ধ 'মনসার ভাসন' রচনা করেন।'[১২০]

বক্তার নিজস্ব পক্ষপাত নির্দিষ্ট কোন কবি বা কাব্যের প্রতি থাকতেই পারে। কিন্তু যেখানে তা নেই, সেখানে তাকে কেবল 'ইতর লোকদিগের মনোমোহনকারী' নামে আখ্যায়িত করবার মধ্যে আর যাই থাকুক, যুক্তি ও শালীনতার বোধ যে নেই তা স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি দ্বিজবংশী ও নারায়ণ দেবের নামোল্লেখও করেছেন।

কবিকঙ্কণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বক্তার মুকুন্দরাম সম্পর্কিত চিন্তা বক্তব্যের অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে। এই কবি সম্পর্কে বক্তার নিজস্ব ভালোবাসা ও ভালোলাগা তাঁর প্রতিটি শব্দের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট।

'কবিকঙ্কণ নিঃসংশয়রূপে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। কি মানবস্বভাব পরিজ্ঞান, কি বাহ্য-জগদ্বর্ণনা নৈপুণ্য, কি করুণারসের উদ্দীপনাশক্তি, কি সুকল্পনা, সকল বিষয়েই তিনি অদ্বিতীয়। যদি তাঁহার মানবস্বভাব-পরিজ্ঞানের বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে যে স্থলে অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর

গমন বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। .....প্রতিভা বিষয়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। ভারতচন্দ্র তাঁহাকে অনেক স্থলে অনুকরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অনেক স্থানের ভাব পার্সি ও সংস্কৃত হইতে নীত। .....কবিকঙ্কণের দুইটি মনোহর লক্ষণ আছে। সে দুইটি, মনোহর লক্ষণ এই যে, তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্র জীবন যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কোন কবি সেরূপ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার আদিরস বর্ণনাতে কিছুমাত্র অশ্লীলতা নাই। ''দরিদ্রের কবি'' এই গৌরবাস্পদ উপাধি যেমন তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তেমন অন্য কোন কবি প্রাপ্ত হইতে পারেন না।'[১২১]

কৃত্তিবাস ও কাশীরামের জন্মস্থান পরিচিতির মধ্যে দিয়েই এই কবিদ্বয়ের পরিচয় সমাপ্ত। কাব্য গুলি সম্পর্কে আলাদা কোন বিশ্লেষণ নেই, তবে জনমানসে এর প্রভাব সম্পর্কে দু'-চার কথা বক্তা বলেছেন। রামেশ্বরের 'শিবায়ন', ও 'সত্যনারায়ণের পুথি' বক্তার নিশ্চয়ই বিশেষ পছন্দের ছিল, সেই কারণে এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য কিছুটা দীর্ঘায়িত ও একটু বিশ্লেষণী রূপ নিয়েছে।

'রামেশ্বরের ভাষা তত প্রাঞ্জল ও মধুর নহে; তথাপি স্থানে স্থানে তিনি মানবস্বভাব - বর্ণনে এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে এরূপ প্রকৃত কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, তাঁহাকে নিতান্ত সামান্য কবি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।'[১২২]

রামপ্রসাদ সম্পর্কে বক্তা জানিয়েছেন -

'যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাতভিখারীদিগের মুখে তাঁহার রচিত গান শ্রবণ করা যায়, তখন চিত্তের অত্যন্ত ঔদাস্য জন্মে[১২৩] .....।'

রাজনারায়ণ বসুর সম্ভবত জানা ছিল না যে সমসময়ে শহরাঞ্চলের কিছু অভিজাত পরিবারেও রামপ্রসাদের স্বরচিত গীতগুলি অত্যন্ত সম্মানের সাথে স্মরণ করা হত।

রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট অন্যতম কবি ভারতচন্দ্র। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের রচনার প্রধান তিনটি লক্ষণ সম্পর্কে বক্তা জানান -

'প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা এরূপ চাঁচাছোলা মাজাঘষা যে, বঙ্গদেশের অন্য কোন কবির ভাষা সেরূপ মসৃণ ও সু-চিক্কণ নহে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সংক্ষেপে এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন যে, অন্য কোন কবি সেরূপ পারেন না .....। তৃতীয়তঃ তাঁহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনগণ মধ্যে এত প্রচলিত যে, তাহা গৃহবাক্য হইয়া উঠিয়াছে .....।'[১২৪]

এই সমস্ত লক্ষণ সত্ত্বেও বক্তা ভারতচন্দ্রকে মুকুন্দরামের ছায়ারূপেই দেখেছেন মাত্র। পরিশেষে ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল গান' -এর উল্লেখ করে বক্তা পদ্যে রচিত বাংলা কাব্য সাহিত্যের বক্তব্যে ইতি টেনেছেন।

রাজনারায়ণ বসুর এই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে বাংলার পদ্যে রচিত প্রাচীন সাহিত্যের এক সংক্ষিপ্ত আলেখ্য পাওয়া যায়। এর সঙ্গে এসে মিশেছে বক্তার ব্যক্তিগত ভালোলাগা, ভালো না লাগা। আমাদের ধারণা অনুযায়ী তথাকথিত 'মধ্যযুগ' নির্মাণের সচেতন কোন প্রয়াস এই বক্তব্যে পরিলক্ষিত না হলেও কৃত্তিবাস - কবিকঙ্কণ প্রসঙ্গে 'কাল' শব্দটির উল্লেখে বক্তার প্রাক্‌চেতনে কোথাও রামগতি ন্যায়রত্নের 'কালবিভাজন' প্রসঙ্গটির আবছায়া লক্ষণীয়।

বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা

রাজনারায়ণ বসুর পরে গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' গ্রন্থের উল্লেখ আমরা পাই। রচনাটি ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র সাবিত্রী লাইব্রেরিতে পড়া হয়েছিল।[১২৫]

বাঙ্গালা সাহিত্য

কলিকাতার আর্য্যবন্ধু প্রেস থেকে ১২৯২ বঙ্গাব্দে কৈলাসচন্দ্র ঘোষের 'বাঙ্গালা সাহিত্য' - রচনাটি প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি লেখক উৎসর্গ করেছেন তাঁর বন্ধু তারকনাথ বিশ্বাসকে।[১২৬] গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তি বা বিষয়কে প্রাধান্য দেন নি। গ্রন্থের নামকে কেন্দ্র করেই তাঁর বক্তব্য অগ্রসর হয়েছে। অর্থাৎ যুগ বিভাজন বা ব্যক্তিনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ আলোচনার পথে তিনি যান নি। বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য মূলত 'গীতগোবিন্দ' থেকে শুরু করে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা, 'আলালের ঘরের দুলাল' পর্যন্ত ইতিহাস ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা গ্রন্থকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে কথা বলতে হলে অবধারিত ভাবে এসে পড়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কথা। সংস্কৃত থেকে সৃষ্ট হয়ে, প্রাকৃতের দ্বারা বিবর্তিত হয়ে, যে, বাংলা ভাষা আজ এই রূপলাভ করেছে একথা দীর্ঘদিন ধরেই অনেকে বলে চলেছেন। কৈলাসচন্দ্র ঘোষও তার ব্যতিক্রম নন। এবং তাঁর মতে -

'জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালার কুমারী বা প্রথমাবস্থা; সুতরাং তখন উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।'[১২৭]

পাশাপাশি একথাও ঠিক যে জয়দেবের সময়ে বাংলার রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির অবস্থা টলায়মান।

'যাঁহারা পৃথিবীতে সুখ নাই বলিয়া পারলৌকীক সুখান্বেষণের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, লোকে রমণীর বিভ্রম বিলাস ভঙ্গীকেই সুখের নিদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ের সমাজ অলস ও ইন্দ্রিয়পরতার দাস; সেই জন্যই দেখিতে পাই ইহার কিছুদিন পরেই বক্তিয়ার খিলিজী সপ্তদশ মাত্র অনুচর লইয়া অবাধে বঙ্গরাজ্য স্বীয়করতলস্থ করিল; গীত - গোবিন্দ সেই ইন্দ্রিয়পর - নিচেষ্ট সমাজের ফল।'[১২৮]

গ্রন্থকার তাঁর ব্যক্তিগত নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরলোকের দার্শনিক প্রত্যয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। ফলে গীতগোবিন্দের আদিরসের উল্লাস তাঁর পছন্দ হয় নি।

জয়দেবের পরেই এসেছে কবি বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ। গ্রন্থকার তাঁর নিজস্ব যুক্তিবোধের দ্বারা বিদ্যাপতিকে মৈথিলি কবি রূপে স্বীকার করেন নি। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি গুলি নিম্নরূপ -

প্রথমত ঃ- যদি বিদ্যাপতি প্রকৃতই মিথিলাবাসী হন, তাহলে বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকার থাকা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ- বিদ্যাপতির আগে কোন বাঙালি লেখক ছিলেন না, সুতরাং বিদেশে থেকে তাঁর পক্ষে বাংলা ভাষা শেখা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত ঃ- যে বাংলাদেশের নামও খুব বেশি লোকে জানত না, সেই দেশের ভাষা শেখবার জন্য বিদ্যাপতি কষ্ট করবেন কেন ?

চতুর্থত ঃ- বিদ্যাপতি বঙ্গবাসী হয়ে বিদ্যাচর্চার জন্য মিথিলা গিয়েছিলেন ফলে সংস্কৃত, বাংলা এবং মৈথিল, - এই তিন ভাষাতেই তাঁর অধিকার লাভ সম্ভব।[১২৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতিকে নিয়ে এত আলোচনার মূলে রয়েছে বিদ্যাপতির প্রতি অমোঘ টান। সেই টানের বশেই ব্যক্তিগত আবেগও কখন কখন যুক্তির চেহারায় হাজির হয়ে তাঁকে বঙ্গের বাইরের কবি রূপে স্বীকার করতে চায় নি। বিদ্যাপতি বাংলার হোক বা না হোক, একজন পাঠক রূপে তিনি আমার চির আদৃত - জাতীয়তাবাদী চেতনায় আচ্ছন্ন তৎকালীন বাঙালিরা একথা সাহস করে বলতে পারে নি।

বিদ্যাপতির প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতের দরুন চন্ডীদাস খুব বেশি আলোচিত হন নি। উভয়কেই মোটামুটি ভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ সময়ে গ্রন্থকার ঠাঁই দিয়েছেন। বিদ্যাপতি প্রসঙ্গ আলোচনায় গ্রন্থকারের লেখনীতে বারবারই এসেছে জাতীয় জীবনের প্রসঙ্গ। কেবল বিদ্যাপতিই নয়, তাঁর সমগ্র রচনাতেই ছড়িয়ে রয়েছে জাতীয় ইতিহাস, জাতির দিশা, চেতনার কথা।

‘বিদ্যাপতি যে জাতীয় জীবনের গতির প্রথম শিখা, তাহারই চরম ফল চৈতন্যদেব। ..... চৈতন্যদেব যে বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইবেন তাহা বলিবার অগ্রগামী দূত বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস;’[১৩০]

লেখকের এই বক্তব্যের সাথে আমরা একেবারেই একমত নই। কারণ বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস কবি ছিলেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বা ভবিষ্যৎ বক্তা ছিলেন না। চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করবেন একথা তাঁদের পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন ‘বঙ্গভাষা সপ্তম শতাব্দী হইতে অল্পে অল্পে বিকসিত হইয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিকসিত হইয়াছে।’[১৩১]

দ্বাদশ শতাব্দীতে বিকশিত ভাষার নিদর্শন স্বরূপ গীত গোবিন্দকে গ্রন্থকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর কোন নিদর্শনই তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন নি। সেক্ষেত্রে লেখকের উক্ত বক্তব্যকে প্রামাণিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। নির্দিষ্ট করে সাহিত্যের রূপরেখায় ব্যক্তি বা বিষয় বা ইত্যাদিকে প্রধান্য না দিলেও কৈলাসচন্দ্র ঘোষের লেখায় রয়েছে এ প্রসঙ্গে সামান্য ইঙ্গিত -

‘বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের পর চৈতন্য দেবের কাল।’[১৩২]

উক্ত বক্তব্যের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি এবং সময় উভয়ই সামান্য ভাবে হলেও লেখকের প্রাধান্যের তালিকাভুক্ত ছিল।

উক্ত কবিদ্বয়ের পরেই এসেছেন চৈতন্যদেব, চরিতসাহিত্য, পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, জাতীয় ব্যক্তিত্ব বা জাতীয় সাহিত্যের বিষয়টি গ্রন্থকারের স্মরণে থাকায় প্রকৃত সাহিত্যের আলোচনা বা ব্যাখ্যা সেভাবে কিছুই ঘটে নি, বরং যেখানে গ্রন্থকার সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই ধর্মীয় ভাবকে কেন্দ্র করে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছেন।

‘পরলোক ভীতি লোকের মনে বরাবর সমান প্রবল; সমাজের এইরূপ অবস্থাতেই তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়া আপনার ক্রীড়া দেখাইয়াছিল; কিন্তু

তান্ত্রিকোপাসনার অত্যাচার অধিক দিন সমাজে স্থায়ী হয় নাই; মহম্মদীয় ধর্ম্মের একেশ্বর বাদের নিকট পৌত্তলিকতা তিষ্ঠিতে পারিল না; লোকের চিত্ত টল টলায়মান; সুতরাং এই সময়ের বিশৃঙ্খল সমাজ সুশৃঙ্খলে আনিবার জন্য গৌরাঙ্গ অবতার প্রয়োজনীয় হইল।'[১৩৩]

গৌরাঙ্গের আগমনকে কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেখলে সমসময়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আর ও অনেক বেশি জানা যেত।

প্রায় সমসাময়িক ধরে নিয়ে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও কৃত্তিবাস ওঝাকে গ্রন্থকার একই সময়ভুক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁদের লেখায় বীর-রসের উপাদান খুঁজে না পেয়ে উভয়ের রচনাকেই গ্রন্থকার 'প্রকৃত মহাকাব্য'[১৩৪] রূপে বিবেচিত করেন নি।

'তাঁহারা যেখানে বীর রসের অবতারণা করিতে গিয়াছেন সেই স্থানেই কেবল কতকগুলি শব্দের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র সে বর্ণনা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় না - নিশ্বাসে অগ্নিকণা বহির্গত হয় না - হৃদয় স্তব্ধীভূত হয় না - মনে কোন ভাবেরই উদয় হয় না;'[১৩৫]

এখন ভেবে দেখবার বিষয় হল যে কবিকঙ্কণ বা কৃত্তিবাস এমন কোন মুচলেকা কোথাও দেন নি যে তাঁদের রচনায় বীর রসের উজ্জীবন ঘটবেই বা তাঁদের রচনা মহাকাব্য হয়ে উঠবেই। পাঠক ভেদে প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত করে নির্দিষ্ট রচনার ভাল-মন্দ বিষয় গুলি তুলে ধরেন। সেক্ষেত্রে জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য কেউ যদি নির্দিষ্ট রচনা গুলিতে বীর-রস অন্বেষণ করতে চান, সময়ের দাবি অনুসারে করতেই পারেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছের সাথে রচয়িতার দায়বদ্ধতা বা ভাবনা চিন্তাকে মিশিয়ে ফেলা একেবারেই ঠিক নয়।

মূল বাল্মীকির রামায়ণ থেকে কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেছেন - এই কৃতিত্ব গ্রন্থকার কৃত্তিবাসকে দেন নি। বরং কৃত্তিবাস যে কথকতা শুনে রামায়ণ

রচনা করেছিলেন,[১৩৬] এই বিশ্বাসেই তিনি স্থিতধী রয়েছেন। এবং এর মধ্যমেই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীও যদি কৃত্তিবাসের সময়কাল রূপে ধরে নাওয়া যায়, তাহলে তারও আগে কথকতায় সৃষ্টি। পাশাপাশি কৈলাসচন্দ্র ঘোষ গোবিন্দদাসের লেখায় বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের গদ্যের নিদর্শন পেয়ে নিশ্চিত রূপে জানিয়েছেন যে -

'মধ্য সময়ে কথকগণই কেবল গদ্য রীতির উপাসক ছিলেন; তাঁহাদের সময় হইতেই গদ্য রচনার আলোচনা আর বন্ধ হয় নাই,'[১৩৭]

লক্ষণীয় 'মধ্য সময়' শব্দবন্ধটি। সময়কাল গ্রন্থকার নির্দিষ্ট করেন নি, তবে বিদ্যাপতি -চন্ডীদাসের প্রায় সমসাময়িক বা পরবর্তী সময় থেকেই এর সূচনা।

'বাঙ্গালা সাহিত্যে' চন্ডীদেবী বা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে নিজের যে দৃষ্টিভঙ্গি লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা পুরোপুরি হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত। এই দৃষ্টিকোণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের হাত ধরে আমদানি করা, এবং কেবল কৈলাসচন্দ্র ঘোষই নন, তৎকালীন সময়ের অনেক বুদ্ধিজীবীই এই আমদানিকৃত বিষয়টিকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

'ক্ষমতা নাই - সাহস নাই; কিরূপে বঙ্গবাসী এই দুস্তর দুঃখ সাগর হইতে পার হইতে পারেন; এমন বিপৎকালে বঙ্গবাসীর চির-সেবিত দেবতা ভিন্ন আর কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন? সকল দেবতা নহেন; যিনি এক সময়ে দুর্দ্দান্ত অসুর নিচয় বিনাশ করিয়া পৃথিবী পিশাচ শূন্য করিয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন হিন্দু সন্তানের এ দুঃসময়ে আর উপায়ান্তর কি? তিনি যদি এই হিন্দুরক্ত -লোলুপ অসুর প্রকৃতিক যবনগণকে বিনাশ করিয়া সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী গণকে রক্ষা না করেন, তবে আর কে তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন? তাই সেই অসুর-ঘাতিনী -মহিষ মর্দ্দিনীর অর্চ্চনা প্রয়োজন;'[১৩৮]

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় কৈলাসচন্দ্র ঘোষ কবি বা কাব্যের নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করেন নি। অর্থাৎ প্রথমে বৈষ্ণব কবিদের আলোচনা, আরও পরে কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাসের আলোচনায় আরও একবার বিদ্যাপতি-চন্ডীদাস আলোচিত। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আলোচনার মাঝেই একবার ছোট করে কৃত্তিবাস আলোচিত।

'আমরা এক্ষণে যে মুদ্রিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার নিজের ভাষা নহে; পন্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসের ভাষার এইরূপ বিকৃতি সাধন করিয়াছেন; তিনি কতিপয় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণের পরামর্শে কৃত্তিবাসের ভাষা সংশোধন করিয়া আধুনিক ভাষার মত করেন;'[১৩৯]

কবিকঙ্কনের পর 'কাশীরাম দাসের কাল'।[১৪০] লেখক ও তাঁর সময়কে একত্রে প্রাধান্য দিয়েই ধারাবাহিক ভাবে 'বাঙ্গালা সাহিত্য' আলোচিত। কাশীরাম দাস এবং তাঁর আনুমানিক সময় গ্রন্থকার নির্দিষ্ট করেছেন ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ।[১৪১] মহাভারতের বিশাল অনুবাদ প্রসঙ্গে কাশীরাম দাসকে অনুবাদকের একক কৃতিত্ব অনেকেই দিতে চান নি। কিন্তু গ্রন্থকার এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেন নি।

'মহাভারতের শেষ পর্য্যন্ত প্রতি কবিতারই শেষ ভাগে কাশীরাম দাসেরই ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়; নন্দরামের নাম কুত্রাপিও দেখা যায় না; যদি ইনি মহাভারতের প্রায় পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ ভাগ অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম কোন না কোন স্থানে সন্নিবেশিত থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার নাম দেখি নাই; আবার মহাভারতের প্রথম তিন পর্ব্বের অনুবাদের সহিত, অন্যান্য পর্ব্বের অনুবাদে কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। ইহার সর্ব্বস্থলই সমান লালিত্যময়ী ও সমান তেজস্বিনী;'[১৪২]

সংক্ষেপে ঘনরাম ও রূপরাম চক্রবর্তীর 'শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল'-এর উল্লেখের পর আবির্ভূত হয়েছেন ভারতচন্দ্র, তাঁর সম্পর্কে গ্রন্থকার জানিয়েছেন -

'ভারতচন্দ্রই ইদানীন্তন কালের প্রথম কবি;'[১৪৩]

লক্ষণীয় ‘ইদানীন্তন কাল’ শব্দবন্ধটি। এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থে। সেখানে ভারতচন্দ্রকে তিনি ইদানীন্তন কাল ভুক্তই করেছিলেন। কিন্তু ঋণ স্বীকারে এই বইটির উল্লেখ কৈলাসচন্দ্র ঘোষ করেন নি, এমন কী পাদটীকাতেও না। এই সময়ে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ -এর তুলনায় বেশি পঠিত ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য। ‘ইদানীন্তন কাল’ শব্দটির ব্যবহার থেকে এ বিষয় স্পষ্ট যে গ্রন্থকার রামগতি ন্যায়রত্নের বইটি পড়েছিলেন। বইটি পড়ে তিনি একথাও নিশ্চয় জেনেছিলেন যে ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যটি শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করে অশ্লীলতার পর্যায়ভুক্ত হযেছে। তার পরেও সেই সাবধান বাণীকে উপেক্ষা করে কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ‘বিদ্যাসুন্দর’ পড়ছেন এবং একই কথা বলছেন যে ‘বিদ্যাসুন্দর’ অশ্লীল। মূল বিষয় হল এই যে, কেবল কৈলাসচন্দ্রই নন, এই সময়ের আরও অনেকের লেখায় এই একই বিষয়ের অবতারণা একই ভাবে ঘটেছে। এখন প্রশ্ন হল, অগ্রজদের সাবধান বাণী জানা সত্ত্বেও নতুন করে বিদ্যাসুন্দর পাঠের কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? উত্তর -হ্যাঁ, ছিল। ঊনবিংশ -বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী বাঙালিরা বিদ্যাসুন্দরে মজেছিলেন। কিন্তু সর্বসমক্ষে একথা স্বীকার করবার সাহস দেখতে পারেন নি। কেবল মজেছিলেন বললেও কম বলা হয়, মজেছিলেন, এবং উপভোগও করেছিলেন। উপভোগ করতে চেয়েছেন বলেই অগ্রজদের সাবধান বাণী উপেক্ষা করেছেন, অথবা অগ্রজদের সাবধান বাণীর সত্যতা যাচাই করবার জন্য ও বিদ্যাসুন্দর পড়েছেন এবং উপভোগ করেছেন। কিন্তু সেই উপভোগের প্রকৃত বহিঃপ্রকাশে বাধা ছিল বলেই ক্রমাগত একের পর একজন তাকে অশ্লীলতার পর্যায়ভুক্ত করেছেন। ঊনবিংশ -বিংশ শতাব্দীর এ এক অদ্ভুত আত্ম প্রতারণা।

কেবল ভারতচন্দ্রই নয়, সমসময়ের আরও অনেকের হাতে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়ন তৎকালীন সময়ের ও সমাজের অবক্ষয়ের প্রমাণ বহন করে। ‘বিদ্যাসুন্দর’ও ‘কালীকীর্ত্তন’ প্রসঙ্গে রামপ্রসাদও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। গ্রন্থকার শুরু

করেছিলেন ‘গীতগোবিন্দ’-র আলোচনা দিয়ে এবং কবিওয়ালাদের পূর্ববর্তী পর্যায়ে ভারতচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে সেই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

‘গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দর এক প্রকৃতির গ্রন্থ; গীতগোবিন্দ আলস্য নিচেষ্টতা ও গৃহসুখ নিরতির ফল; যখন সমাজ অতিশয় স্থবির, ইন্দ্রিয়পর ও অলস হইয়া পড়িয়াছে যখন ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করাই জীবের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে-গীতগোবিন্দ সেই সময়ে প্রণীত হয়। সমাজ তখন নিচেষ্ট-গতিহীন-ক্রিয়াহীন;’[১৪৪]

‘বাঙ্গালা সাহিত্য’ -নামকরণে ইতিহাসের কোন পরিচয় ছিল না, গ্রন্থকার শুরুতে ইতিহাস লিখবেন বা লিখতে চাইছেন এমন কোন বিষয় ও জানান নি। কিন্তু পরিশেষে তিনি জানিয়েছেন -

‘আমরা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া এতদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; ভাষার ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য’।[১৪৫]

ঊনবিংশ - বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রবণতায় কৈলাসচন্দ্র ঘোষের ‘বাঙ্গালা সাহিত্য’- নবতম সংযোজন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে (১৪ সেপ্টেম্বর)।[১৪৬] এর আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কেন্দ্রিক যে সমস্ত লেখাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার বর্ণনা কোথাও এতখানি তথ্যপূর্ণ, বিস্তৃত ও আবেগময় হয়নি। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের পরে বাংলার প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কিত অনেক নতুন তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে, এবং পরবর্তী সংস্করণ গুলিতে গ্রন্থকার তার প্রয়োজন মত উল্লেখ করে পূর্ব মতামত বদলও করেছেন। তবুও ১৮৯৬ -এর প্রথম প্রকাশের গুরুত্ব

আজও একই রকম রয়ে গেছে কারণ এইখানেই সম্ভবত সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যকে পড়বার ও বোঝবার এমন একটি মানদন্ড নির্দিষ্ট হচ্ছে যা সমসময়ে এবং আজকেও সমান বিতর্কিত। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এর পরে সাহিত্যের কাঠামো বিভাজন নিয়ে এত সুদীর্ঘ ভাবনা-চিন্তা এই প্রথম।

গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায় যথাক্রমে - 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি', 'সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা', এবং 'পাশ্চাত্য মত, - বিভক্তি চিহ্ন ও ছন্দ'। এই অধ্যায় বিভাজনের বিষয়ে গ্রন্থকার তাঁর পূর্বসূরী রামগতি ন্যায়রত্নের কাছে ঋণী এবং সেই ঋণস্বীকার তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের পাদটীকায় করেছেন। রামগতির লেখায় উক্ত বিষয় গুলি এতটা বিস্তৃতি পায়নি, যতটা এখানে রয়েছে।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর চতুর্থ অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত মূলত সাহিত্যের দীর্ঘ আলোচনা-বিশ্লেষণ রয়েছে। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়কে গ্রন্থকার 'বৌদ্ধযুগ' নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং এর সময়কাল মোটামুটি নির্ধারণ করেছেন ৮০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এমন আখ্যায় বিভাজিত করবার কারণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে তিনি কিছু বলেন নি। এই সময়কালকেই বর্তমান সাহিত্য চর্চায় আমরা 'প্রাচীনযুগ' রূপে চিহ্নিত করি এবং এযাবৎ যার একমাত্র প্রাপ্ত নিদর্শন 'চর্যাগীতি'। কিন্তু ১৮৯৬ সালে চর্যার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায় নি।

একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবলম্বন করে গ্রন্থকার এই চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন- 'বৌদ্ধযুগ'।[১৪৭] ঠিক কি কারণে গ্রন্থকার এমন নামকরণ বা বিভাজন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা স্পষ্ট করেন নি। বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে গ্রন্থকার সম্ভবত ব্যক্তিগত ভাবে অতিক্রম করতে পারেন নি এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁকে উপেক্ষা করবার প্রবণতাকে লক্ষ করে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সম্ভবত নামকরণে বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন। এই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার জানাচ্ছেন -

'বৌদ্ধ - যুগ অধ্যায়ে বঙ্গ - সাহিত্যের বিশেষ কিছু লিখিবার সামগ্রী নাই, তথাপি কিছু নিদর্শ আছে, সেগুলি আমরা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিনা'।[১৪৮] যে নিদর্শন গুলির উল্লেখ গ্রন্থকার করেছেন, তা হল -

(১) মাণিকচাঁদের গান এবং (২) ডাক ও খনার বচন[১৪৯]

মাণিকচাঁদের সময়কাল ও গানের যে অংশ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে গ্রীয়ারসন প্রকাশ করেন, তার সাথে গ্রন্থকার সহমত ছিলেন না বিশেষত সময়কাল সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে গ্রীয়ারসনের লেখাটি Journal Asiatic Society of Bengal - এ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে (Part - I, No. - 3, P. 149) প্রকাশিত হয়। এই গানটি তিনি রঙ্গপুর অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন। গানের শ্লোকসংখ্যা ছিল ৭৩৪।[১৫০] মাণিকচাঁদের গান সম্পর্কে বলতে গিয়ে গ্রন্থকার জানাচ্ছেন যে, -

'আমরা বাঙ্গালা যে সকল রচনা পাইয়াছি, তাহা হইতে ভাব ও ভাষায় ঐ গীতি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। সেই গীতির রচনা প্রণালী নানা কারণে আমাদের নিকট হিন্দু - ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হইয়াছে। এই জন্য আমরা মাণিকচাঁদকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক ছিলাম। চতুর্দ্দশ শতাব্দী কৃত্তিবাসের কাল, ঐ গীতি ও কৃত্তিবাসের গীতি কতদূর স্বতন্ত্র, উহারা যেন দুই ভিন্ন জগতের বস্তু! সুখের বিষয় ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারিলাম মাণিকচাঁদ খুব সম্ভব, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বেই রাজত্ব করিতেছিলেন'।[১৫১]

মাণিকচাঁদের সময়কাল সম্পর্কে এমন অনুমানের পেছনে গ্রন্থকার, ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহের সাহায্য নিয়েছেন। পাদটীকায় তার উল্লেখও রয়েছে।[১৫২] মাণিকচাঁদের গানকে হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী বলবার পেছনে একথা মোটেও স্পষ্ট নয় যে, ঠিক কোন সময় থেকে গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানের সময়কালকে নির্দিষ্ট করেছেন। হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান বলতে সম্ভবত এমনটাও হতে পারে যে, বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ববর্তী সাহিত্য রূপ হিসেবে

এই নিদর্শন গুলিকে গ্রন্থকার চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, যদিও হিন্দুধর্ম, সংস্কৃত ভাষা, তার প্রভাব এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন সম্ভবত বিষয়টি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন নি।

'মাণিকচাঁদের গীতের রূপ বর্ণনায় বৃদ্ধ ব্যাস বাল্মীকি কি কবি কালিদাসের কোন হাত নাই। সেগুলি সংস্কৃত - প্রভাব শূন্য; সুতরাং সংস্কৃতের প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।'[১৫৩]

মাণিকচাঁদের গানের এত বিবরণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এখানেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে।

ডাক ও খনার বচনের সময় কালকে গ্রন্থকার মাণিকচাঁদের গানেরও পূর্ববর্তী সময়ে স্থান দিয়েছেন।[১৫৪]

'বোধ হয় বঙ্গভাষা স্ফুরণের এই গুলি প্রাক্ - চেষ্টা; ভাষা ও ভাব দৃষ্টে বোধ হয়, ৮০০-১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এই সব বচন রচিত হইয়াছিল, যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্ত্তমান সহজাকারে পরিণত হইয়াছে। উহারা, একজাতির সম্পত্তি, হয়ত প্রাচীন কালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনার সাহায্য করিয়াছে।'[১৫৫]

এইসমস্ত বচনগুলি সাহিত্যিক মর্যাদা না পেলেও এর মধ্যে দিয়ে সমকালীন সমাজের যে ছবি ফুটে ওঠে তা গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন সমাজ জীবনে যেখানে লেখাপড়ার সুবিধে বিশেষ ছিল না, সেখানে সাধারণ মানুষেরা এই সমস্ত বচন বা প্রবাদ গুলি থেকেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করত। কিন্তু এই সুফলের সাথে সাথে ক্রমশ অন্ধবিশ্বাসও সমাজে পাকাপোক্তরূপে ঘর করে নিয়েছিল।

'জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে অধীত হইতেছিল না, - সংসার ক্লিষ্টের হস্তে পড়িয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছিল। যে জাতি এরূপ ভীরু তাহাদের জীবনে স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি কিরূপে থাকিবে? এইরূপ জ্যোতিষে ভক্তি জাতীয় প্রতিভা-বিকাশের প্রতিবন্ধক।

তাই ঐ সব বচনে একদিকে বাঙ্গালীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া সুখী হই, অন্য দিকে তাহাদিগের জড়তা দেখিয়া দুঃখিত হই।'[১৫৬]

সমকালীন সমাজের অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের সাথে সাথে মাণিকচাঁদের গান এবং ডাক ও খনার বচনে একথাও দৃষ্ট হয় যে সমসময়ে,

'ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকগণও কৃষি-ব্যবসা করিতেন ও স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত অক্ষক্রিয়াসক্ত ছিলেন। স্ত্রী লোকগণের অক্ষক্রিয়াসক্তি কবিকঙ্কণের সময়েও বিদ্যমান ছিল।'[১৫৭]

অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে 'বৌদ্ধযুগে'-র রচনায় পাওয়া কিছু অপ্রচলিত শব্দের নাতিদীর্ঘ তালিকার মধ্যে দিয়ে।[১৫৮] উক্ত শব্দ গুলি এবং তার অর্থ যে একই ভাবে সমাজে আজও বিদ্যমান তা একেবারেই নয়। বরং উল্টোটাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবুও এই শব্দগুলি বাংলাভাষার আদিরূপকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবার রসদ জোগায়।

পঞ্চম অধ্যায়কে নির্দিষ্ট কোন নামে অভিহিত না করলেও এই অধ্যায়ে মূলত দুটি বিষয় নিয়ে গ্রন্থকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন -

(ক) ধর্ম্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি এবং

(খ) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ।

এখন 'ধর্ম' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বারবারই 'সম্প্রদায়কে' প্রাধান্য দিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানই একমাত্র কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন,[১৫৯] শুধু তাই নয় বৌদ্ধধর্মের বিলোপের পাশাপাশি নব্য হিন্দুত্বের উত্থান এবং তারপরে মুসলমানদের বাংলা জয় ঘটনা গুলিকে ও তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থকার সম্ভবত এমনটা মনে করতেন যে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের সময় সংস্কৃতায়নের প্রভাবে বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতি যখন এক হয়ে গিয়েছিল, তখন বৌদ্ধধর্মের সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে নিচেষ্টতা, মায়াবাদে আশ্রয় পরায়ণতা, বিষয়বিমুখতা, জিঘাংসাবৃত্তি-

বিরোধীতা, ইত্যাদি মতাদর্শ গুলি হিন্দুধর্মে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এবং এই কারণেই মুসলমানরা হিন্দুদের কাছ থেকে বাংলা জয় করে নিতে পারে কারণ তারা উক্ত মতাদর্শের বিপ্রতীপে অবস্থান করত।

হিন্দুধর্মে প্রবল ভাবে আস্থাবান একজন মানুষ সেই ধর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার ত্রুটির দিকগুলি সযত্নে এড়িয়ে যাবেন এমনটা খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এইকাজ করতে গিয়ে যদি তিনি অন্য ধর্ম বা তার মতাদর্শ গুলিকে হীন প্রমাণ করতে চান, সমস্যা সেখানেই। কোন লেখকই তার সমকালের প্রভাব বহির্ভূত হতে পারেন না। দীনেশচন্দ্র সেনও নন। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী চেতনা তাঁর মর্মেও যে আঘাত করেছিল 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এ তার বহুল প্রমাণ আছে। জাতীয়তাবাদী চেতনা সর্বদাই ব্যক্তির ভাবনা চিন্তাকে সংকীর্ণতার পথে নিয়ে যায়। তাই অন্যান্য কারণ গুলির সঙ্গে মুসলমানদের বীরত্বও যে বঙ্গ বিজয়ে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল একথা সর্বসমক্ষে মানতে কষ্ট হয়। হিন্দুধর্মে কোথাও নাস্তিকতার কথা বলা নেই বলে এবং বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের থেকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়।[১৬০]

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শিব চরিত্র বেশ ম্রিয়মান। পৌরাণিক শিবের ভোলানাথ রূপকে উপেক্ষা করে লৌকিক শিবের যে ছবি আঁকা হয়েছিল তা অনেকখানি ব্যক্তিত্ব বর্জিত। ব্যক্তিত্বের এমন হীন চেহারা বিশিষ্ট স্বরূপের প্রতি জনসাধারণ আস্থাহীন হয়ে উঠছিল বলেই ধীরে ধীরে চন্ডী, মনসা ও অন্যান্য লৌকিক দেব-দেবীর উদ্ভব ঘটে।[১৬১] এবং এক একজন দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যগুলির মধ্যে দিয়েই উক্ত দেব-দেবীরা আরও বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। ফলে গ্রন্থকারের যে অনুমান - ধর্মের জন্যই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, - তা ঠিক নয়। বরং এই কাব্যগুলির জন্যই, ভাষার জন্যই ঐশ্বরিক ধর্ম অনেক বেশি প্রসারতা লাভ করেছে।

সমাজে প্রচলিত প্রাচীন উপাখ্যান গুলিকে কেন্দ্র করে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার মূলক যে সমস্ত কাব্য প্রাচীন কবিরা রচনা করেছিলেন, আপাত দৃষ্টিতে মনে

হতে পারে যে, তা কেবলমাত্র ধর্মপ্রসঙ্গের সীমাতেই আবদ্ধ। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সমাজ জীবন ও সামাজিক মানুষ সম্পর্কিত অনেক গূঢ় ব্যাখ্যাও এই কাব্যগুলিতে লুকিয়ে রয়েছে। কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষচরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্তী হয়ে অলৌকিক দেবশক্তির ওপর অনুচিত বিশ্বাসপরায়ণ। এখন মুসলিম শাসনের কাছে, ক্ষমতার কাছে, পরাধীন জাতিকে নিজেদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে, বিপদ থেকে, মুক্তি পাওয়ার আর্তি কাউকে তো জানাতে হবে। তাই সেই জানানোর কাজটা তারা দেবতার ওপর নির্ভরতার মাধ্যমে তাঁদের প্রতি করেছে। পাশাপাশি বাংলার ভৌগলিক অবস্থানও পুরুষ চরিত্র গুলির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে সহায়ক হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ নদ-নদী সঙ্কুল, শস্য-শ্যামলা বাংলায় জীবনধারণের জন্য খুব বেশি পরিশ্রমী হতে হয় না। তাই 'কর্ম' -এর ওপর বিশ্বাসের তুলনায় 'ভক্তি'-র, আনুগত্যই জনজীবনে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। পরিশেষে গ্রন্থকার জানাচ্ছেন যে, -

'আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি; কতগুলি ধর্ম্ম প্রসঙ্গের সীমা -বন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল।.....কবিকঙ্কণ চন্ডী, কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, ঘনরামের শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল, প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্শ্বে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শণির পাঁচালী, ধান্যপূর্ণিমা, ব্রত-গীতি প্রভৃতি অসঙ্খ্য খন্ডকাব্য দৃষ্ট হয়। সেগুলিতে উদগম আছে, বিকাশ নাই। আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে, ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত লোষ্ট্রখন্ড যেরূপ দেখায় চন্ডীকাব্য, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে এই গুলি সেইরূপ দেখায়।'[১৬২]

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর ষষ্ঠ অধ্যায় 'গৌড়ীয় যুগ' নামে অভিহিত। এমন নামকরণের উপযুক্ত কারণ সম্পর্কে লেখক নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নি। কেবলমাত্র এই সময়কালের লেখাপত্রে গৌড় এবং গৌড়েশ্বর গণের উল্লেখ থাকায় তিনি এমন নামকরণই সমীচীন মনে করেছেন একথা জানিয়েছেন।[১৬৩] এই অধ্যায়ে কৃত্তিবাস থেকে শুরু করে বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস পর্যন্ত সাহিত্যের তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ এবং রসগ্রাহী ব্যাখ্যা

রয়েছে। বর্তমানে কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি চন্ডীদাস, ও অন্যান্যদের রচিত সাহিত্যকে আমরা 'মধ্যযুগ'-এর সাহিত্যের আওতাভুক্ত করি।

যে সময়কে গ্রন্থকার 'গৌড়ীয় যুগ' নামে অভিহিত করেছেন, সেই সময় ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করছিলেন মুসলমান সম্রাটরা। অন্তত এই অধ্যায়ে যাঁদের লেখা আমরা পাচ্ছি তাঁদের অধিকাংশের লেখার মধ্যে দিয়েই উক্ত মতামতের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। এমনকি বাংলা ভাষা রাজদরবারে সম্মানিত হয়ে সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দী, বা বিজয়গুপ্ত সহ কেউ কেউ সে কথাও জানাচ্ছেন।[১৬৪] ফলে একথা মোটামুটি পরিষ্কার যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির পেছনে মুসলমান শাসকদের অবদান রয়েছে। তাই একথাও বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না যে এই সময়ের রচিত অধিকাংশ লেখ্য সাহিত্য ও মুসলিম শাসকদের অবদান প্রায় সমার্থক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা কোন ভাবেই মানতে পারা যায় না যে, গৌড়েশ্বরদের অবদান থাকলেই সাহিত্যকে আমরা কেবল 'গৌড়ীয় যুগ' নামে অভিহিত করব। সম্রাটদের অবদান একটা দিক মাত্র। এছাড়া আর ও এমন অনেক কিছুই এই সময়ের সাহিত্যে রয়েছে যার ভিত্তিতে সেগুলি সমসময়ে এবং আজও সমান জনপ্রিয়। সেই বিশেষত্ব গুলিকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র গৌড়েশ্বরদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত হয়নি।

ষষ্ঠ অধ্যায় বা 'গৌড়ীয় যুগ' বা 'শ্রীচৈতন্য পূর্ব্ব সাহিত্য' কে গ্রন্থকার মোট পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যথা -

১) 'পঞ্চগৌড়'

২) অনুবাদ শাখা

৩) লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা

৪) পদাবলী - শাখা

৫) কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত শাখা[১৬৫]

‘পঞ্চগৌড়’ অংশে গৌড়ের সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক পরিচয় এবং গৌড়েশ্বরদের ঐতিহাসিক পরিচয়কে স্মরণে রেখে কবি ও কাব্যের একটি খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে। ইতিহাস ও ভূগোলের প্রেক্ষাপটকে স্মরণে রেখে সাহিত্য পাঠের নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত এই প্রথম।

যে কোন ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে অনুবাদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষায় এর অন্যতম উৎকর্ষ ঘটেছে কৃত্তিবাসের হাতে। যদিও ‘কৃত্তিবাসের রামায়ণ’ রূপে যে সাহিত্যের প্রচলন বাংলায় রয়েছে তার পুরোটাই একক কৃত্তিবাসের অনুবাদ, এমনটা নাও হতে পারে। কারণ, কৃত্তিবাসের অনুবাদের বহু আগে থেকেই উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে রামায়ণের কাহিনির প্রচলন ছিল।[১৬৬] কাহিনির মূল কাঠামো এক থাকলেও অবস্থান ভেদে আনুষঙ্গিক বিষয়ের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেই পড়ে থাকা প্রচলিত কাহিনি অবলম্বন করে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন। ফলে বাল্মীকির রাম চরিত্রকে বাঙালির ঘরের উপযোগী করে তোলবার জন্য যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার উপাদান বহু আগে থেকেই বাংলার আবওহাওয়া, জলবায়ু, কিংবদন্তী, মৌখিক কাহিনির মধ্যে দিয়ে সমাজে উপস্থিত ছিল। কৃত্তিবাসের প্রতিভার সমাহারে সেইগুলি পূর্ণতা পেয়েছে। ফলে কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করে নি।

কৃত্তিবাসের সময়কাল সম্পর্কে তাঁর আত্মবিবরণীর ওপর নির্ভরতা ব্যতিরেকে অন্য পথ নাই। এবং এই বিবরণীটিও এত সংক্ষিপ্ত এবং ত্রুটি যুক্ত যে উপযুক্ত সময়কাল নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। মোটামুটি ভাবে পঞ্চদশ শতকের একটি হাতে লেখা পুথি থেকে কৃত্তিবাসের কাল (তাঁর আত্মবিবরণীর মধ্যে দিয়ে) উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার।[১৬৭]

রামায়ণের পরে মহাভারতের অনুবাদকদের মধ্যে প্রাচীনত্বের নিরিখে গ্রন্থকার সঞ্জয়কে প্রধানরূপে বিবেচিত করেছেন এবং তাঁর রচিত মহাভারতের দু-চার পৃষ্ঠা প্রকাশ্যেই অন্যান্য কবিদের রচনায় জুড়ে যাওয়ার উল্লেখও করেছেন।[১৬৮] সঞ্জয়

সম্পর্কে পাওয়া অতিসংক্ষিপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থকার যেভাবে তাঁর সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার দ্বারা দীনেশচন্দ্র সেনের ব্যক্তিগত মেধা-মনন ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সঞ্জয়ের পরে মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী উল্লেখযোগ্য, যাঁরা পরাগল খাঁ ও তার পুত্র ছুটি খাঁর প্রেরণায় মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ইতিহাস সম্পর্কে এমন অনেক মূল্যবান তথ্য রয়েছে, যা যে কোন ঐতিহাসিকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রশস্তি বা আনুগত্য প্রদর্শন স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেই প্রশস্তি যখন মিছে কল্পনার আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়, তখনই ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে। ছুটি খাঁর নির্দেশে শ্রীকরণ নন্দী মহাভারতের যে অংশের অনুবাদ করেন, সেই অংশে ত্রিপুরেশ্বরের সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা কেবলমাত্র কাল্পনিক সত্য। গ্রন্থকারের মতে প্রকৃত সত্য হল -

'সে সময়ে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও তাঁহার সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ রণক্ষেত্রে মুসলমানগণকে দেখাইয়া ছিলেন - ত্রিপুর পাহাড়ের তীব্র বায়ু তাহারা সহ্য করিতে অশক্ত'।[১৬৯]

মুসলমান পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত আরও একটি অনুবাদ সাহিত্য মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। তাঁর নিজের কথা থেকেই জানা যায় যে তিনি ১৩৯৫ শকাব্দে ভাগবতের অনুবাদে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং সাত বছরের চেষ্টায় ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ শেষ করেন।[১৭০] 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম এই যে এখানে গ্রন্থকার প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবি রচয়িতাদের অধিকাংশের সময়কাল সম্পর্কে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে যে একই রকম ভাবে বলবৎ রয়েছে তা নয়, কারণ পরিবর্তনই জীবনের নিয়ম। তবুও রচনা ও রচয়িতাকে বোঝবার জন্য তার

সময়কালের জ্ঞানও প্রয়োজন, এই সত্য গ্রন্থকার সার্বিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং নিজের মত করে তিনি তার ব্যাখ্যাও রেখে গেছেন।

লৌকিক ধর্ম বা বাংলার লৌকিক দেব-দেবীদের উদ্ভবের পেছনে মূলত তৎকালীন সমাজহৃদয়ের দুর্বলতাকেই প্রধান কারণ রূপে বিবেচিত করেন গ্রন্থকার।[১৭১] এই দুর্বলতার সূত্র ধরেই কল্পিত হয়েছেন যে সমস্ত দেব-দেবীরা তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য দেবী মনসা। লৌকিক ধর্ম্ম শাখার এই অংশে চাঁদ সওদাগর, বেহুলা ও মনসার সংক্ষিপ্ত কাহিনি এবং 'মনসামঙ্গল' এর কবি রূপে কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কবিজনার্দ্দন প্রমুখদের আলোচনা রয়েছে।[১৭২] গ্রন্থকার স্বল্প পরিসরে কিছু কবির রচনারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চাঁদ সওদাগরের প্রসঙ্গে প্রচলিত কাহিনি গুলি সম্পর্কে গ্রন্থকারের বক্তব্য -

'আমাদের বিশ্বাস চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনামূলক। পাঠক শনির পাঁচালী কি সত্যনারায়ণের পাঁচালী দেখিয়াছেন, চাঁদবেণের কথার সুরুও ঠিক সেই রূপ ছিল। এক একজন করিয়া কবিগণ ঘটনা ও কাব্য বর্ণিত চরিত্র বাড়াইয়াছেন, এবং মিথ্যাকে এমনই সত্যের পোষাক পরাইয়াছেন, -চাঁদ সদাগর কল্পনার লাল পাগরি মাথায় বাঁধিয়া সত্যসত্যই আমাদের ভয় জন্মাইতেছে। কাব্য বর্ণিত ঘটনা গুলি অনুধাবন করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। মনসার সঙ্গে বাদে চাঁদ সদাগরের দুর্গতি গুলিতে কিছুমাত্র সত্য থাকিতে পারে না।'[১৭৩]

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে অন্যতম সেরা প্রাপ্তি পদাবলি সাহিত্যের আলোচনা। মূলত চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির। এর আগে পর্যন্ত চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কেন্দ্রিক যত আলোচনা হয়েছে তা কোথাও এমন আবেগময়, বিশ্লেষণ বহুল ও তথ্য পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। দ্বিতীয় অংশে চন্ডীদাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার তাঁর প্রতি নিজ ব্যক্তিগত পক্ষপাতের কথা জানিয়েছেন। তার সম্পর্কে প্রচলিত মৌখিক কাহিনি গুলিকে অবলম্বন করে গ্রন্থকার চন্ডীদাসের সময় সম্পর্কে মোটামুটি একটি অনুমানে পৌঁছেছেন। সমকালে চন্ডীদাসের প্রচলিত পদ সমূহকে তিনি যে

রূপরেখার আধারে বেঁধেছেন তা এক কথায় প্রশংসনীয়। কেবল পদাবলির বৈশিষ্ট্যের প্রকাশই নয়, রাধিকা চরিত্রের আবেগময় ব্যাখ্যাও পাঠকের কাছে এক নতুন প্রাপ্তি।

পরিশেষে বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের তুলনা মূলক আলোচনায় চন্ডীদাস প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের সমীক্ষা -

'চন্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় উপমা প্রয়োগ করেন নাই, -সুন্দরের স্বভাব ভঙ্গীই গহনা হইতে বেশী আকর্ষক; উপমা কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণিত আছে সত্য, -কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না, তিনি উপমার অঙ্গুলী সঙ্কেতে গৌণবস্তু দ্বারা মুখ্য বস্তুর আভাস দিতে চেষ্টা করেন। তাই উপমার রূপ বর্ণনা হইতে জীবন আঁকিয়া রূপ বর্ণনা উৎকৃষ্ট। এই অংশে কালিদাস হইতে সেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাপতি হইতে চন্ডীদাস শ্রেষ্ঠ।

চন্ডীদাসের দু একটি গানে ভাগবত পড়ার আভাস আছে, -''কেহবা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে চুলাতে রাখিয়া বেসালি'' প্রভৃতি পদ দেখুন।'[১৭৪]

প্রথম অংশে বিদ্যাপতির সময়কাল অন্বেষণ করতে গিয়ে গ্রন্থকারকে যথেষ্ট পরিশ্রমী হতে হয়েছে। কেবলমাত্র প্রচলিত কাহিনির ওপর ভিত্তি করেই এক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হয় নি, বিদ্যাপতির বিস্ফী গ্রাম প্রাপ্তিজ্ঞাপক ভূমিদানপত্র ও মিথিলার রাজপঞ্জিকেও সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছে।[১৭৫] এই সমস্ত কিছুর ওপর ভিত্তি করেও গ্রন্থকারকে বিদ্যাপতির সময়কাল নির্ণয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

বিদ্যাপতির সময়কাল নির্ণয়ে গ্রন্থকার অসুবিধার সম্মুখীন হলেও, বিদ্যাপতিরই লিখিত পদের নিরিখে বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসকে তিনি একই সময়ের কবিরূপে অনুমান করেছেন।[১৭৬] আর চন্ডীদাসের আনুমানিক ১৩৮০ অব্দে জন্ম বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭৭] বিদ্যাপতির পদ সমূহকে অবলম্বন করে তাঁর রাধা চরিত্রের বিশ্লেষণও গ্রন্থকার করেছেন। বিদ্যাপতির ও চন্ডীদাসের রাধার ব্যাখ্যা পাশাপাশি রেখে পড়লে দীনেশচন্দ্র সেনের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

পঞ্চম অংশে কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত শাখার, প্রথম অংশে মূলত 'শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল' কাব্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে সংক্ষেপে। এই কাব্যকে গ্রন্থকার 'গৌড়-কাব্য' রূপেও অভিহিত করেছেন। এই কাব্যের কবিরা সকলেই নিশ্চিতরূপে গৌড়দেশীয় ছিলেন কিনা ১৮৯৬ -এ তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। গৌড়দেশীয় হলেও তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে নিশ্চয়ই কাব্যের পরিচয় হবে না। আর ধর্মমঙ্গল কাব্যের সম্পূর্ণ গৌড় সংযোগ বিষয়ে লেখক কোন মন্তব্যই করেন নি। তিনি কেবল বলেছেন -

'হাকন্দপুরাণ নামক লুপ্ত গ্রন্থে এই ইতিহাসের প্রথম প্রচার হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন বাঁকুড়ায় ময়ূরভট্ট প্রণীত গৌড়কাব্য এখনও প্রচলিত আছে, -ইহাই দ্বিতীয় গ্রন্থ, আমরা তাহা পাই নাই। খেলারাম প্রণীত গ্রন্থই বোধ হয় এ বিষয়ের তৃতীয় পুস্তক; শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় এই পুস্তকের উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে পুস্তকখানা পাইয়াছেন তাহার শেষের অনেকাংশ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।'[১৭৮]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখায় ধর্মমঙ্গলের আরও এক কবি রূপরামের উল্লেখ পাওয়ায় 'রাম' শব্দটির ঐক্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে।[১৭৯]

দ্বিতীয় অংশে 'রাজ-মালা'-র উল্লেখে, ত্রিপুরার রাজা ধর্ম্ম মাণিক্যের উৎসাহে বাংলা পদ্যে রাজমালার লিখিত সূত্রপাত হয়।[১৮০] এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে লেখকের সংগৃহীত তথ্য ও অনুমান নিম্নরূপ -

'এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে একবার এই রাজমালার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল ..... যে সময়ে রাজমালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বংশাবলী স্বল্পায়তনে দেখান জন্য একটি সংক্ষিপ্ত রাজমালাও প্রস্তুত হইয়াছিল ..... ইহা বঙ্গে ইতিহাস লেখার সূত্রপাত। ইহার বিকাশ বৈষ্ণব -সাহিত্যে চৈতন্য-ভাগবতের ন্যায় ঘটনার উৎকৃষ্ট সমাবেশযুক্ত ইতিহাসে ও চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব ভক্তি- প্লুত দর্শনাত্মক ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় চরিত-শাখা মাত্র বিকাশ পাইয়াছে। রাজত্বের ইতিহাস কি রাজনীতির আলোচনা বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে

দুষ্প্রাপ্য; যাহা কিছু পাওয়া যায়, - রাজমালায়ই তাহার সুরু, রাজমালায়ই তাহার শেষ।'[১৮১]

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এসেই সর্বপ্রথম পরিশিষ্ট সংযুক্ত হচ্ছে। এই অধ্যায়ে মূলত যে সমস্ত কবি ও কাব্যের আলোচনা হয়েছে তাদের একটি আনুমানিক সময়সীমা ও গ্রন্থতালিকা এই অংশে প্রকাশিত। পাশাপাশি 'ব্রিজবুলি' (ব্রজবুলি) 'পাঞ্চালী' (পাঁচালির) ধারণাও[১৮২] এখানে পাওয়া যায়। আগের 'বৌদ্ধযুগ' অধ্যায়ে গ্রন্থকার স্মরণে রেখেছিলেন সংস্কৃতের প্রভাব বর্জিত সাহিত্যকে। এই অধ্যায়ে অনেকটা মার্জিত সংস্কৃত প্রভাবিত সাহিত্য রূপকে গ্রন্থকার তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।[১৮৩] একই সঙ্গে এই সময়ের সাহিত্যে প্রচলিত কিছু শব্দের অর্থসহ তালিকা, ক্রিয়া-বিভক্তির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন গ্রন্থকার।[১৮৪]

প্রাচীন বাংলার সাহিত্যকে পড়বার ক্ষেত্রে কেবল বাংলার গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যদি আমরা একটু উত্তর - পশ্চিমাঞ্চলের দিকে দেখি, তাহলে দেখব যে, বাংলার সাথে সেই অঞ্চলের নৈকট্য সুদূরেই স্থাপিত হয়েছিল, এবং এর প্রভাব সাহিত্যে অবশ্যম্ভাবী। বিদ্যাপতির সৌজন্যে মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রণে উদ্ভূত 'ব্রজবুলি' ভাষা, বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' এ বর্ণিত সিংহলরাজ চাঁদসদাগরের কাছ থেকে পট্টবস্ত্র চেয়ে নিয়ে তা বাঙালিভাবে পরতে শিখছেন, 'অন্নদামঙ্গল' -এ শিবের 'কুসুম্ভা' সেবন বা বাঙালি পুরুষদের উত্তর -পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের মত দীর্ঘকেশ রক্ষা[১৮৫] ইত্যাদি ঘটনাগুলি পাঠককে বর্হিবাংলার দর্শন করায়।

সপ্তম অধ্যায়ের নামকরণ গ্রন্থকার করেছেন 'শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ'। দীনেশচন্দ্র সেনের যুগবিভাজনের পদ্ধতি এবং তার নামকরণ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে ঠিক কিসের নিরিখে, বা কোন যুক্তিসম্মত রূপে তিনি সাহিত্যের যুগ বিভাজন করবেন, এ বিষয়ে তিনি নিজেও নিশ্চিত ছিলেন না। তাই একবার বৌদ্ধ, তারপর ধর্ম, তার পর গৌড় বা গৌড়েশ্বর আর এখানে ব্যক্তি চৈতন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেবল চৈতন্যই নয়, নামকরণে নবদ্বীপের উল্লেখ ও আছে। আগের অধ্যায়ে

গৌড় বা গৌড়েশ্বরদের প্রাধান্য দেওয়ার পর, এই অধ্যায়ে যখন নবদ্বীপ বা চৈতন্য আসছেন, তখন একটি বিষয় একেবারেই স্পষ্ট হচ্ছে না যে 'গৌড়' ও 'নবদ্বীপ' - কে কি ভৌগোলিকতার বিচারে গ্রন্থকার দূরবর্তীরূপে বা আলাদা রূপে গণ্য করছেন?

এই অধ্যায়ের চারটি উপবিভাগ বর্তমান, যথা -

১) শ্রী চৈতন্যদেব ও এই যুগের সাহিত্য।

২) শ্রী চৈতন্যদেবের জীবন।

৩) পদাবলি শাখা।

৪) চরিত শাখা।

অধ্যায়ের প্রায় শুরুতেই গ্রন্থকার জানাচ্ছেন যে -

'এই অধ্যায়ের চরিত শাখা পদাবলী দ্বারা বুঝিতে হইবে, পদাবলী চরিতশাখা দ্বারা বুঝিতে হইবে এবং উভয়ই গৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হইবে।'[১৮৬]

চৈতন্যদেবের জীবনীকে গ্রন্থকার মূলত কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যথা - শ্রী চৈতন্যদেব, জন্ম ও শৈশব, নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে নিমাইয়ের পূর্ববঙ্গ পর্যটন অংশকে 'শ্রীকৃষ্ণ -চৈতন্য' - নামক বিশেষণে বিশেষিত করেছেন গ্রন্থকার।[১৮৭] এরপরে তাঁর জীবনে ধর্ম্মনীতি,[১৮৮] তার পরেই পদাবলি - সাহিত্যের আলোচনা। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে -

'শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পদসমুদ্র ও পদকল্পতরু অবলম্বন করিয়া পদ সংখ্যা সমেত একটি কবি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন; আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।'[১৮৯]

এ ক্ষেত্রে মোট পদকর্তার সংখ্যা আনুমানিক ১১৫ জন।[১৯০] যার মধ্যে বেশ কিছু মুসলমান পদকর্তার নামও রয়েছে। কিন্তু এর পরেও গ্রন্থকার 'পদকল্পলতিকা', 'গীতচিন্তামণি' প্রভৃতি মন্থন করে আরও ৩০-৩১ জন পদকর্তার নাম সংযোজিত করেছেন।[১৯১]

এই অধ্যায়ের পদাবলি শাখায় বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস পরবর্তী পদকর্তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের হাতেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বা আজকের 'মধ্যযুগ' বৃহদাকার ধারণ করেছে। গ্রন্থকারের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি, পাদটীকার ব্যবহার। একজন গবেষকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যকে মন্থন করেছেন এবং পাঠকের বোঝার সুবিধের জন্য সাহিত্য সংক্রান্ত পাদটীকাকে উৎকর্ষের সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রধান-অপ্রধান কবিদের এত বিপুল সমাবেশ এর আগে কখনও ঘটে নি। যেহেতু এই সমস্ত কবিরা চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরবর্তী সময়ে পদচর্চা করছেন, তাই তাঁদের পদ সমূহ পাঠ ও বিশ্লেষণের সময় অবধারিত ভাবে চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাথে তুলনা এসে যায়। পাশাপাশি বৈষ্ণবীয় পদ সংকলন গুলি সম্পর্কেও যে তথ্য সমাবেশ ঘটেছে, একজন গবেষকের কাছে তা পথপ্রদর্শক স্বরূপ।

বাংলাদেশের সাহিত্য সমাজে এক নতুন ধারার প্রবর্তন হয় চরিত সাহিত্যের দ্বারা। ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে বাংলার সামাজিক জীবনের একটি বড় ঘটনা। তাঁকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে যে জীবনী সাহিত্য গুলি রচিত হয়েছে সেগুলিই পরবর্তীকালে চরিতসাহিত্য নামে খ্যাত। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর লেখায় এই চরিত সাহিত্য গুলিকে স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত -চৈতন্য সমসাময়িক রচিত জীবনী, দ্বিতীয়ত -চৈতন্য পরবর্তী রচিত জীবনী। চৈতন্যের সমকালে রচিত জীবনী সাহিত্য গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গোবিন্দদাসের করচা' এবং 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল'। চৈতন্যের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কোন ব্যক্তির প্রাধান্য সূচিত হয় নি। যদিও একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে, মনুষ্য দ্বারা বর্ণিত ইতিহাস বা জীবনেতিহাসকে কখনই পরিপূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না।

'গোবিন্দদাসের করচা' চাক্ষুষ রূপে প্রত্যক্ষ করা ঘটনাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ। চৈতন্যের ছায়াসঙ্গী রূপে গোবিন্দ দাস সর্বদা তাঁকে অনুসরণ করতেন এবং চৈতন্যের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর 'করচা' রচনা করেন।[১৯২] চৈতন্যের জীবন সম্পর্কিত

নানা ঘটনা, তথ্যের উল্লেখের পাশাপাশি সমকালীন ঐতিহাসিক - ভৌগোলিক-সামাজিক ঘটনা ও প্রকৃতি বর্ণনার দ্বারাও এই 'করচা' তার উৎকৃষ্টতার পরিচয় রেখেছে।[১৯৩] অতি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত এই করচায় চৈতন্যের ধর্ম সম্পর্কীয় উপদেশ গুলি তার মনোহারিত্ব হারিয়েছে কারণ গোবিন্দদাসের পুথিগত শিক্ষার অভাব। এই 'করচা' - কে পরবর্তীকালে সমালোচকেরা নিজস্ব যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে খুব বেশি গুরুত্ব দেন নি, কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন এই গ্রন্থটিকে সমসাময়িক ও চৈতন্য জীবনীর ঐতিহাসিক অংশে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তাঁকে কেন্দ্র করে যে জীবনী সাহিত্য গুলি রচিত হয়েছে তার উৎস সম্ভবত সমকালে প্রচলিত মৌখিক কাহিনি, বিভিন্ন লেখা গ্রন্থ এবং রচয়িতার নিজস্ব কল্পনা। এই সময়ে রচিত জীবনী সাহিত্য গুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'। সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-লৌকিক জীবনের চালচিত্র 'চৈতন্যভাগবত' থেকে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়, কারণ কোন রচয়িতাই তাঁর লেখায় সমকালকে অস্বীকার করতে পারেন না। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত চৈতন্যের জীবনীর সাথে ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর সাদৃশ্য লক্ষ করা ও অস্বাভাবিক নয়।

লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' -এ চৈতন্যকে দেবলীলার আধারে রূপায়িত করা হয়েছে। তবুও এই সমস্ত জীবনী কাব্য গুলিকে চৈতন্যের অলৌকিক বা দেবমহিমাজ্ঞাপক রচনা রূপে একমাত্র বিবেচনা না করে যদি এর মধ্যে থেকে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য গুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করা যায়, তবেই হয়ত এই জীবনী সাহিত্য গুলির সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে।

বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' -এর যে যে জায়গা গুলির বর্ণনা প্রায় সম্পূর্ণ করেন নি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' -তে সেই অংশগুলিকে আপন মেধা ও বিচক্ষণতার দ্বারা পূর্ণ করেছেন। অপূর্ব পান্ডিত্য, ভক্তি ও লিপিকলায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যদিও এর ভাষায় বৃন্দাবনী

ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়, কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজে বেশ কিছু বছর বৃন্দাবনে কাটিয়েছিলেন।[১৯৪] গ্রন্থ রচনা ও তার সমাপ্তি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন জানাচ্ছেন -

'বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত, মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা এবং কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীদাস, লোকনাথ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট মৌখিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রবল ও অমানুষী অধ্যবসায়ে ১৫৭২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮২ খৃঃ অব্দ নয় বৎসরের চেষ্টায় চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।'[১৯৫]

চরিতামৃতের পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে চৈতন্য ছাড়াও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য গণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।[১৯৬] অধ্যায়ের পরিশেষে দীনেশচন্দ্র সেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু বৈষ্ণব আচার্য এবং কিছু সম্মানিত বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন। শব্দ ও ভাষা বিশ্লেষণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ের অনুরূপ। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনার যে ইঙ্গিত থাকে, এই অধ্যায়েও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সর্বোপরি বলা যায় যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলার সমাজ-সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল ঠিকই, কিন্তু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর পর্যায়ে এসে দেখলাম যে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে সাহিত্যের নিয়ন্ত্রক রূপে পরিগণিত করলেন। ফলে এই অধ্যায়ের নাম হল 'শ্রীচৈতন্য - সাহিত্য'। যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সাহিত্যের গুণাগুণ অবলম্বন করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেত।

এই অধ্যায়ের শেষেও পরিশিষ্ট সংযোজিত করেছেন গ্রন্থকার, এবং এই দীর্ঘ অংশে মূলত বৈষ্ণব সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সংক্রান্ত বইয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি বৈষ্ণব সমাজের পরবর্তী সময়ের কলহ, অবনতি ইত্যাদি প্রসঙ্গও বর্ণিত। শব্দ, তার অর্থ, ছন্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গও এসেছে। উল্লেখযোগ্য হল, বাংলা শব্দের পাশে এই সময়ে পাওয়া আরও অন্যান্য উর্দু, সংস্কৃত, হিন্দি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ।[১৯৭]

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের পরিচয় 'সংস্কার যুগ' নামে। এই নামকরণ সম্পর্কে গ্রন্থকার জানাচ্ছেন -

'রামায়ণ, মহাভারতাদির অনুবাদ, চন্ডীকাব্য, পদ্মাপুরাণ, শিব সংকীর্ত্তন ইত্যাদি পুস্তক এই যুগে নবভাবে সংস্কৃত হইয়া পুনরায় লোকমনোরঞ্জনের উপযোগী হয়। রামায়ণ, মহাভারত, চন্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি তাবৎ পুস্তকেরই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই নূতন সংস্করণময় -যুগকে আমরা - 'সংস্কার যুগ' আখ্যা প্রদান করিয়াছি।'[১৯৮]

গ্রন্থকারের বক্তব্যটি নামকরণের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে একেবারেই যুক্তিপূর্ণ মনে হল না। কারণ একই বিষয়কে অবলম্বন করে আলাদা আলাদা সময়ে একাধিক কবিগণ কাব্য রচনায় মনযোগী হয়েছেন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিভেদে বিষয় একই থাকলেও সময়ানুসারে পরিবেশনায় ফারাক থাকবেই। ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তা-বোধের প্রকাশ ও ঘটবে তার মধ্যে। আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হলে তবেই তাকে সংস্কার বলা একরকম যুক্তিযুক্ত হত। কিন্তু গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুসারে কেবল বাহ্যিক চাকচিক্যের পরিবর্তনই হয়েছে, ভেতরের কাঠামো একই রয়েছে। তাহলে সেই অর্থে সংস্কার হল কোথায়? তবে একথা ঠিক যে এই অধ্যায়ে এমন অনেক কবিদের আলোচনা রয়েছে যাঁরা তাঁদের পূর্ববতী কবিদের তুলনায় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বিষয়গত মিল থাকলেও।

এক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হয় মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর। পূর্বতন কবি মাধবাচার্য্য একই বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করলেও নিজ রচনা কৌশল ও বর্ণনার গুণে চরিত্র ব্যাখ্যায় মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ। তিনি নিজের মত করে তাঁর কাব্যগঠন করেছেন। কোন রচয়িতাই যেহেতু তার সমকালের উর্ধ্বে নন, তাই মুকুন্দরামের চন্ডীকাব্যেও তাঁর সমকালের ছায়া পড়েছে। ডিহিদার মামুদ সরিফ চরিত্র চন্ডীকাব্যে দুরপনেয় কালির বর্ণে অঙ্কিত। মুসলমান অধিকারে হিন্দুর অন্নসংস্থান ক্রমে নষ্ট হচ্ছিল এবং তাদের উৎপীড়নে দেশযুদ্ধ আতঙ্ক জন্মেছিল এমন চিত্র মুকুন্দরামের চন্ডীকাব্যে চিত্রিত রয়েছে। এই চিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধিকাংশ সমালোচকই এমন মনে করেন যে

মুসলিম শাসকেরা হিন্দু প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেছিল। একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, হিন্দুরা কেবল হিন্দু বলেই মুসলিমদের দ্বারা অত্যাচারিত হত তা নয়। একদল শাসক, অন্যদল শাসিত, তাই তারা অত্যাচারিত হত। এই অত্যাচারিতের দলে কেবল হিন্দুই নয়, মুসলিমরা ও থাকতে পারেন, তাই কেবল মাত্র ধর্মীয় ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সমাজ ও সাহিত্যকে দেখা ঠিক নয়, মুসলমান শাসকেরা ছিলেন, হয়ত অত্যাচারও হয়েছে, তবে সেটাই তো একমাত্র নয়। অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদের কবল থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।

প্রাচীন বাংলার সাহিত্যকে যারা কেবল বা প্রধানত দৈবনির্ভর সাহিত্য রূপে আখ্যায়িত করতে চান, তাদের একবার দীনেশচন্দ্র সেনের মুকুন্দরামের চন্ডীকাব্যের ব্যাখ্যা পড়তে অনুরোধ করব। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতার দ্বারা একটি রচনাকে কীভাবে পড়তে হয় প্রথমত তা শিখিয়েছেন, দ্বিতীয়ত, আজকের সময়েও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার জায়গাটি তিনিই আমাদের বুঝিয়েছেন।

খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে রামেশ্বর ও শিবায়নের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রূপে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন এই কথাটি -

'বহুদিন এক একত্রবাসনিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমান গণ পরস্পরের ধর্ম্মসম্বন্ধে কতকটা উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্রদেবতার পূজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষ্যে ফকিরী আলখাল্লা গায় পরিয়াছেন ও উর্দ্দু জবানে বক্তৃতা দিতেছেন।'[১৯৯]

মনসার ভাসান রচকদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা গ্রন্থকার পঞ্চম অধ্যায়ে দিয়েছেন।[২০০] এবং এই প্রসঙ্গে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দকে তিনি আলাদা আলাদা দুটি ব্যক্তিত্ব রূপে কল্পনা করেছেন এবং দুইজন একত্র হয়ে কাব্যরচনা করেছেন বলে অনুমান করেছেন।[২০১]

লৌকিক শাখার দেব-দেবীদের গ্রন্থকার দুটি পর্যায়ে ভাগ করে দুটি আলাদা অধ্যায়ে তাদের আলোচনা করেছেন। 'গৌড়ীয় যুগ' অধ্যায়ে মনসার প্রাচীন

কবিদের এবং তাঁদের কাব্যে বর্ণিত মূল কাহিনির আলোচনা রয়েছে। এই অধ্যায়ে লৌকিক শাখার পরবর্তী কবিগণ যেমন - কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রমুখদের কথা রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল যে, চন্ডী বা মনসার কোন কাব্যকেই গ্রন্থকার 'মঙ্গলকাব্য' -এর আওতাভুক্ত করেন নি, ব্যতিক্রম 'ধর্ম্মমঙ্গল'। চন্ডী ও মনসার কাব্যগুলিকে 'মঙ্গলকাব্য' নামে অভিহিত করা হয়ত গ্রন্থকার উপযুক্ত মনে করেন নি। যে রচনাগুলি আমাদের শেখায় যে ক্ষমতার কাছে, ভয়ের কাছে, লোভের কাছে মাথা নত করলেই জীবনে প্রচুর প্রাপ্তির আশা রয়েছে বা ক্ষমতার মতাদর্শই জীবনের একমাত্র মতাদর্শ হওয়া উচিত, এক্ষেত্রে নিজস্ব মতাদর্শে স্থির প্রত্যয়ী হওয়ার অর্থ, পরিবার-সম্পদ-সম্মান সমস্ত হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে বেঁচে থাকা, সেই আদর্শ সম্বলিত রচনা গুলি পাঠ করলে কখনো কারও মঙ্গল হতে পারে না। এই কারণেই সম্ভবত 'মঙ্গল' শব্দটির ব্যবহার কম।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঘনরাম চক্রবর্তী ও তাঁর 'শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের উল্লেখ এখানে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার জানিয়েছেন -

'হাকন্দ পুরাণে শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের বিষয় প্রথম লিপিবদ্ধ হয়; কিন্তু হাকন্দপুরাণ এখন লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় শ্রী ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট; তৎপর ১৫২৭ খৃঃ অব্দে খেলারাম এই বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করেন, ... ইহার পরে রূপরামের শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল প্রচারিত হয়-এই সব কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৭১৩ খৃঃ অব্দে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য সমাধা করেন।'[২০২]

এরপর ঘনরামের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁর কাব্যের কাহিনি অংশের উল্লেখ রয়েছে। দুই - একটি কাব্য ছাড়া দীনেশ সেনের হাতে অধিকাংশ কাব্য ব্যাখ্যাই বড় বেশি উপমা-বিশেষণময় হয়ে উঠেছে। এমন আবিল ও আবেগময় হৃদয় নিয়ে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলে কেবল আবেগেরই বহিঃপ্রকাশই ঘটে। উপযুক্ত বিশ্লেষণ হয় না, প্রকৃত ইতিহাসও হয় না।

প্রায় সমস্ত মঙ্গল কাব্য গুলিতেই গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে গ্রন্থকারদের বক্তব্যের একটি নির্দিষ্ট ধরন লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ গ্রন্থকারই জানিয়েছেন যে, তাঁরা প্রায় সকলেই স্বপ্নাদেশ দ্বারা আবিষ্ট হয়ে কাব্য রচনায় অগ্রসর হন। এখন মুশকিল হচ্ছে এই যে যুক্তির পারম্পর্য অনুসারে বক্তব্যটি মেনে নেওয়া কঠিন। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের যত জন কবি রয়েছেন তাঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসে কাব্য রচনা করেছেন। কেউ কেউ যে স্বপ্ন দেখেন নি তা নয়, কিন্তু সকলেই একই সময়ে বা আলাদা আলাদা সময়ে স্বপ্ন দেখেই কাব্য রচনা করবে এমনটা হতে পারে না। সম্ভবত পূর্ববর্তী কবিদের লেখার ধরন অনুসরণ করতে গিয়ে পরবর্তী কবিদের রচনায় এমন ধারা পরিলক্ষিত হয়। তবুও একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মত কবিদের নিজ কাব্য প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বপ্নাদেশের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কবির ব্যক্তিগত মুন্সিয়ানাই তাঁর কাব্যের পরিচয়বাহী।

লৌকিক শাখার পরবর্তী অনুবাদ শাখায় বেশ কিছু হাতে লেখা অপ্রকাশিত প্রাচীন পুথির ক্ষুদ্র বিবরণ রয়েছে, যে পুথি গুলির মূল উৎস মূলত সংস্কৃত সাহিত্য।[২০৩] কৃত্তিবাস পরবর্তী রামায়ণ অনুবাদকদের স্বল্প পরিসরে স্মরণ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদ শাখার উল্লেখযোগ্য অনুবাদকদের মধ্যে মহাভারত অনুবাদক কাশীরাম দাস অগ্রগণ্য। রামায়ণ পরবর্তী সময়ে অনুদিত হলে ও কৃত্তিবাসের যশ যেমন অক্ষুন্ন রয়েছে, তেমনই কাশীরাম দাস তাঁর পূর্ববর্তী অনুবাদকদের যশ হরণ করে, রচনার গুণে নিজ কীর্তি অমর রেখেছেন। কাশীদাসের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনুবাদকদের পরিচয় ও প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যদিও কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত মহাভারতে একাধিক কবির ভণিতা পাওয়া যায়।[২০৪] ভাগবতের অনুবাদকেরাও এই অধ্যায়ে স্মরণীয়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে কেবলমাত্র দৈবনির্ভরতার নিরিখে চিহ্নিত না করে বলা যায় যে, প্রাচীন সাহিত্য রচনার বেশ কিছু বাঁধা ধরা ছক ছিল। পূর্ববর্তী কবিরা

যে পথের দিকে ইঙ্গিত করে গেছেন, পরবর্তী কবিরা নিজ রুচি ও প্রতিভা অনুসারে সেই পথই অনুসরণ করেছেন। অনুসরণে ব্যক্তিগত মৌলিকতা প্রকাশ না পেলেও প্রতিভার স্ফূরণ অবশ্যই ঘটেছে। সেই প্রতিভাকে বিচার - ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ না করে কেবল খামখেয়ালী চিন্তার বশবর্তী হয়ে নির্দিষ্ট নাম বা সংজ্ঞায় অভিহিত করা উচিত নয়। প্রাচীন বাংলার সাহিত্যকে বোঝবার ও জানবার জন্য সমকালীন প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব অপরিসীম। অষ্টম অধ্যায়ের শেষেও পরিশিষ্টের সংযোজন রয়েছে। শব্দার্থের তালিকা, বাঁধাবিষয়ের উল্লেখ, লক্ষণীয়।[২০৫]

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের নাম 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের ২য় যুগ'। পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলির নামকরণের মত, এই অধ্যায়েরও এমন নামকরণের উপযুক্ত কারণ গ্রন্থকার আমাদের জানান নি। কিন্তু এই অধ্যায়ের সমূহ পাঠে নামকরণের উপযুক্ত কারণ নির্ণয়ে পাঠকের খুব বেশি অসুবিধা হয় না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে গ্রন্থকারের ধারণা কিছুটা এই রকম -

'বীরোচিত সৎসাহসের অভাব থাকিলেও কূট রাজনীতিতে কৃষ্ণচন্দ্র অতি প্রাজ্ঞ ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমান শাসন এই কূট রাজনীতি - আশ্রিত হইয়াছিল। মুসলমান দরবারের দুর্নীতি গুলি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছিলেন,.....[২০৬]

কেবল কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কেই নয়, এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার যাঁদের রচনা - সম্ভার নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের কারও লেখাকেই 'অশ্লীলতা', 'মুসলমানী কেচ্ছা' ইত্যাদি মুক্ত তিনি মনে করেন নি। এক কথায় 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ' এই কারণেই যে, আদর্শের মহিমাযুক্ত কোন লেখা গ্রন্থকার এই সময় পান নি। সমস্যা হচ্ছে আদর্শের বিষয়টি না হয় তবুও একরকম বোঝা যায়, কিন্তু 'মুসলমান দরবারের দুর্নীতি'[২০৭] বিষয়টি পরিষ্কার নয়। গ্রন্থকার কি মনে করতেন যে একমাত্র মুসলিমরাই বা মুসলিম শাসকরাই দুর্নীতি গ্রস্ত ও হিন্দুরা এর থেকে মুক্ত? একজন স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কি কি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি করবেন বা করবেন না সেটি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। ব্যক্তিভেদে

পাঠকদের কেউ তার মধ্যে আদর্শের ছায়া খুঁজে পেতে পারেন, নাও পারেন। ব্যক্তিভেদে ভালোলাগা ও মন্দলাগা দুইই সম্ভব। কিন্তু যে কোন মন্দলাগার মধ্যেই যদি মুসলমান প্রসঙ্গ এসে হাজির হয় তবেই ভাবনা-চিন্তা অন্যখাতে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়কে কেবল ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার নিরিখে দেখাটা ঠিক নয়।

ভারতচন্দ্রের কেবল শব্দমন্ত্রকেই গ্রন্থকার প্রশংসার উপযুক্ত বলে বিবেচিত করেছেন।[২০৮] বাকি তাঁর কাব্যের বিষয় বিশেষ করে 'বিদ্যাসুন্দর' -কে দীনেশচন্দ্র সেন 'অশ্লীলতার' প্রভাব যুক্ত[২০৯] বলে মনে করেন। গ্রন্থকার এই 'অশ্লীলতা'-র ধারণাটা কোথা থেকে পাচ্ছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলেন নি, বা তাঁর নিরিখে শ্লীল বা অশ্লীলের সংজ্ঞা কি, সে প্রসঙ্গে ও কিছুই জানান নি। আমাদের অনুমান, এই অশ্লীল-শ্লীল বিষয়টি ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতীচ্য থেকে আমদানি করা। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে অন্তত এ সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

এই অধ্যায়ে গ্রন্থকারের অন্যতম কৃতিত্ব 'পদ্মাবতী' সম্পর্কিত আলোচনা। এত বিস্তৃত আকারে সম্ভবত সর্বপ্রথম একজন মুসলমান কবি আলাওল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে যদিও সেই আলোচনার মাঝে ও অস্বস্তি বিদ্যমান।

'এই কাব্য কৃষ্ণচন্দ্র রাজার বহুপূর্ব্বে রচিত হইলেও ইহাতে এই যুগের মুখ্যচিহ্নগুলি বিদ্যমান, সুতরাং কবিকে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে, ...কবি আলাওল সংস্কৃতে কিরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে, তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল। এই পুস্তক পড়িয়া অনেক সময় প্রশ্ন হইবে, মুসলমানের লেখনী এতদূর হিন্দুয়ানী শিথিল কিরূপ?'[২১০]

অন্যত্র তিনি জানাচ্ছেন -

'যখন মুসলমান কবিকে পাঠক কিঞ্চিৎকালের জন্য হিন্দু কবি বলিয়া ভ্রম করিবেন, তখনই সহসা কল্পনার আকস্মিক জাঁকাল বিকাশে শৈশব শ্রুত পীরবান কি দানহাসের বৃত্তান্ত স্মরণ পড়িবে, ও পদ্মাবতীকাব্য মুসলমানী কেচ্ছার আকার ধারণ করিবে।'[২১১]

'পদ্মাবতী' কাব্যের মতই 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের মুখ্য চিহ্ন' সমূহ (শাস্ত্র চর্চা, সুকুমার বিদ্যায় অনুরাগ, কূটনীতি, কুরুচি ও বিলাস প্রিয়তার মিশ্র ছাঁচ)[২১২] বা 'মুসলমানী কেচ্ছা'[২১৩] সম্পর্কেও বিস্তৃত বিবরণ থাকলে পাঠকদের বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হত। 'পদ্মাবতী' কাব্যের উৎকৃষ্ট দিক গুলিকে গ্রন্থকার যেখানে অনুভব করেছেন সেখানেই কবিকে তিনি হিন্দুমনোভাবাপন্ন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে যেখানে উৎকৃষ্ট দিক পরিলক্ষিত হয়নি, সেখানেই মুসলমানী কেচ্ছার প্রসঙ্গ তুলেছেন। সাহিত্যের রসাস্বাদনে এমন একপেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব পুরোপুরি সঠিক কিনা ভেবে দেখা যেত।

ভারতচন্দ্র ছাড়াও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অন্যান্য কবিদের আলোচনা গ্রন্থকার এখানে করেছেন, যার মধ্যে রামপ্রসাদও রয়েছেন। ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদের রচনাতেও গ্রন্থকার শ্লীলতার অতিক্রমণ লক্ষ করেছেন। রামপ্রসাদের শাক্ত -গীতি গুলি সম্পর্কে আলোচনায় ধর্মীয় প্রসঙ্গই গ্রন্থকারের কাছে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ধর্মীয় প্রসঙ্গের পাশাপাশি উক্ত পদসমূহ থেকে তৎকালীন সামাজিক জীবনের ছবি অঙ্কনের প্রচেষ্টা বেশি যথার্থ হত। রামপ্রসাদের শাক্ত গীতির পাশাপাশি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর সন্ধিক্ষণে যে সমস্ত কবিওয়ালারা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় অধ্যায়ের শেষাংশে রয়েছে। এটা ঠিক যে মুসলিম শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসন কায়েমের গোড়ার দিকে বাংলায় একটা অস্থিরতার সূচনা হয়েছিল। রাজনৈতিক পালা বদলের পাশাপাশি দৈবনির্ভরতার প্রতিও সাধারণ মানুষ আর আস্থাবান থাকতে পারছিল না। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর স্থবির শ্রেণি মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য একটা প্রয়াস চলছিল। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছিল যে ভক্তি মার্গের মধ্যে দিয়ে সারা জীবন কাটানো অসম্ভব, কর্মযোগের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে উপলব্ধ হচ্ছিল, সোজা কথায় শ্রেণি মানস থেকে বেরিয়ে ব্যক্তি মানসের উন্মেষ ঘটছিল। সমাজ ও ব্যক্তির এমন অস্থিরতার প্রভাব সমকালীন লেখালেখির মধ্যে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এবং সেই প্রভাব কখনোই উপযুক্ত আদর্শের চেহারা নিয়ে আসবে

না, কারণ পরিবর্তনের প্রথম ধাপে স্থূল অর্থে সাময়িক বিকৃতিই স্বাভাবিক। সমাজ ও ব্যক্তির এই পরিবর্তনের স্বরূপকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে না পারলে সাহিত্যকে সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' - এর প্রথম ভাগের সাথে দ্বিতীয়ভাগের পরিকল্পনাও গ্রন্থকার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নবম অধ্যায়ের 'পরিশিষ্ট' অংশে তাঁর মূল্যবান ভাবনাকে সংযুক্ত করেছেন।

'প্রথমভাগ ইতিহাসে আমরা পদ্য সাহিত্যেরই আলোচনা করিলাম। গদ্য রচনার নমুনা একবারে না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহা একরূপ নগণ্য। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে আমরা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ দেখাইবার পূর্ব্বে যাহা কিছু প্রাচীন গদ্য রচনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত মনে করি, - সেই ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গদ্য রচনা গুলি নব সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।'[২১৪]

বঙ্গভাষার লেখক

১৩১৮ বঙ্গাব্দে হারানচন্দ্র রক্ষিতের 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য' বইটি প্রকাশের সময় গ্রন্থকার জানিয়েছিলেন -

'সতেরো বৎসর পূর্ব্বের 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় 'বাঙ্গালা ভাষার লেখক' রূপে এই গ্রন্থের ছাঁচ আছে। তিন বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, আকারাদি বর্ণানুক্রমে অনেক বঙ্গীয় লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঐ জন্মভূমিতে বিবৃত করিয়াছিলাম। আমার অদৃষ্টক্রমে তাহা আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল না, - অন্য এক মহাজন ঐ ভাবের আর একখানি গ্রন্থ প্রচার করিলেন।'[২১৫]

এই অন্য এক মহাজন সম্ভবত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের প্রণেতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গভাষার লেখক’ রচনাটির প্রথম প্রকাশ ’১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে।[২১৬] ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত যুগসাহিত্য সংস্করণে (প্রথমখন্ড) সম্পাদক জানিয়েছেন -

‘বঙ্গভাষার লেখক’ গ্রন্থটি বাঙলা ভাষায় সংকলিত ২১১ জন বাঙালী লেখকের এক সুবৃহৎ জীবনী গ্রন্থ। ১০০৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এত বড়ো জীবনী গ্রন্থ ইতোপূর্বে আর প্রকাশিত হয়নি। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে এবং ব্যয়ে হরিমোহন কর্তৃক এই গ্রন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হয়।’[২১৭]

‘বঙ্গভাষার লেখক’ গ্রন্থের প্রথমখন্ড সর্বমোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রথম দুটি পরিচ্ছেদই মূলত আমাদের আলোচ্য। প্রথম পরিচ্ছেদে বৈষ্ণব কবি ও চরিত সাহিত্য রচয়িতা সহ সর্বমোট চুয়াল্লিশ জন কবি আলোচিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ছত্রিশ জন কবি আলোচিত।

গ্রন্থের সূচি অংশ থেকেই স্পষ্ট যে, দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে গ্রন্থকার গ্রন্থের সূচনা করেন। গ্রন্থের শুরুতেই আলোচিত চন্ডীদাস। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের এই পরিকল্পনাটি কেবল সাহিত্যের নিরিখেই নয়, বরং গবেষণার নিরিখেও উল্লেখযোগ্য। নিজের দীর্ঘ পরিকল্পনা, প্রচুর তথ্য, এবং সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে কেবল মাত্র বক্তব্যের নির্যাসটুকু কি ভাবে নিজের লেখায় তুলে আনতে হয় তা তিনি দেখিয়েছেন। যুগবিভাজনের কোন রকম কূটতর্কে তিনি প্রবেশ করেন নি। ব্যক্তিগত আবেগ বা জাতি চেতনার কোন স্থান তাঁর লেখায় নেই। তাঁর একমুখী ভাবনা - চিন্তায় ছিল বাংলার প্রাচীন ও সমকালীন লেখকেরা, তাঁদের কথাই এসেছে তাঁর জীবনী লেখায়। ফলে কবিদের শিরোনামে ভূষিত করে বেশ কিছু নতুন কবি ও তথ্য তিনি আমাদের সামনে এনেছেন।

চন্ডীদাসের জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখের পর তাঁর রচনার পরিচয় আছে, তাও সংক্ষেপে। চন্ডীদাসের লেখা বিভিন্ন পর্যায়ের একটি বা দুটি পদেই চন্ডীদাসের

বিশেষত্বকে তুলে ধরেছেন তিনি। চন্ডীদাসের পরেই 'রামমণি' শিরোনামে আলাদা করে চন্ডীদাস - প্রেমিকাও আলোচিত। চন্ডীদাসের পাশে আলাদা করে তাঁকেও কবির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, এরপর বিদ্যাপতির আলোচনায় গ্রন্থকার চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে কোন রকম তুলনামূলক আলোচনার রাস্তায় যান নি, যা এই সময়ের লেখকদের একটি নিশ্চিত আলোচনার বিষয়। বিদ্যাপতি এবং পরবর্তী পদকর্তাদের বেশ কিছু পদের রাগ সহ উল্লেখ দৃষ্টি আকর্ষণকারী, যেমন - বিদ্যাপতির -

'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম, সুত - মিত -রমণী সমাজে।'[২১৮] - পদের উল্লেখ 'ধানশী' -র উল্লেখ, অথবা আরও একটি প্রচলিত পদ।

'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।'[২১৯] - পদের উল্লেখে রাগ 'বরাড়ী'-র উল্লেখ প্রশংসনীয়।

একেবারে ছোট ছোট আকারে পরিবেশিত লেখক পরিচিতি গুলির মধ্যে দিয়ে পূর্বজদের অভিমতকে যুক্তি বা আবেগ সহ কটাক্ষ বা নস্যাৎ করবার প্রবণতা নেই। একেবারে ছোট, কখনও তিন - চার লাইনেও কবি পরিচিতি পরিবেশিত। অনেক নতুন বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তাদের নাম এই রচনায় আমরা পেয়েছি। অগ্রজদের রচনার উল্লেখ ও এই রচনায় আমরা পাই। কোনরকম রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অনুষঙ্গের ছায়া লেখকের দীর্ঘ পরিকল্পনায় নেই। লালদাস বাবাজী ও তাঁর 'ভক্তমাল' গ্রন্থ প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচিত।[২২০] মাধবী দেবী ও কবিরূপে বিবেচিত ও আলোচিত হয়েছেন। প্রত্যেকটি লেখককে আলাদা করে পড়বার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ক্রম অনুসৃত হয়েছে। প্রথমে লেখকের জীবনী সংক্ষেপ, তারপর তাঁর রচনার উদাহরণ সহ উল্লেখ। কোন কোন লেখকের ক্ষেত্রে এই দুটি পর্যায়ের পরে 'পরিশিষ্ট' নামক একটি তৃতীয় পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। এই 'পরিশিষ্ট' অংশে রচয়িতার কাব্য বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত। সম্ভবত এই 'পরিশিষ্ট' অংশটি সম্পাদকের দ্বারা সংযোজিত।[২২১]

কবি রায়শেখরের ক্ষেত্রে এই 'পরিশিষ্ট' অংশের মূল কথা -

‘রায়শেখরে তিন শ্রেণীর পদ মেলে। গোবিন্দদাস অনুসৃত পদাবলী, সরল বাঙলায় বিকৃত মূলক পদ এবং ছন্দে হালকা পদ। তাঁর কাব্যে ছন্দের চাতুর্য, শব্দালঙ্কারের আড়ম্বর এবং শ্রুতিসুখকর ধ্বনি-ব্যঞ্জনা আস্বাদান করা যায়। আবার কোথাও কোথাও নিরাভরণ প্রকাশভঙ্গি বৈচিত্র্যে ও চিত্তাকর্ষক প্রায় মনোরম। তিনি প্রথম শ্রেণীর কবিকৃতিত্বের অধিকারী না হলেও তাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর সেরা কবিদের অন্যতম বলতেই হবে।’[২২২]

কবি লেখকদের আলোচনার ক্ষেত্রে সময়ের ক্রম মেনে চলা হয়নি। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর কবির পরে, অনায়াসে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি আলোচিত হয়েছেন। কবির আলোচনাই মুখ্য। তিনি কখন কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন বা কাব্য রচনা করেছেন সে কথা তাঁর সম্পর্কে আলোচনার সময় অবশ্যই আসবে বা এসেছে। কিন্তু একেবারেই সময়কে মানদন্ড বা কালদন্ড রূপে বিবেচনা করা হয়নি। লোচন দাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য -

‘কবিত্ব -সম্পদে চৈতন্যমঙ্গল, -চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’[২২৩]

কবিকঙ্কণের আলোচনায় এক নতুন দিকের প্রতি লেখক আলোকপাত করেছেন। পরলোকগত কাউয়েল সাহেবের হাতে কবিকঙ্কণ চন্ডীর যে ইংরেজি অনুবাদ হয়েছিল, সেই অনুবাদের, মূল সহ সংক্ষিপ্ত উল্লেখের নিদর্শন এখানে আছে।[২২৪] জয়গোপাল তর্কলঙ্কারকে আলাদা লেখক রূপে গণ্য করে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে আছে। পাশাপাশি কৃত্তিবাস ও কাশীরামের আলোচনায় জয়গোপালের কৃতকর্মের কিছু কিছু নমুনাও গ্রন্থকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

‘জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসী রামায়ণে যেমন গুণপনার একশেষ দেখাইয়াছেন, কাশীদাসী মহাভারতে ও তেমনি। প্রাচীন পুঁথির সহিত বটতলা প্রকাশিত মহাভারতের বিস্তর প্রভেদ। .....দৃষ্টান্ত,-

দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণনা,-

প্রাচীন পুথি,-

ভুজসম, ভুজঙ্গম, কি করিবে ভুল। সুরাসুরে, শোভা হরে, করের অঙ্গুল।।

.....

বটতলার মহাভারত, -

'ভুজসম, ভুজঙ্গম, মৃণাল জিনিয়া। সুরাসুর, মূর্চ্ছাতুর, যাহারে হেরিয়া।।'[২২৫]

মনসার ভাসান সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে কবিদ্বয়কে চিহ্নিত করেছেন গ্রন্থকার তাঁদের নাম 'ক্ষমানন্দ ও কেতকা দাস'। গ্রন্থকার অনুমান করেন যে মনসার ভাসান রচনায় -

'ক্ষমানন্দ, কেতকাদাসের সাহায্য গ্রহণ করেন।'[২২৬]

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের আলোচনায় কাব্যরসের তুলনায় জীবনী আলোচনা অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যদিও একথা ঠিক যে কবি বা লেখকের ব্যাকরণ সম্মত জীবনী গ্রন্থকার রচনা করতে চান নি। তিনি তাঁদের জীবনী ও সৃষ্টিকর্মের তথ্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই শেষ পর্যন্ত তুলে ধরতে চেয়েছেন।

ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য

হারানচন্দ্র রক্ষিতের (১৮৬৪-১৯২৬) 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য' রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে।[২২৭] রচনাটির 'মঙ্গলাচরণ' অংশে লেখক জানিয়েছেন -

'যে প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরীর পুণ্যস্মৃতি অবলম্বনে এই প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে, তাঁহার সম-সময়ে, তাঁহার শান্তিময় রাজত্বকালে, আমার এই মাতৃস্থানীয়া মাতৃভাষার মোহন বিকাশ। .....মূর্ত্তিমতী করুণা -দয়াময়ী ভিক্টোরিয়ার পুণ্যপ্রভাব, -আমার ভাষার বর্ণে বর্ণে সুচিত্রিত হইয়াছে এবং চিরদিন হইবে। আমার

ভাষা ও যেমন করুণাময়ী, আমার ভাষার পালন কর্ত্রী - জননী ভিক্টোরিয়াও তেমনি করুণাময়ী।'[২২৮]

মঙ্গলাচরণের এই অংশ, এবং নামকরণ স্মরণে রেখে রচনাটির 'সূচি' অংশটি যদি আমরা লক্ষ করি, তাহলে দেখব মূলত তার দুটি অংশ। প্রথমটি 'পূর্ব্বভাগ' -যেখানে বিদ্যাপতি থেকে শ্রীধর কথক পর্যন্ত আলোচিত, এবং দ্বিতীয়টি 'উত্তরভাগ' -যেখানে মিশনারী ও 'মৃত্যুঞ্জয়ী' বাঙ্গালা থেকে রবীন্দ্রনাথ, সংবাদপত্র, থিয়েটার পর্যন্ত আলোচিত।[২২৯] লক্ষণীয় 'পূর্ব্বভাগ' অংশটি। এখানে 'গানের যুগ' -এর আগে পর্যন্ত বিদ্যাপতি-ভারতচন্দ্র আলোচিত। এবং লেখকের রচনাটি পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি পূর্ব্বভাগে আলোচিত কবিদের রচনার একজন গুণমুগ্ধ। এখন প্রশ্ন হল, এই সময়ের ভাষার সৃজন ও বিকাশে রানী ভিক্টোরিয়ার তো কোনরকম অবদান ছিল না। তাহলে নামকরণে 'ভিক্টোরিয়া -যুগ' কথাটির উল্লেখ কেন? আর লেখক যদি দৃঢ়ভাবে উক্ত নামকরণেই প্রত্যয়ী থাকেন তাহলে 'পূর্ব্বভাগ'-এর আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। গ্রন্থের নামকরণ প্রকৃত পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর স্তাবকতা প্রিয় একশ্রেণির বাঙালির পরিচয় বহন করে।

'পূর্ব্বভাগ' অংশের প্রথমেই আলোচিত হয়েছেন বিদ্যাপতি। ধীরে ধীরে অন্যান্যরা। প্রত্যেক কবিদের শিরোনামাঙ্কিত করে গ্রন্থকার তাঁর আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'সূচনা' অংশে লেখক জানিয়েছেন -

'আমরা সর্ব্বজনমান্য বিদ্যাপতি -চন্ডীদাসের যুগ হইতে এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যুগ অর্থে আমরা কাল নির্দ্দেশ করিয়াছি,'[২৩০]

রামগতির লেখায় আমরা যেমন পরিষ্কার ভাষায় 'মধ্য'-এই শব্দটি পেয়েছিলাম, তেমনি পরিষ্কার ভাষায় 'যুগ' এই শব্দটি হারানচন্দ্র রক্ষিতের হাতেই প্রথম পেলাম। এই দুটি শব্দকে একত্র করেই সম্ভবত প্রথম 'মধ্যযুগ' শব্দটি ব্যবহার করেন সুকুমার সেন।

হারানচন্দ্রের লেখার নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন তাঁর প্রত্যেকটি লেখাই আয়তনে স্বল্প। প্রত্যেক কবি এবং তাঁদের কাব্য সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য গুলি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে অগ্রজদের ঋণস্বীকার ও লক্ষ করা যায় পাদটীকায়। যদিও ব্যক্তিগত আবেগকে তিনি একেবারেই বর্জন করতে পারেন নি। বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য -

'তাঁহার মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রেমের গাঢ়তা, -অসাধারণ লিপিকুশলতায় মিশিয়া তাঁহাকে সর্বোচ্চ আসন দান করিয়াছে।.....গীতি -কবিতার গভীরতার হিসাবে বিদ্যাপতির স্থান সকলের উচ্চে।'[২৩১]

হারানচন্দ্রের এই গ্রন্থে ইতিহাস রচনার কোন প্রয়াস নেই। সংক্ষেপে প্রকাশিত জীবনী - সাহিত্য গুলিকে পাঠক চাইলে ছোটগল্পের মত করেও পড়তে পারেন। ফলে নির্দিষ্ট গ্রন্থ গুলির কোন চুলচেরা বিশ্লেষণ নেই। ব্যক্তিগত পছন্দ - অপছন্দের নিরিখে বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস আলোচিত।

'চন্ডীদাসের ভক্তির গাঢ়তা, যেন বিদ্যাপতি হইতেও কিছু অধিক। অমলা, নির্ম্মলা, অহেতুকী যে ভক্তি তাহাই চন্ডীদাস লাভ করিয়াছিলেন। দারিদ্র্য-দুঃখেই তাঁহার এই ভগবদ্ভক্তির বিকাশ; সেই দুঃখের সহিত আবার রমণী - প্রেম জুটিয়াছিল, সুতরাং এ অংশে তাঁহার প্রেম- 'নিকষিত হেম' সন্দেহ নাই। ..... গভীর ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবার ক্ষমতায় ও অসাধারণ লিপি-কুশলতায়, -বিদ্যাপতি হইতে চন্ডীদাস এক সোপান নিম্নে অবস্থিত। .....বিদ্যাপতিতে প্রতিভা ও পান্ডিত্য দুই-ই ছিল, - চন্ডীদাসের শুধু প্রতিভা ছিল, পান্ডিত্য ছিল না।'[২৩২]

বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের পরে অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের ও চরিত সাহিত্য রচয়িতাদের সম্পর্কে ও তিনি খুব সংক্ষেপে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। এর পরই একত্রে আলোচিত হয়েছেন কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ। কৃত্তিবাসের সময় কাল ও তাঁর রচনার মৌলিকতা প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের মতামত -

'কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল, -১৪৩০ শক -রবিবার-বাসন্তী পঞ্চমী তিথি - বাণীপূজার শুভ মুহূর্ত্ত।'[২৩৩]

'মূল সংস্কৃত রামায়ণ হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ, - কবির মৌলিক কল্পনা -শক্তি ও স্বাধীন রচনা স্পৃহা। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ আপনাদের রচনার মধ্যে কোন নূতন বিষয় বা ভাব সন্নিবিষ্ট করিলেই যেন অধিক সুখী হন। আত্ম মনোভাব প্রকাশের এ আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক; তজ্জন্য কবিকে অপরাধী করিতে পারা যায় না। আসল কথা, সেই নূতন বিষয় বা ভাব, আলোচ্য ঘটনার সহিত কিরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহাই বিচার্য্য।'[২৩৪] যদিও কৃত্তিবাসের রামায়ণের 'ধর্ম্মভাব' -কেই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য দিয়েছেন গ্রন্থকার।[২৩৫]

কাব্যের উপাখ্যান ভাগের মৌলিকতার কারণে কৃত্তিবাসের থেকেও অগ্রণী ভূমিকা লেখকের দৃষ্টিতে পালন করেছেন কবিকঙ্কণ।[২৩৬] কৃত্তিবাস বা কবিকঙ্কণ বা আরও পরে রামপ্রসাদ -এঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কে হারানচন্দ্রের অগ্রজরা যে সমালোচনা গুলি করেছিলেন, তার মধ্যে যে যে স্থানে হারানচন্দ্রের ব্যক্তিগত আপত্তি রয়েছে, সেই আপত্তির জায়গাগুলিও তাঁর লেখায় এসেছে। কৃত্তিবাসের কাব্যে মৌলিকতা প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করেছি। কবিকঙ্কণ প্রসঙ্গে ও তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য -

'দেশহিতৈষিতা, স্বদেশপ্রিয়তা -এ সব খাঁটী ইউরোপীয় ভাব; -কৃত্তিবাস-কবিকঙ্কণের যুগে, এমন ভাব, কোন ভক্ত কবির হৃদয় উদ্ভূত হওয়া একরূপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। ভক্তের ভালবাসার কেন্দ্র, - সমগ্র মানব মন্ডলী, সমগ্র জীব- জগৎ; - ব্রহ্মান্ডের তাবৎ প্রাণীকেই প্রীতির চোখে দেখাই তাঁহার ধর্ম্ম। তাঁহার নিকট স্বদেশ বিদেশ, স্বজাতি বিজাতীর কোন ভেদনীতি নাই।'[২৩৭]

'কালকেতুর উপাখ্যানে বা শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল যাত্রা বর্ণনে, কবির কোনরূপ রাজনৈতিক অভিসন্ধি (Political motive) ছিল না'।[২৩৮]

কবিকঙ্কণের চন্ডীমঙ্গলের ভাল-খারাপ উভয় দিকই লেখকের লেখায় উঠে এসেছে।

কাশীরাম দাসের মহাভারত আলোচনার প্রসঙ্গে 'ধর্ম্মমঙ্গল', 'শিবায়ন' 'মনসার ভাসান' ইত্যাদিও আলোচিত। মহাভারতের প্রাচীন কবির শিরোপা গ্রন্থকার 'বিজয় পন্ডিত' -কে দিয়েছেন।[২৩৯] মহাভারত ছাড়াও কাশীরাম দাসের 'স্বপ্নপর্ব্ব', 'জলপর্ব্ব', 'নলোপাখ্যান', নামক কাব্যত্রয়কে কবির অপরিণত বয়সের কম সাহিত্যিক মূল্য যুক্ত লেখা রূপে বিবেচিত করেছেন গ্রন্থকার।[২৪০] রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে 'শিবায়ন' ছাড়াও 'সত্যপীর' গ্রন্থের প্রণেতা রূপে এবং 'কেতকানন্দ' ও 'ক্ষেমানন্দ' নামক দুই আলাদা ব্যক্তি একত্রে যে 'মনসার ভাসান' রচনা করেন[২৪১] সেই তথ্যও গ্রন্থকার আমাদের দিয়েছেন।

একজন ভক্তের দৃষ্টিতে রামপ্রসাদ আলোচিত হওয়ায় অন্যান্য রামপ্রসাদ আলোচকদের থেকে একটু অন্যভাবে প্রচুর উদাহরণ ও উপমা যোগে রামপ্রসাদকে এখানে আমরা পেয়েছি। রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণকে একযোগে পাঠের উদাহরণ সম্ভবত এখানেই প্রথম।

'বঙ্গসাহিত্যের এক প্রান্তে শ্রীরামপ্রসাদ আর প্রান্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব -মধ্যে যেন একটি নদী ব্যবধান। সে নদী - বৈতরণী। সাহিত্য ধর্ম্মের সহায়ে যিনি পারে যাইবার আশা রাখেন, - আত্মার স্ফূর্তি ও আত্মোন্নতির জন্য উদ্‌গ্রীব হন, তাঁহাকে এই দুই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইতে হইবে।'[২৪২]

প্রবাদ আছে যে কালী স্বয়ং কন্যারূপে এসে রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। এই প্রবাদকে দীনেশচন্দ্র সেন কটাক্ষ করেছিলেন। সেই কটাক্ষের জবাব স্বরূপ হারানচন্দ্র যা জানিয়েছেন তা দীনেশচন্দ্রের পক্ষে খুব বেশি সম্মান বা উৎসাহ বৃদ্ধিকর নয়। দীনেশ সেনের বক্তব্য উদ্ধৃত করবার পর গ্রন্থকারের জবাব -

'কিন্তু কথাটা কি ঠিক? বিজ্ঞ ও সুধিজনোচিত মন্তব্য কি এই? সকলেই আপন আপন বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী কাজ করিতে পৃথিবীতে আসে; কাজ করিয়া চলিয়া যায়। 'কালী কন্যারূপে প্রসাদের বেড়া বাঁধিয়া যে দেন নাই, দীনেশ বাবু ইহা জানিলেন

কিরূপে? কালী নাম গান করিতে করিতে যে প্রসাদের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া তনুত্যাগ হয় নাই' - তাহাই বা তিনি অবগত হইলেন কোন্ উপায়ে? মা - অন্নপূর্ণা যে প্রচ্ছন্নবেশে তাঁহার সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া তাঁহার মন্ডপে কিছু লিখিয়া রাখিয়া যান নাই, - এ ধারণাই বা তাঁহার কি হেতু হইল? তিনি যাহা অবিশ্বাস করিতেছেন এবং অন্ধবিশ্বাস বলিয়া তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, আর একজনের পক্ষে ত তাহা ধ্রুব সত্য ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিরূপে গণ্য হইতে পারে?'[২৪৩]

ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সমালোচকদের প্রতিবাদই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। তবে 'বিদ্যাসুন্দর' ছাড়া 'অন্নদামঙ্গল' - এর উল্লেখ, উল্লেখযোগ্য।

'বাঙ্গালী চিরদিন গৌরবের সহিত ভারতের নামগ্রহণ করিবে, এবং অন্নদামঙ্গলের ন্যায় মহাকাব্য যে তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া সেই মহাকবির চরণে বার বার মস্তক অবনত করিতে হইবে - তা অক্ষয় বাবু, রমেশ বাবু বা দীনেশ বাবুর ন্যায় লেখক যতই তার যশোপ্রভা মলিন করিবার চেষ্টা পান।'[২৪৪]

পরিশেষে গ্রন্থকারের প্রত্যয়ী উক্তি -

'আমাদের সমসাময়িক সমালোচকবৃন্দের অবিচার পূর্ণ একদেশদর্শী সমালোচনার আংশিক প্রতিবাদ করিয়া একটু সান্ত্বনা লাভ করিলাম।'[২৪৫]

'পূর্ব্বভাগ' নামক অংশের পরিসমাপ্তি ঘটেছে 'গানের যুগ', 'কবির গান', 'শ্রীধর কথক' প্রমুখদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে।

HISTORY OF BENGALI LANGUAGE AND LITERATURE

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -ছাড়া দীনেশচন্দ্র সেনের সাহিত্যের ইতিহাস কেন্দ্রিক আরও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, 'History of Bengali Language and

Literature'. এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে।[২৪৬] বলাবাহুল্য এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজি বইটির 'Preface' অংশে গ্রন্থকার যা জানিয়েছেন, তথ্যের নিরিখে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

'This work consists of the lectures delivered by me as Reader in Bengali Language and Literature to the Calcutta University during the months of January to April 1909, at the Senate House, Calcutta. They treat of our language and literature from the earliest times down to 1850.

.....There must, of course, be something in common between the two books, dealing as they do with the same subject, but the arrangement adopted in the present work is altogether new, and the latest facts, not anticipated in my Bengali treatise, have been incorporated in it.'[১৪৭]

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' - এর প্রথম প্রকাশ রূপের সাথে এই বইটির আংশিক বিষয় গত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও তথ্যগত দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক, যদিও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর পরবর্তী সংস্করণ গুলির সাথে তথ্যগত মিল লক্ষ করা যায়।

নিজের আদ্যোপান্ত ইংরেজি বক্তৃতার সমাহারকে বক্তা দুই মলাটের মধ্যে আবদ্ধ করবার ক্ষেত্রে বিষয়ের নিরিখে তাকে কতগুলি পর্যায়ভুক্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে বাংলা ভাষা এবং ভাষার প্রাচীনত্বের ওপর সেই সময়ের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। মূলত দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই তাঁর যুগ বিভাজনের চিন্তা-ভাবনা

সুদৃঢ় হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়কে তিনি 'Pre Mahomedan Literature' -নামে অভিহিত করেছেন। ১৮৯৬ সালে ঠিক যে কাজটি দীনেশচন্দ্র সেন করেছিলেন, ১৯১১ সালে এসেও তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা গেল। তিনি কোন ভাবেই সাহিত্যকে বৌদ্ধ - মুসলিম-হিন্দু ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধ্বে উঠে বিবেচনা করতে পারেন নি। আমরা একবারও দীনেশচন্দ্র সেনের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা, সে সম্পর্কে অন্বেষণ, গবেষণা ইত্যাদি আবেগকে অশ্রদ্ধা পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে চাইছি না, তাঁর কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের জায়গায় তিনি একনিষ্ঠ এবং সম্মানযোগ্য। কিন্তু এর পাশাপাশি যেখানে যেখানে আমরা আমাদের মত করে তাঁর ভাবনা -চিন্তার সীমাবদ্ধতা দেখতে পেয়েছি, সেই জায়গাগুলি ও আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মুসলিম সম্প্রদায়কে মানদন্ড রূপে বিবেচিত করে সাহিত্যকে মুসলমান পূর্ববর্তী বা মুসলমান পরবর্তী - এমন ভাবনা আপত্তিকর। সাহিত্যের চলমান প্রবাহে মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর অবদান ও আনুগত্য প্রদর্শন থাকতে পারে, তাই বলে সাহিত্য কখনোই তাঁদের দাসত্ব স্বীকার করে নি।

দ্বিতীয় যে অধ্যায়ের নাম Pre - Mahomedan Literature, সেই অধ্যায়কে গ্রন্থকার মোট আট ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল -

1) Aphorisms and wise -sayings, -Dak and Khana.

2) Dharma -cult - a form of Buddhism.

3) Ramai Pandit and his Cunya Purana.

4) Sahajia -cult and its exponents.

5) Dharma - mangal poems and the story related in them.

6) The ballads of the pal kings.

7) The Caiva-cult, how it faced Buddhism.

8) Genealogical records.[২৪৮]

প্রথম ভাগে ডাকের বচন প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য -

'Referring to the earliest literature of Bengal, which bears the stamp of Buddhistic influence, we light upon Dakarnava, -a Tantrik work of the Buddhists, containing aphorisms and wise sayings in old Bengali regarding agriculture, astrology, medicine and other matters of interest of domestic life.'[২৪৯]

তাঁর এই বক্তব্যের সূত্রেই তিনি উদ্ধৃত করেছেন ডাকের একটি প্রচলিত ছড়া -

‘ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকারে তুলিয়া না থোব।
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খন্ডাব রোগ।।
বলে ডাক এই সংসার।
আপন মইলে কিসের আর।।’[২৫০] -

এবং; 'This is quite an un - Hindu idea.'[২৫১]

আমরা সত্যিই জানি না যে, এমন নিশ্চিত বিশ্বাস গ্রন্থকার কোথা থেকে পেয়েছিলেন। কেবলমাত্র অহিন্দু সম্প্রদায়ই এমন ভাবনা চিন্তা করতেন, হিন্দুরা করতেন না -এমন তথ্য দীনেশচন্দ্র সেন কোথা থেকে পেয়েছেন তার উল্লেখও করেন নি। ব্যক্তি ভেদে ভাবনা চিন্তার পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু তাকে সমষ্টি বা সম্প্রদায়ের ওপর আরেপ করবার আগে আরও উপযুক্ত ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন। কারণ যে সময় নিয়ে গ্রন্থকার আলোচনা করছেন, সেই সময় বা সময়ের মানুষদের তিনি সামনে প্রত্যক্ষ করছেন না। কিছু সামান্য প্রমাণ এবং অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই সম্ভবত

তিনি একথা বলেছেন। যদিও ডাক ও খনার বচনের সত্ত্বাধিকারী রূপে কৃতিত্ব এক ব্যক্তির না ব্যক্তিবর্গের প্রাপ্য তা ভিন্ন আলোচনার বিষয়।

ধর্মঠাকুর এবং তাঁর সাথে বৌদ্ধ ধর্মের ও সম্প্রদায়ের সাযুজ্য নিয়ে সম্ভবত দীনেশচন্দ্র সেনই আমাদের সর্বপ্রথম এত বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন, এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর সমস্ত যুক্তি পুরোপুরি অস্বীকার করবার মত নয়, বরং সেগুলি আমাদের ভাবনা - চিন্তার পর্যায়ে নিয়ে যায়।

'The Hadis, Domas and other low caste people are the priests in many of the Dharma Temples. The Doma Pandits at one time occupied a prominent position in the Buddhistic temples, and when Buddhism was driven away from this country, all religious functions in many of these Dharma temples, still continued to be discharged by the descendants of the Doma priests, as the Hindus dared not oust a priestly class, revered by the people, from their duties in temples.'[২৫২]

'History of Bengali Language and Literature' -গ্রন্থটি সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষায় পরিকল্পিত ও লিখিত। কোথাও কোথাও উদ্ধৃতি বা বক্তব্যের প্রয়োজনে বাংলা ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, একটি নতুন দিকের সংযোজনে। প্রায় অধিকাংশ অনুচ্ছেদের পাশেই সংক্ষেপে ইংরেজি ভাষায় সেই অনুচ্ছেদের একটি সংক্ষিপ্তসার দু-চার শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা এই দীর্ঘ বক্তৃতা মালার সংকলন না পড়ে, কেবল সংক্ষিপ্তসার গুলি পড়লেও গ্রন্থকারের ভাবনা চিন্তার একটি রূপরেখা সম্পর্কে মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। রামাই পন্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’ এবং ধর্মঠাকুর সম্পর্কে গ্রন্থকারের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হল -

"Dharma comes as a Muhammadan to punish the Brahmins.'[২৫৩] কিন্তু এই সংক্ষিপ্তসারের যে দীর্ঘ ব্যাখ্যা অনুচ্ছেদ আকারে রয়েছে তা পড়ে তার সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্দেহ হয়, পাশাপাশি এই ধারণা যে অতি কাল্পনাশ্রয়ী সে কথাও মনে হয়।

প্রাক্ মুসলিম শাসন পর্বের সাহিত্যের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন চন্ডীদাসও। তবে কবি চন্ডীদাসের আলোচনা এক্ষেত্রে মুখ্য নয়, চন্ডীদাস এই পর্যায়ে আলোচিত হয়েছেন মূলত সহজিয়া ভাবধারার পরিপোষক রূপে। গ্রন্থকার, বৌদ্ধদের সহজিয়া দর্শনকে চন্ডীদাসের পদাবলির সাথে মিলিয়ে পড়বার চেষ্টা করেছেন। এমন পরিশ্রমী প্রয়াস প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কোন 'সহজ' বিষয়কেই সহজ এবং হালকা ভাবে উপভোগ করা যায়। সমস্ত 'সহজ' -কেই দার্শনিক তত্ত্বের বিচারে বিবেচনা করলে তার রসহানি ঘটে। তাই পদাবলির চন্ডীদাসের নির্বাচিত পদকে বৌদ্ধ দার্শনিকতার আধারে বিচার আমরা মানতে পারি নি এবং এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের যুক্তি গুলি ও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারে নি। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রাচীন কবি রূপে গ্রন্থকার ময়ূর ভট্টের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর কবি বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫৪] একই সঙ্গে মাণিকচাঁদের গানকেও প্রাক্ মুসলিম সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে, তাকে একাদশ শতাব্দীর সাহিত্য রূপে চিহ্নিত করেছেন।[২৫৫]

এই অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থকার একটি 'Supplementary Notes'[২৫৬] বা 'পরিশিষ্ট' সংযোজিত করেছেন। এবং কেবল এই অধ্যায়ের শেষেই নয়, এই বইয়ের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই এমন দীর্ঘ পরিশিষ্টের সংযোজন লক্ষ করা যায়। ১৮৯৬ -এ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর অধ্যায় বিভাজনে এমন প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্টের সংযোজন হয় নি, যা পরবর্তীকালে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর পরবর্তী সংস্করণ গুলিতে লক্ষ করা যায়। এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টের শুরুতেই দীনেশচন্দ্র সেন যা বলেছেন তার ওপর ভিত্তি করেই পুরো পরিশিষ্ট অংশটি আলোচিত।

'The Bengali language was Known to our early writers as a form of Prakrita. The name Vanga Bhasa is of recent origin. They called it Prakrita or merely Bhasa.'[২৫৭]

বাংলা ভাষার প্রাকৃত থেকে উদ্ভব, এবং সেই ভাষার ব্যাকরণগত রূপই এই অংশের মূল আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এর সাথে প্রাক্ 'মুসলিম পর্বের' সংযোগ কোথায় তা সঠিক ভাবে বোঝা সম্ভব হয় নি। তবে এটুকু অবশ্যই বোঝা যায় যে, দীনেশচন্দ্রের সমসময়ে সমাজে মুসলমান সম্প্রদায়কে নিয়ে চর্চার একটি আবহ তৈরি ছিল। কিন্তু সেই আবহকেই কেন বাংলা সাহিত্যের মানদন্ড স্বরূপ বিচার করা হল, তার স্পষ্ট উত্তর কোথাও পাওয়া যায় নি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলাদা করে কোন বিশেষ নাম নেই এই অধ্যায়ে মূলত আলোচিত হয়েছেন চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এবং তাঁদের নামানুসারেই অধ্যায়ের নামকরণ। এই উভয় কবি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের অনুমান লেখকের বক্তব্যের মূল উপাদান ছিল কবিদ্বয়ের লিখিত পদ এবং তাঁদের সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তী। পাশাপাশি একজন পাঠক ও গবেষকের মনন ও মেধা নিয়ে গ্রন্থকার এই কবিদ্বয়ের রচনাকে পাঠ করেছেন, তা তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী দক্ষতায় প্রমাণিত। চন্ডীদাসের একটি পদ উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার তাঁর পদসমূহ সম্পর্কে জানিয়েছেন -

'বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস ইহ পরিমাণ।।'[২৫৮]

'From a reference given in one of Chandi Das's poems, it appears that before 1403 A.D. he had composed 996 songs.'[২৫৯]

চন্ডীদাসের রাধা ও কৃষ্ণের স্বরূপ দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে এই ভাবে -

'Krisna is the Divine Incarnation worshipped by the Vaisnavas. He is represented as having a dark blue complexion. Dark blue suggests the predominating colour of the universe. We find it in the azure, in sky and ocean. in distant landscapes and in the immense verdure of pastoral meadows. On the head of Krisna is a crown of flowers and a plume of peacock's feathers reminding us of the rainbow. This symbolizes the various colours which adorn the main dark-blue pervading the earth and the sky. He has a flute in his hand, and when he plays on it, the very Jumna bends out of her course signifying that with a person who has heard the call of his God, the result is irrestible. the course of his life is sure to change. The human soul is symbolized in Radha, the soul that, with its five finer senses, becomes instinct with new life, the moment God appears to it in all His glory.'[২৬০]

বিদ্যাপতি সম্পর্কে গ্রন্থকার সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। বিদ্যাপতির পারিবারিক জীবন, পদাবলি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইত্যাদির পাশাপাশি বিদ্যাপতির সংস্কৃত রচনার একটি তালিকা গ্রন্থকার দিয়েছেন যা তথ্যের নিরিখে উপযোগী।

'(1) Purusa Pariksa. (2) Caiva Sarvaswasara. (3) Dana Vakyavali. (4) Vivadasara. (5) Gaya Pattan. (6) Ganga Viksyavali, (7) Durga Bhakti Tarangini. (8) Kirtilata.'[২৬১]

চতুর্থ অধ্যায়ে এসে গ্রন্থকার এই অধ্যায়কে 'The Pouranik Renaissance' বা 'পুরাণের নবজাগরণ' নামে চিহ্নিত করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, আগের দুটি অধ্যায়কে গ্রন্থকার 'প্রাক - মুসলিম সাহিত্য', এবং 'বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস' এই নামে অভিহিত করেছেন। এই নামগুলিকে খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে, সাহিত্যকে নির্দিষ্ট মানদন্ডে বিভাজনের পদ্ধতি নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন রীতিমতো চিন্তিত ছিলেন। কোন একটি মানদন্ডকে তিনি পুরোপুরি মেনে নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে পারেন নি। যুগবিভাজনের ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা-চিন্তায় যে দোলাচলতা লক্ষ করা যায়, তা কেবল তাঁর নিজের নয়, বরং সেই সময়েরও পরিচয় বহনকারী। সাহিত্যকে যুগ বিভাজনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু নিজেদের অবস্থান সঠিক ভাবে বুঝে তার প্রেক্ষিতে যুগবিভাজনের পরিকল্পনা হয় নি। সেই কারণে ব্যক্তিভেদে বা সময় ভেদে, একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

একথা অস্বীকার করবার কোন জায়গা নেই যে, এই অধ্যায়ে মূলত যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার নিরিখে এই অধ্যায়ের নামকরণ অনেকটা উপযোগী। সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ, বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবীদের নিয়ে লিখিত কাব্যসমূহ, পাশাপাশি ধর্মঠাকুর, দক্ষিণ রায়ের আলোচনাও রয়েছে। রামায়ণ নিয়ে আলোচনায় প্রধান অনুবাদকদের পাশাপাশি অপ্রধান অনুবাদকদের প্রসঙ্গও এসেছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস।

'Of the other translators of the Ramayana, we must first name Sastivara Sen who was born at Jhinardwipa, the modern Jhinerdi in Vikrampur in the district of Dacca. He

belonged to the Vaidya or physician caste and lived more than three hundred years ago. Sastivara and his son Gangadas were voluminous writers. The son completed what the father had left unfinished. They translated not only the Ramayana but also the Mahabharata.'[২৬২]

এঁদের পাশাপাশি, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত অনুবাদ ও প্রায় ৪৬ টির (ছেচল্লিশ) বেশি কাব্যের রচয়িতা রূপে কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখ যোগ্য।[২৬৩]

মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশীরাম দাস। 'আদিপর্ব', 'সভাপর্ব', 'বনপর্ব', ও 'বিরাটপর্ব', পর্যন্ত কাশীরাম অনুবাদ করেছিলেন এমন তথ্য জানা সত্ত্বেও[২৬৪] গ্রন্থকার তাঁর অনুবাদের গুণাগুণ সম্পর্কে জানিয়েছেন -

'He introduces episodes not to be found in the original Mahabharata, nor in any extant translation earlier than his own; and it is mainly in these additions that he displays the peculiar traits of his poetry. Kaciram Das was a poet of the people. Indeed his education, scope of intelligence and mode of treatment of his subjects were all such as to meet the requirements of the masses.'[২৬৫]

কাশীরাম দাস সহ, সঞ্জয়ের মহাভারত থেকে শুরু করে রাজা ধর্মমাণিক্যের মহাভারত পর্যন্ত মোট একত্রিশজন অনুবাদকের একটি তালিকা গ্রন্থকার দিয়েছেন।[২৬৬] রামায়ণের এবং রামায়ণ কেন্দ্রিক আলাদা আলাদা কিছু অনুবাদের সংক্ষিপ্ত তালিকারও লেখক সংযোজন করেছেন।[২৬৭] যুগবিভাজনের ক্ষেত্রে ভাবনা - চিন্তাগত সীমাবদ্ধতা থাকলে ও প্রাচীন সাহিত্যের বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় দীনেশচন্দ্র সেনের নিজস্ব Style এবং

Pattern ছিল এবং এই জায়গায় তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। বাঙালি পাঠকদের, গবেষকদের কি ভাবে লেখাপড়া করতে হয় তার দিশা তিনি দেখিয়েছেন।

রামায়ণ, মহাভারতের পাশাপাশি ভাগবত অনুবাদকদের একটি তালিকাও গ্রন্থকার দিয়েছেন।[২৬৮] বলাবাহুল্য রামায়ণ, মহাভারতের প্রবল জনপ্রিয়তার পাশে ভাগবতের জনপ্রিয়তা কেবল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই (বৈষ্ণবদের মধ্যে) সীমাবদ্ধ ছিল। অধ্যায়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ অংশে এসে গ্রন্থকার শিব ও শক্তি 'Cult' এবং তার পুনর্বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'শক্তি Cult' আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিক প্রধান ও অপ্রধান দেবীদের কথা এসেছে। এখন ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে শিব-শক্তি তত্ত্বের ইতিহাসও যদি সংযুক্ত হয়, তাহলে এক সাথে এত ইতিহাসকে মিলিয়ে পড়তে সমস্যা হয়। এই সমস্যাটি হয়ত দীনেশচন্দ্র সেনের হয়নি, কিন্তু সাধারণ পাঠকদের হয়েছে এবং হচ্ছে। এটা ঠিক যে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে অনেক প্রসঙ্গই আলোচিত হবে। কিন্তু সেই প্রত্যেকটি প্রসঙ্গই একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় আলোচিত হলে ভাল। তা না হলে অনেক সময় সাধারণ পাঠকদের অন্তত মূল বিষয় থেকে বিচ্যুত হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হওয়ার গ্রন্থের কলেবরও এত বৃদ্ধি পায় যে এই বিচ্যুতি স্বাভাবিক। আবার শিবের ধারণার আলোচনায়, হঠাৎ করে আগমনী পর্যায়ের সঙ্গীতের আলোচনায় বিষয়গুলিকে একসাথে মিলিয়ে পড়াটা অসুবিধাজনক, যদিও পরবর্তীক্ষেত্রে রামপ্রসাদ সহ অন্যান্য কবিদের কথা আমরা পাচ্ছি। প্রায় একই সমস্যা 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের ক্ষেত্রেও। আগের অধ্যায়ে ধর্ম ঠাকুর প্রসঙ্গে বেশ কিছু আলোচনার পর এই অধ্যায়ে এসে আমরা আবার তাঁর কথা পাচ্ছি। ফলে আগের অধ্যায়ের রেশ টেনে এনে আবার এই অধ্যায়ে খুঁজে খুঁজে ধর্ম ঠাকুরের প্রসঙ্গ মিলিয়ে পড়া এবং বোঝা বেশ কঠিন। সম্ভবত গ্রন্থকারের বুঝতে অসুবিধে হয়েছিল যে, আমাদের 'জানার জগতের' সমস্তটা জানানোর জায়গা একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা গ্রন্থ নয়। আমরা যা যা জানি, তার থেকে

কেটে ছেঁটে প্রয়োজনীয় অংশটুকু জানালেই 'ক্ষেত্র'-র বা 'গ্রন্থের' সম্পূর্ণতা ঘটে, এবং এর অন্যথায় অসুবিধের সৃষ্টি হয়।

লক্ষ্মীদেবীর প্রসঙ্গে আলোচনায় গ্রন্থকারের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রশংসনীয়, যদিও এটি পুরোপুরি মানতে অসুবিধে হয় -

'In the Ramayana we find the description of a golden image of Laksmi with two elephants on either side pouring water over her head in the Acoka-Banika of Ravana. The goddess in that particular form and position is Known here as Gaja Laksmi, and after more than two thousand years, the Jaypur sculptors still make images of the goddess exactly answering the description of the Ramayana. The goddess Laksmi or Cri was one of the most familiar deities worshipped by the Buddhists. On the door-way of many Buddhist temples the image of this goddess is found in a prominent position curved in basrelief. It is curious to observe, that a class of rural Muhammedan folk of Bengal have, for their sole occupation, the reciting of hymns in Bengali in honour of Laksmi - Devi.'[২৬৯]

পাশাপাশি বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়, বা সূর্য দেবতাকে নিয়ে লিখিত কাব্যের প্রসঙ্গও সংক্ষেপে রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বৈষ্ণব সাহিত্য, চৈতন্য এবং চৈতন্যকেন্দ্রিক অন্যান্য রচনা। এই অধ্যায়ের পরিকল্পনাকে স্মরণে রেখেই সম্ভবত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর পরবর্তী সংস্করণে চৈতন্য এবং বৈষ্ণবীয় সাহিত্য কেন্দ্রিক অধ্যায়ের

আলোচনা হয়েছিল অথবা উল্টোটাও হতে পারে। এই অধ্যায়কে গ্রন্থকার 'The Literature of the Vaisnavas' নামে চিহ্নিত করেছেন। এই অধ্যায়ে এসে আবার ধর্মীয় প্রসঙ্গই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে দোলাচলতা লক্ষণীয়। যে বিষয় গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে কেবল ধর্মীয় প্রসঙ্গ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য বিষয় রয়েছে। যেমন - গোবিন্দ দাসের 'কড়চা'-র 'Descriptions of Nature',[২৭০] অথবা জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর 'A page of old history'[২৭১] - কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে, এই বিষয় গুলির নিরিখেও তো একটি রচনাকে দেখা যায়। অন্তত গ্রন্থকার নিজেই সংক্ষেপে হলে ও তার দিশা দেখিয়েছেন। 'পরিশিষ্ট' অংশে কীর্তন এবং কথক প্রসঙ্গে আলোচনা করে গ্রন্থকার অনেকগুলি দিক ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছেন। এই অংশের একেবারে শুরুতে চৈতন্য প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে কথা জানিয়েছেন তা যে কোন ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে চৈতন্য সম্পর্কে শেষ কথা -

'Chaitanya Deva himself was not the organiser of the Vaisnava community that afterwards sprang up in Bengal. In fact it was not his mission to make codes and regulations for the guidance of a small community. He spoke for all men, lived for all men, and lost in the love of God as he was, he was not at all actuated by any desire of a secular Kind, to establish a community and claim the glory of being its founder. But a great idea - the idea of equality and freedom- was put into a stereotyped and orthodox society.'[২৭২]

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নামকরণ গ্রন্থকার করেছেন 'The Post -Chaitanya Literature.'[২৭৩] এখন সাহিত্য যদি 'Post Chaitanya' হয় অর্থাৎ চৈতন্য

পরবর্তী হয়, তাহলে নিশ্চয়ই চৈতন্য পূর্ববর্তী বা 'Pre-Chaitanya' ও হবে। কিন্তু এই গ্রন্থে সাহিত্যের 'Pre-Chaitanya' বিভাজন নেই। কেবল 'Post Chaitanya' -আছে। লেখক কেন এমন বিভাজন পদ্ধতি নির্বাচন করেছেন তার কোন কারণ ব্যাখ্যা করেন নি। সাহিত্য পাঠের মানদন্ড স্বরূপ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিই কেন নির্বাচিত হবেন, উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা না করবার জন্য তার উত্তরও অধরাই রয়ে গেছে। বলাবাহুল্য যুগ বিভাজন বা সাহিত্যের কালদন্ড বিভাজনের বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন পরিকল্পনাহীন ভাবে সচেতন ছিলেন।

এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার যে সমস্ত সাহিত্য -সাহিত্যিক, তাঁদের ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি আলাওল। ১৮৯৬ -এ তিনি একই কবি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু প্রায় পনেরো বছরে গ্রন্থকারের ভাবনা -চিন্তার বিস্তৃতি ঘটেছে, যার প্রতিফলন এই অধ্যায়ে দেখা যায়। লক্ষণীয় বিষয় হল আলাওল প্রসঙ্গে এখানে লেখক জানাচ্ছেন - 'The Mahamedan poet who heralded the new age'.[২৭৪] 'New age' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ করলে হয় ‘নতুন কাল’, বা ‘নতুন যুগ’ বা ‘আধুনিক যুগ’, বা একই অর্থে ব্যবহৃত অন্য কোন নতুন শব্দ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আলাওলের লেখায় তিনি নতুন যুগ বা আধুনিক যুগের সন্ধান পেয়েছেন তা খুবই ভালো বিষয়। কিন্তু আলাওলের আগে পর্যন্ত যে সমস্ত লেখাপত্রের খোঁজ লেখক আমাদের জানাচ্ছেন এবং তার বিশ্লেষণ করছেন, তার কোথাও কি আধুনিকতার ছোঁয়া নেই? অন্তত লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করলে বোঝা যায় যে আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এমন নির্দিষ্ট কোন বিশেষণ তিনি ব্যবহার করেন নি। 'Age' শব্দটির মধ্যে দিয়ে কি ‘সময়’ -এর কাছাকাছি পৌঁছাতে চাইছিলেন লেখক? ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আর সাহিত্যকে পুরো পরিমাপ করা যাচ্ছে না, তখনই কি পূর্বসূরী রামগতি ন্যায়রত্নের হাত ধরতে

চাইছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন ? অন্তত 'Age' শব্দটির ব্যবহারে তার একটা ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি তৎকালীন বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার এমন অনেক নতুন বিষয় সামনে এনেছেন যা এর আগে সাহিত্য পর্যালোচনায় উল্লেখিত হয় নি। যেমন, ঢাকার রাজা 'রাজাবল্লভ' এবং তাঁর সমসাময়িক কবি জয়নারায়ণ সেন, আনন্দময়ী দেবীর উল্লেখ। অত্যন্ত সংক্ষেপে 'Poetry of rural Bengal' - এর আলোচনা হলেও, এই বিষয়ের সংযোজন প্রশংসনীয়। কিন্তু তথাকথিত শহরের এবং গ্রামের কবিতাকে তিনি আবার হিন্দু - অহিন্দু নামক অদ্ভুত দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত করেছেন।

'.....non - Hindu ideas found favour with the citizens directly under the influence of an alien civilisation But the quiet Hindu was not in his element in the city. His true home lay in the village; there, under the canopy of the blue sky, on which the gay seasons of our tropical clime present in succession their evershifting array of scenes, the Hindu had found leisure for centuries to ponder over the deeper problems of life.'[২৭৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যে কবিওয়ালাদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের ও আলোচনা এই অধ্যায়ে রয়েছে। সমসময়ে লেখ্য সাহিত্যের পাশাপাশি যে মৌখিক সাহিত্যের প্রচলন ও ছিল, দীনেশ সেনের কাছেই তার প্রথম পরিচয় আমরা পাই।

'Lately Babu Daksina Ranjana Mitra Mazumdar has published two volumes of folk tales in Bengali. He has attempted to reproduce them in the very language of the

rustic women from whom he collected them. In some cases he recorded the stories by a phonograph at the time they were delivered; so that their language remains remarkably faithful to the narration of the villagers. .....the dialect spoken in the country five hundred years ago, of which specimens are to be found in the written literature of the period remains unchanged in the colloquial language of our backward villages, not subjected to the influences of the outside world;[২৭৬]

বাংলার গ্রামীণ লোক জীবনে দীর্ঘদিন পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের ভাবনা-চিন্তা, আচার - আচরণ ইত্যাদি পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মৌখিক সাহিত্য গুলি কেবলমাত্র জনজীবন থেকে উঠে আসার জন্য, তার মধ্যে এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সংকীর্ণ ধর্মীয় ভাবনার বেড়াজালে এই রচনাগুলিকে আবদ্ধ রাখা যায় না, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ইতিহাস এই লোক কথা গুলি। পাশাপাশি যুগ বিভাজনের কোন পর্যায়ে এই রচনা গুলিকে রাখা সমীচীন হবে তা ও আলোচনার বিষয়।

'These stories are interspersed with songs in language which is generally very antiquated. Many facts about old Hindu society and about the sea-voyages undertaken by the merchants of Bengal are to be found in these stories; and there are other elements which indicate Bhuddistic influences, such as instances of the wonderful powers of Siddhas, and descriptions of Tantrick rites. There are some

stories on which Mahomedan influence has evidently left its impress, as for instance has evidently left its impress, as for instance in the story of Madhumala, the introduction of fairies is certainly no creation of the Hindu fancy.'[২৭৭]

আলাওলের পাশাপাশি আরও পরিচয়বিহীন মুসলিম লেখকদের প্রসঙ্গ গ্রন্থকার স্বল্প পরিসরে স্মরণ করেছেন। এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়কে লেখক 'Modern Age' নামে অভিহিত করেছেন। এই অধ্যায়ে মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচিত। এই শেষ পর্যায়ে এসে আমরা যদি প্রথম থেকে দীনেশচন্দ্র সেনের যুগ বিভাজনের ভাবনা-চিন্তাকে পরপর দেখি, তাহলে বুঝতে পারব যে বাংলা সাহিত্যকে ইংরেজি সাহিত্যের যুগ বিভাজনের আদলে বিভাজিত করতে চাইলেও; নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সীমাবদ্ধতার জন্য, উপযুক্ত ভাবে দীনেশচন্দ্র সেন বিভাজন প্রক্রিয়া সমাপন করতে পারেন নি। তাঁর চেষ্টার যে স্বরূপ তিনি আমাদের সমানে তুলে ধরেছিলেন, ভবিষ্যতে তাও পুরোপুরি মান্যতা পায় নি। কিন্তু একজন সাহিত্য প্রেমী এবং পরিশ্রমী পাঠকের যে সত্তা তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা ঐকান্তিক ভাবে অনুকরণ যোগ্য।

****

সংক্ষিপ্ত টীকা ঃ-

১) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খন্ড, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, ১৩৪৪, পৃঃ -৫৯।

২) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , 'কাশীপ্রসাদ ঘোষ', সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রথম খন্ড, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, ১৩৪৪, পৃঃ -৪৩৬।

৩) ঐ, পৃঃ -৪৩৬, ৪৩৭।

৪) ঐ, পৃঃ -৬১।

৫) ঐ, পৃঃ -৬১।

৬) ঐ, পৃঃ -৬১।

৭) ঐ, পৃঃ -৬১।

৮) ঐ, পৃঃ -৬২।

৯) সুদীপ বসু (সম্পা.), 'ভূমিকা' (একটি সাহসী মানুষ), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০০৯, পৃঃ -১।

১০) ঐ, পৃঃ -১০।

১১) সুদীপ বসু (সম্পা.), 'পরিশিষ্ট', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০০৯, পৃঃ -৮৫।

১২) ঐ, পৃঃ -৮৭।

১৩) ঐ, পৃঃ -৯৪।

১৪) সুদীপ বসু (সম্পা.), 'ভূমিকা' (একটি সাহসী মানুষ), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,২০০৯, পৃঃ-১।

১৫) ঐ, পৃঃ -১

১৬) ঐ, পৃঃ -২৮

১৭) ঐ, পৃঃ -১

১৮) ঐ, পৃঃ -১

১৯) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, দ্র. সুদীপ বসু (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ -৪৫,৪৬।

২০) ঐ, পৃঃ -৪৯

২১) ঐ, পৃঃ -৫১

২২) ঐ, পৃঃ -৫২

২৩) ঐ, পৃঃ -৫৪

২৪) সুশীলকুমার দে, 'ভূমিকা', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিজীবনী, দ্র. ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮ (পৃঃ সংখ্যা অনুল্লিখিত)।

২৫) ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), 'ভূমিকার আগের পৃষ্ঠা', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিজীবনী, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮।

২৬) ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), 'নিবেদন', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিজীবনী, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮,।

২৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিবর ঁভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত', কবিজীবনী, দ্র. ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮, পৃঃ -৪,৫।

২৮) ঐ, পৃঃ -৩৪

২৯) ঐ, পৃঃ -৬

৩০) ঐ, পৃঃ - ১০

৩১) ঐ, পৃঃ - ১২

৩২) ঐ, পৃঃ - ১২

৩৩) সুশীলকুমার দে, 'ভূমিকা', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিজীবনী, দ্র. ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮ (পৃঃ সংখ্যা অনুল্লিখিত)।

৩৪) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিবর ঁভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত', কবিজীবনী, দ্র. ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮, পৃঃ -২২।

৩৫) ঐ, পৃঃ -২২

৩৬) ঐ, পৃঃ -৩৭-৪১

৩৭) ঐ, পৃঃ -৪৪

৩৮) ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), 'পাদটীকা', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিজীবনী, 'কবিরঞ্জন ঁরামপ্রসাদ সেন (তিন)', প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮, পৃঃ -৮৩।

৩৯) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিরঞ্জন ঁরামপ্রসাদ সেন (তিন)', কবিজীবনী, দ্র. ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮, পৃঃ -৮৩-৮৬।

৪০) ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), 'পাদটীকা', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিরঞ্জন ঁরামপ্রসাদ সেন (দুই)', কবিজীবনী, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮, পৃঃ -৮০।

৪১) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিরঞ্জন ঁরামপ্রসাদ সেন (দুই)', কবিজীবনী, দ্র. ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮, পৃঃ -৮১।

৪২) ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), 'পাদটীকা', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিরঞ্জন ঁরামপ্রসাদ সেন', কবিজীবনী, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮, পৃঃ - ৪৭।

৪৩) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিরঞ্জন ঁরামপ্রসাদ সেন', কবিজীবনী, দ্র. ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮, পৃঃ -৪৭।

৪৪) ঐ, পৃঃ - ৫৮,৫৯ ।

৪৫) ঐ, পৃঃ -৬৪ ।

৪৬) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস-চর্চা, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৯, পৃঃ -১২।

৪৭) ঐ, পৃঃ -১২।

৪৮) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস চর্চা, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৯, পৃঃ -১৫।

৪৯) মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'পূর্ব্বপীঠিকা', বঙ্গভাষার ইতিহাস (প্রথম ভাগ), কলিকাতা, গুপ্তযন্ত্র, ১৯২৮।

৫০) ঐ ।

৫১) মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার ইতিহাস (প্রথম ভাগ), কলিকাতা, গুপ্তযন্ত্র, ১৯২৮, পৃঃ -৪।

৫২) ঐ, পৃঃ - ৮,৯।

৫৩) ঐ, পৃঃ -৯।

৫৪) ঐ, পৃঃ -১০।

৫৫) ঐ, পৃঃ -১১।

৫৬) ঐ, পৃঃ -১২।

৫৭) ঐ, পৃঃ -১৩,১৪।

৫৮) ঐ, পৃঃ -১৪।

৫৯) ঐ, পৃঃ - ১৬।

৬০) ঐ, পৃঃ - ১৬।

৬১) ঐ, পৃঃ - ১৮।

৬২) ঐ, পৃঃ -২০,২১।

৬৩) ঐ, পৃঃ -২২।

৬৪) ঐ, পৃঃ -২৩।

৬৫) ঐ, পৃঃ -২৩,২৪।

৬৬) ঐ, পৃঃ -২৪,২৫।

৬৭) ঐ, পৃঃ -২৪,২৫।

৬৮) ঐ, পৃঃ -২৮।

৬৯) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস -চর্চা, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৯, পৃঃ - ১৬।

৭০) শ্রী গিরীন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা, 'সূচনা' (তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত), রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), নতুন সংস্করণ, কলিকাতা, সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯১, পৃঃ -ভ।

৭১) রামগতি ন্যায়রত্ন, 'সূচীপত্র', বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), নতুন সংস্করণ, কলিকাতা, সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯১, পৃঃ -র।

৭২) রামগতি দেবশর্ম্মা, 'প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন', রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), নতুন সংস্করণ, কলিকাতা, সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯১, পৃঃ -ত।

৭৩) Taine, 'Preface', History of English Literature, H.VAN. LAUN.

৭৪) Taine, 'contents', History of English Literature, Chapter- iii, The new Tongue, ii, Page - x.

৭৫) ঐ, Page -xi

৭৬) কমল চৌধুরী, 'ভূমিকা', বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্র. কমল চৌধুরী, (সম্পা.), কলিকাতা, দে'জ সংস্করণ, ২০০৬।

৭৭) ঐ।

৭৮) ঐ।

৭৯) ভবতোষ দত্ত (সম্পা), 'অবতারণা', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিজীবনী, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮, পৃঃ - ৩-৪।

৮০) University of Calcutta minutes, for the year 1857, calcutta, printed for the Calcutta University at the Baptist Mission Press -1860.

৮১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রের সংগ্রহ। এর মধ্যে নির্দিষ্ট করে কেবল ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের বাংলার প্রশ্নপত্র। অন্তত যে ভাবে যতটুকু পাওয়া গেছে।

৮২) ঐ, ১৮৯১ -এর প্রশ্নপত্র।

৮৩) Romesh Chunder Dutt, ''নামকরণ অংশ'', (ভূমিকায় শেষ অংশে), The Literature Of Bengal, Revised Edition, Calcutta, Thacker Sponk & Co, 1895, (Page -v).

৮৪) Romesh Chunder Dutt, 'Preface', The Literature Of Bengal, Revised Edition, Calcutta, Thacker Spink & Co, 1895, Page-(i), (iii).

৮৫) Romesh Chunder Dutt, The Literature Of Bengal, Revised Edition, Calcutta, Thacker Sponk & Co, 1895, Page -2

৮৬) Do, Page -9

৮৭) Do, Page -26

৮৮) Do, Page -26

৮৯) Do, Page -32

৯০) Do, Page -38

৯১) Do, Page -38

৯২) Do, Page -38

৯৩) Do, Page -43

৯৪) Do, Page -46

৯৫) Do, Page -48

৯৬) Do, Page -48

৯৭) Do, Page -50

৯৮) Do, Page -54

৯৯) Do, Page -57

১০০) Do, Page -92 ,93

১০১) Do, Page -109

১০২) Do, Page -116,117

১০৩) Do, Page -119,120।

১০৪) Do, Page -120।

১০৫) Do, Page -120।

১০৬) Do, Page -123।

১০৭) Do, Page -126।

১০৮) Do, Page -127,128।

১০৯) Do, Page -135।

১১০) রাজনারায়ণ বসু, 'বিজ্ঞাপন', বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, কলিকাতা, গ্রন্থন সংস্করণ, ১৯৭৩।

১১১) ঐ।

১১২) ঐ।

১১৩) রাজনারায়ণ বসু, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, কলিকাতা, গ্রন্থন সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃঃ -২।

১১৪) ঐ, পৃঃ -২।

১১৫) ঐ, পৃঃ -৩।

১১৬) ঐ, পৃঃ - ১।

১১৭) ঐ, পৃঃ -৩, ৪।

১১৮) ঐ, পৃঃ -৬।

১১৯) ঐ, পৃঃ -৭।

১২০) ঐ, পৃঃ -৭।

১২১) ঐ, পৃঃ -৯, ১০।

১২২) ঐ, পৃঃ - ১১।

১২৩) ঐ, পৃঃ - ১৩।

১২৪) ঐ, পৃঃ - ১৩, ১৪।

১২৫) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'ভূমিকা', রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, নতুন সংস্করণ, কলিকাতা, সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯১, পৃঃ - ঞ।

১২৬) কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, বাঙ্গালা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, আর্য্যবন্ধু প্রেস, ১২৯২।

১২৭) ঐ, পৃঃ -২৫

১২৮) ঐ, পৃঃ -২৬

১২৯) ঐ, পৃঃ - ৩৪-৩৬

১৩০) ঐ, পৃঃ -৪৫

১৩১) ঐ, পৃঃ -৪৮

১৩২) ঐ, পৃঃ -৫০

১৩৩) ঐ, পৃঃ -৫২

১৩৪) ঐ, পৃঃ -৬৭

১৩৫) ঐ, পৃঃ -৬৭

১৩৬) ঐ, পৃঃ -৭০

১৩৭) ঐ, পৃঃ -৭৪

১৩৮) ঐ, পৃঃ -৭৫

১৩৯) ঐ, পৃঃ -৭৯

১৪০) ঐ, পৃঃ -৯৮

১৪১) ঐ, পৃঃ -৯৯

১৪২) ঐ, পৃঃ -১০০

১৪৩) ঐ, পৃঃ -১১০

১৪৪) ঐ, পৃঃ -১২১

১৪৫) ঐ, পৃঃ -১৪৩

১৪৬) দীনেশচন্দ্র সেন, 'ভূমিকা', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথমভাগ (একত্র), ১৮৯৬।

১৪৭) দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথমভাগ (একত্র), ১৮৯৬, পৃঃ - ৩৩।

১৪৮) ঐ, পৃঃ - ৩৩-৩৪

১৪৯) ঐ, পৃঃ - ৩৩

১৫০) দীনেশচন্দ্র সেন, 'পাদটীকা', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথমভাগ (একত্র), ১৮৯৬, পৃঃ -৩৪,

১৫১) দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথমভাগ (একত্র), ১৮৯৬, পৃঃ - ৩৪

১৫২) দীনেশচন্দ্র সেন, 'পাদটীকা', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথমভাগ (একত্র), ১৮৯৬, পৃঃ - ৩৪,৩৫।

১৫৩) ঐ, পৃঃ - ৩৬

১৫৪) ঐ, পৃঃ - ৪০

১৫৫) ঐ, পৃঃ - ৪১

১৫৬) ঐ, পৃঃ - ৪৩

১৫৭) ঐ, পৃঃ - ৪৯

১৫৮) ঐ, পৃঃ - ৪৪-৪৮

১৫৯) ঐ, পৃঃ - ৩৩

১৬০) ঐ, পৃঃ - ৫৩,৫৪

১৬১) ঐ, পৃঃ - ৫১

১৬২) ঐ, পৃঃ - ৬২

১৬৩) ঐ, পৃঃ - ৬৬

১৬৪) ঐ, পৃঃ - ৮৬, ৮৮, ১২৯

১৬৫) ঐ, পৃঃ - ৬৪

১৬৬) দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) প্রথম খন্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ- ১৩১,১৩৭।

১৬৭) দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথমভাগ (একত্র), ১৮৯৬, পৃঃ - ৬৭

১৬৮) ঐ, পৃঃ - ৭৮

১৬৯) ঐ, পৃঃ - ৮৯

১৭০) ঐ, পৃঃ - ৯১,৯২

১৭১) ঐ, পৃঃ - ৯৬

১৭২) ঐ, পৃঃ - ৯৫

১৭৩) ঐ, পৃঃ - ১০৯

১৭৪) ঐ, পৃঃ - ১২৪,১২৫

১৭৫) ঐ, পৃঃ - ১১৪,১১৫

১৭৬) ঐ, পৃঃ - ১১৭

১৭৭) ঐ, পৃঃ - ১২১

১৭৮) ঐ, পৃঃ - ১২৫,১২৬

১৭৯) ঐ, পৃঃ - ১২৬

১৮০) ঐ, পৃঃ - ১২৬,১২৭

১৮১) ঐ, পৃঃ - ১২৭

১৮২) ঐ, পৃঃ - ১৩১

১৮৩) ঐ, পৃঃ - ১৩৬

১৮৪) ঐ, পৃঃ - ১৩৪-১৪১

১৮৫) ঐ, পৃঃ - ১৩২,১৩৩

১৮৬) ঐ, পৃঃ - ১৪৮

১৮৭) ঐ, পৃঃ - ১৫৬

১৮৮) ঐ, পৃঃ - ১৫০-১৫৯

১৮৯) ঐ, পৃঃ - ১৬৪

১৯০) ঐ, পৃঃ - ১৬৬

১৯১) ঐ, পৃঃ - ১৬৬

১৯২) ঐ, পৃঃ - ১৮২

১৯৩) ঐ, পৃঃ - ১৮৪-১৯০

১৯৪) ঐ, পৃঃ - ২০৪, ২০৭

১৯৫) ঐ, পৃঃ - ২০৪

১৯৬) ঐ, পৃঃ - -২১০

১৯৭) ঐ, পৃঃ - ২২৭, ২৩৮, ২৪০

১৯৮) ঐ, পৃঃ - ২৪২

১৯৯) ঐ, পৃঃ - ২৮০

২০০) ঐ, পৃঃ - ৫৯

২০১) ঐ, পৃঃ - ২৮১

২০২) ঐ, পৃঃ - ২৮৩

২০৩) ঐ, পৃঃ - ২৮৯

২০৪) ঐ, পৃঃ - ৩১২

২০৫) ঐ, পৃঃ - ৩২৩-৩২৬

২০৬) ঐ, পৃঃ - ৩২৯

২০৭) ঐ, পৃঃ - ৩২৯

২০৮) ঐ, পৃঃ - ৩৪৩

২০৯) ঐ, পৃঃ - ৩৩৫

২১০) ঐ, পৃঃ - ৩৩৬

২১১) ঐ, পৃঃ - ৩৪১

২১২) ঐ, পৃঃ - ৩৩১

২১৩) ঐ, পৃঃ - ৩৭১

২১৪) ঐ, পৃঃ -৩৯২

২১৫) হারানচন্দ্র রক্ষিত, 'নিবেদন' ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্র. অরুণা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কলিকাতা, পারুল প্রকাশ, ২০০৯, পৃঃ -১।

২১৬) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'শিরোনাম অংশ', বঙ্গভাষার লেখক, দ্র. অজয় কুমার ঘোষ ও নীরদবরণ হাজরা (সম্পা.), প্রথম খন্ড, কলিকাতা, যুগসাহিত্য সংস্করণ, ১৯৯৬।

২১৭) অজয়কুমার ঘোষ, 'ভূমিকা', হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, দ্র. অজয়কুমার ঘোষ ও নীরদবরণ হাজরা (সম্পা.), প্রথম খন্ড, কলিকাতা, যুগসাহিত্য সংস্করণ, ১৯৯৬।

২১৮) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, দ্র. অজয়কুমার ঘোষ ও নীরদবরণ হাজরা (সম্পা.), প্রথম খন্ড, কলিকাতা, যুগসাহিত্য সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃঃ-১৫।

২১৯) ঐ, পৃঃ -১৬

২২০) ঐ, পৃঃ - ৪৯ -৫১

২২১) অজয়কুমার ঘোষ ও নীরদবরণ হাজরা (সম্পা.), 'পরিশিষ্ট', হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, যুগসাহিত্য সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃঃ- ৯৪।

২২২) ঐ, পৃঃ -৫৪

২২৩) ঐ, পৃঃ -৯৭

২২৪) ঐ, পৃঃ - ১৩৮, ১৩৯

২২৫) ঐ, পৃঃ -১৪৫

২২৬) ঐ, পৃঃ -১৫৪

২২৭) হারানচন্দ্র রক্ষিত, 'মলাটের পেছনের অংশের লেখা', ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্র. অরুণা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কলিকাতা, পারুল প্রকাশ, ২০০৯।

২২৮) হারানচন্দ্র রক্ষিত, 'মঙ্গলাচরণ', ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্র. অরুণা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কলিকাতা, পারুল প্রকাশ, ২০০৯, পৃঃ -৫।

২২৯) হারানচন্দ্র রক্ষিত, 'সূচি', ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্র. অরুণা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কলিকাতা, পারুল প্রকাশ, ২০০৯।

২৩০) হারানচন্দ্র রক্ষিত, 'সূচনা', ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্র. অরুণা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কলিকাতা, পারুল প্রকাশ, ২০০৯, পৃঃ -৭।

২৩১) হারানচন্দ্র রক্ষিত, ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্র. অরুণা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কলিকাতা, পারুল প্রকাশ, ২০০৯, পৃঃ -১১।

২৩২) ঐ, পৃঃ -২৬

২৩৩) ঐ, পৃঃ -৪৭

২৩৪) ঐ, পৃঃ -৪৭

২৩৫) ঐ, পৃঃ -৪৮

২৩৬) ঐ, পৃঃ -৪৯

২৩৭) ঐ, পৃঃ -৫০

২৩৮) ঐ, পৃঃ -৫১

২৩৯) ঐ, পৃঃ -৬০

২৪০) ঐ, পৃঃ -৬৪

২৪১) ঐ, পৃঃ -৬৫

২৪২) ঐ, পৃঃ -৭৬

২৪৩) ঐ, পৃঃ -৮৮

২৪৪) ঐ, পৃঃ -১০৪

২৪৫) ঐ, পৃঃ -১০৬

২৪৬) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস -চর্চা, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৯, পৃঃ -৩২।

২৪৭) Dinesh Chandra Sen, 'Preface', History of Bengali Language and Literature, First Reprint, Delhi, Gian Publishing House, 1986, Page -5.

২৪৮) Dinesh Chandra Sen, History of Bengali Language and Literature, First Reprint, Delhi, Gian Publishing House, 1986, Page -16

২৪৯) ঐ, Page -16

২৫০) Dinesh Chandra Sen, 'পাদটীকা' History of Bengali Language and Literature, First Reprint, Delhi, Gian Publishing House, 1986, Page -18

২৫১) Dinesh Chandra Sen, History of Bengali Language and Literature, First Reprint, Delhi, Gian Publishing House, 1986, Page -18

২৫২) ঐ, Page -28

২৫৩) ঐ, Page -36

২৫৪) ঐ, Page -55

২৫৫) ঐ, Page -56

২৫৬) ঐ, Page -92

২৫৭) ঐ, Page -94

২৫৮) Dinesh Chandra Sen, 'পাদটীকা' History of Bengali Language and Literature, First Reprint, Delhi, Gian Publishing House, 1986, Page -119.

২৫৯) Dinesh Chandra Sen, History of Bengali Language and Literature, First Reprint, Delhi, Gian Publishing House, 1986, Page -119

২৬০) ঐ, Page -123

২৬১) ঐ, Page -141

২৬২) ঐ, Page -185

২৬৩) ঐ, Page – 188-190

২৬৪) ঐ, Page -218

২৬৫) ঐ, Page -214

২৬৬) ঐ, Page – 207- 209

২৬৭) ঐ, Page -195

২৬৮) ঐ, Page -224, 225

২৬৯) ঐ, Page - 368

২৭০) ঐ, Page -462

২৭১) ঐ, Page -474

২৭২) ঐ, Page -566

২৭৩) ঐ, Page -614

২৭৪) ঐ, Page -614

২৭৫) ঐ, Page -692

২৭৬) ঐ, Page - 769,770

২৭৭) ঐ, Page -774

=ঃ চতুর্থ অধ্যায় ঃ=

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং মৈমনসিংহ গীতিকা ঃ-

দীনেশচন্দ্র সেনের জীবদ্দশায় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পরে ১৯৪১ সালে।[১] ফলে এমন অনুমান করা যেতেই পারে যে, ষষ্ঠ সংস্করণই আজও পরবর্তী সংস্করণগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। লেখকের জীবিতাবস্থায় বাংলা সাহিত্যের অনেক মূল্যবান পুথি-নথি-তথ্য ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে যুক্তি প্রতিযুক্তির মধ্যে দিয়ে সেই গুলি স্থান পেয়েছে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর পরবর্তী সংস্করণ গুলিতে। দীনেশচন্দ্র সেনের জীবদ্দশার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য 'পল্লীগীতিকা'-র আবিষ্কার। এ প্রসঙ্গে 'মৈমনসিংহ- গীতিকার' ভূমিকা অংশে দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছেন -

'১৯১৩ খৃঃ অব্দে মৈমনসিংহ জেলার 'সৌরভ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে প্রাচীন মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। গ্রন্থকার চন্দ্রাবতীর কাহিনীর মর্ম্মাংশটি মাত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু যেটুকু দিয়াছিলেন, তাহা একেবারে চৈত-বৈশাখী বাগানের ফুলের গন্ধে ভরপুর; সেই দিন কেনারামের উপাখ্যানের সারাংশের উপর আমার অনেক চোখের জল পড়িয়াছিল।

এই চন্দ্রকুমার দে কে এবং কেনারামের কবিতাটিই বা আমি কোথায় পাই, এই হইল আমার চিন্তার বিষয়।'[২]

এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রকুমার দে-র সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং চন্দ্রকুমার দে-র সাহায্যেই পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত মৌখিক গাথাকাব্য গুলির সাথে দীনেশবাবুর পরিচয় হয়েছিল। এই গাথাকাব্য গুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রধানত যে সমস্যার মুখোমুখি সংগ্রাহককে হতে হয়েছিল তা হল -

‘যাহা লিখিত হয় নাই, আবৃত্তিই যাহা রক্ষার একমাত্র উপায়, অভ্যাস না থাকিলে সেই কাব্যকথার স্মৃতি মলিন হইয়া পড়িবেই। এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহু লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে কাহারও বা দুইটি, -নানা গ্রামে পর্য্যটন করিয়া নানা লোকের শরণাপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালার উদ্ধার করিতে পারা যায়। এই জন্য চন্দ্রকুমার প্রতি পালাটি সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন।’[৩]

মূলত অবজ্ঞাত, কখনো প্রায় অশিষ্ট ভাষায়, অনাড়ম্বর সরলতায় রচিত পালাগুলি বঙ্গ সাহিত্যের একটি নতুন দিকের ওপর আলোকপাত করেছে। মৌখিক পরম্পরায় রচিত এই পালাগান গুলির অধিকাংশই পূর্ব-মৈমনসিংহের কোন না কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বনে রচিত।[৪] পালাগান গুলির প্রতি মনোযোগ দিলে বোঝা যায় যে রচয়িতাদের হৃদয়ই অফুরন্ত করুণা, কবিত্ব ও প্রেমের উৎস ছিল। এই প্রেমে তপস্যা আছে কিন্তু আধ্যাত্মিকতা নেই। রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন এই পল্লীগীতিকা গুলির সাথে চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাসের পদাবলির কিছু কিছু মিল লক্ষ করেছেন। যেমন- ‘মহুয়া’ পালার ‘ফুল যদি হৈতারে বন্ধু ফুল হৈতা তুমি। কেশেতে ছাপাইয়া রাখিতাম ঝাইরা বানতাম বেণী’[৫] পদের সঙ্গে লোচনদাসের ‘ফুল নও যে, কেশের করি বেশ’[৬] প্রভৃতি পদ মিলিয়ে পড়েছেন।

বৈষ্ণবকবিরা তাঁদের কাব্যে প্রেমের যে অপূর্ব সাধনা করেছেন তার অন্যতম বড় উৎস পল্লীজীবন ও পল্লী অন্তরঙ্গতা। পল্লীজীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই পল্লীর প্রাণেশ্বরকে তাঁরা জগদীশ্বর করেছেন। সেইজন্য ‘পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা’ -গুলির সাথে বৈষ্ণব সাহিত্যের মিল খুঁজে পেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। অন্যদিকে দীনেশচন্দ্র সেন নিজে বৈষ্ণব সাহিত্যের একজন বড় সমঝদার ও সমালোচক। ফলে এমনটাও হতে পারে যে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার জায়গাটি থেকেই দীনেশচন্দ্র সেন পল্লীগাথা গুলিকে পড়তে ও বুঝতে চেয়েছেন।

পল্লীগাথা গুলির আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্য নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। এর আগে পর্যন্ত কেবলমাত্র লিখিত সাহিত্যই সাহিত্যের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে আসছিল। পাশাপাশি মৌখিক সাহিত্যও এমন রূপে থাকতে পারে ১৯১৩ -র পূর্বে এমন কোন অনুমানও পাওয়া যায়নি। এখন মুশকিল হচ্ছে এই গাথাকাব্য গুলিকে যুগ বিভাজনের কোন পর্যায়ে রাখা সমীচীন হবে, দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর ষষ্ঠ সংস্করণে এই প্রশ্নের উচিত মীমাংসা করতে পারেন নি। তাই 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের ২য় যুগ' -এর শেষে আলাদা করে 'পরিশিষ্ট' জুড়ে দিয়েছেন। পরবর্তী সময়েও এই প্রশ্নের অবিতর্কিত উত্তর পাওয়া যায় নি। ফলে 'চর্যাগীতি' থেকে 'অন্নদামঙ্গল' -এর মাঝে মৌখিক সাহিত্যের অবস্থান প্রশ্নস্বরূপ রয়ে গেছে। সাহিত্যের যুগ বিভাজন ও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আবিষ্কার করেন এবং তাঁরই সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সেটি প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যে নতুন করে এক সমস্যার জন্ম নেয়, -চন্ডীদাস সমস্যা। এই প্রকাশের পরবর্তী 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর সংস্করণ গুলিতে এই কাব্য ও সমস্যার বিশদ উল্লেখ পাওয়া যায়। কাব্যটির বয়স সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছেন -

'পুঁথিখানি আমি দেখিয়াছি, এ পর্য্যন্ত ৭/৮ হাজার বাঙ্গালা পুঁথি আমি দেখিয়াছি-তন্মধ্যে এরূপ প্রাচীন পুস্তক অতি অল্পই দেখা গিয়াছে'।[৭]

চন্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন পদাবলির চন্ডীদাস এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 'অনন্ত' নামযুক্ত ও 'বড়ু' উপাধি বিশিষ্ট চন্ডীদাসকে একই চন্ডীদাস রূপে বিবেচনা করেছেন।

'চন্ডীদাসকে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছি, কৃষ্ণকীর্ত্তনে সেই ধারণা কতকটা ক্ষুন্ন হইবার কথা। তিনি প্রেমের যে উচ্চ গ্রামে সুর বাঁধিয়াছেন,- কৃষ্ণকীর্ত্তন যে তাহার অনেক নিম্নে। ..... চন্ডীদাস বলিতে আমরা যে

পবিত্রতা ও যুথিকাশুভ্র নির্ম্মলতা বুঝি, এখানে তাহা নাই। এ যে একান্ত স্থূল, একান্ত বিসদৃশ চিত্র-পদ, আঁধারে ছিল-ভাল ছিল; চন্ডীদাসকে যে এই কীর্ত্তন হেয়, অশ্রদ্ধেয় করিয়া দিল; তাঁহার পদাবলীর সঙ্গে এক পংক্তিতে কৃষ্ণকীর্ত্তন রাখা যায় না। তাহা হইলে যে ব্রহ্মচন্ডাল যোগ হয়।'[৮]

বলাবাহুল্য লেখকের চন্ডীদাস সম্পর্কিত এই মতামত পরবর্তীকালে অনেক বেশি সঙ্গত তথ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে খারিজ হয়ে গেছে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঠিক সময়কাল সম্পর্কেও প্রায় সর্বমান্য একটি সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। তবুও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এ এই কাব্যের উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এ জনপ্রিয়তার জন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বা 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' -এর পরিচিতি বিস্তৃত হয়েছে এবং এক শ্রেণির পাঠক এই কাব্য, চর্চার মধ্যে দিয়ে যে ধারণা লাভ করেছে, তা পরবর্তীকালে 'মধ্যযুগ' -এর নির্মাণকে পুষ্ট করেছে। যদিও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর 'মধ্যযুগ' নামটি নির্দিষ্ট হয় নি। এই শব্দটি আরও পরবর্তীকালে সৃষ্ট। দ্বিতীয়ত, ১৯০৭ সালে চর্যাগীতি আবিষ্কারের পর ১৯০৮ সালে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' -এর তৃতীয় সংস্করণে দীনেশচন্দ্র সেন চর্যার উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, চর্যার আবিষ্কার ১৯০৭ এবং প্রকাশ ১৯১৬। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে) ফলে তৃতীয় সংস্করণে চর্যার উল্লেখকালে লেখক সম্ভবত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছ থেকেই এ প্রসঙ্গে শুনে তথ্য সংগ্রহ করে থাকবেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে তৃতীয় সংস্করণের পরে যে সংস্করণ গুলি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কোথাও চর্যার উল্লেখ নেই।[৯] সম্ভবত পরবর্তীকালে লেখক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন রূপে 'চর্যাগীতি'-র গুরুত্ব স্বীকার করতে চাননি বা এ সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্পর্কে তিনি এমনটা করেন নি, চন্ডীদাস সম্পর্কে তাঁর প্রবল আকর্ষণও এর অন্যতম বড় কারণ হতে পারে। যাইহোক, 'পল্লীগাথা' সমূহ, 'চর্যাগীতি' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' এর আবিষ্কারে

সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্য। বিস্তৃত হয়েছে তার পাঠভাবনা। সাহিত্য চর্চার রীতি ও ধরনকে নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করবার রসদ জুগিয়েছে এই আবিষ্কার গুলি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ও মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী

সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় জানিয়েছিলেন (এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে প্রথম সংস্করণ বলতে আসলে প্রথম প্রকাশই বোঝানো হয়েছে) -

'বাঙ্গালা দেশে তথা বাঙ্গালা সাহিত্যে 'বৌদ্ধ', 'শৈব', 'ব্রাহ্মণ্য', 'ঐস্লামিক' ইত্যাদি যুগবিভাজন একেবারে কাল্পনিক। একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে আমি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের অনুসরণ করি নাই, কেননা আধুনিক পূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে কেবলই খাড়াবড়ি - থোড়ের গতানুগতিকতা, ইংরেজি সাহিত্যের উদার প্রসার ও অনুপম ঐশ্বর্যের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না।'[১০]

লেখক ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের অনুসরণ না করে ঠিক কোন গ্রন্থের অনুসরণ করেছিলেন, তা স্পষ্ট করেন নি। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, তিনি নিজের মত করে সাহিত্যের ইতিহাসের বিভাজন করেছিলেন, তাহলেও তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থপাঠে কিন্তু সে কথা মেনে নেওয়া যায় না। এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার সাহিত্যের ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম পর্বকে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্বকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত, তৃতীয় পর্বকে ১৪৯৪-১৫৭৫[১১] -সময় পর্যন্ত এছাড়াও অন্যান্য পর্বগুলিকে সময়ের হিসাবে বিভাজিত করেছেন। এখন সময়ের নিরিখে সাহিত্যের ইতিহাসকে বিভাজিত করবার প্রক্রিয়ায় অবদান পুরোপুরি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের। আমরা আগের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার জানিয়েছিলেন -

'দ্বিতীয় সংস্করণ নামে মাত্র, আসলে নূতন বই'।[১২]

এই নতুন সংস্করণকে তিনি আগের সংস্করণের তুলনায় কেন 'নূতন' বলেছেন, ভূমিকায় তা পুরোপুরি স্পষ্ট করেন নি, তাহলেও এই সংস্করণে তিনি পর্ব বিভাজন কিসের নিরিখে করেছেন তা পরিষ্কার করে বললে সুবিধা হত, সাধারণ পাঠকেরা অন্তত এই বিভাজনে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের ছায়া লক্ষ করত না।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম পর্বের পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম 'বাঙ্গালী সমাজের বিবর্তন'। এই পরিচ্ছেদের একাধিক পৃষ্ঠার পাদটীকায় একটি নতুন বইয়ের উল্লেখ রয়েছে, যার নাম 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী'।[১৩] উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই গ্রন্থটির রচয়িতাও সুকুমার সেন। এই বইটির প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দে।[১৪] লক্ষণীয় হল এই বইয়ের নামকরণে 'মধ্যযুগ' শব্দটি। সেই ১৮৫১ থেকে প্রাচীন সাহিত্যের যে আলোচনা পত্র-পত্রিকা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ইতিহাসচর্চার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে অবয়ব নির্মাণ করে চলেছিল, এই দশকে এসেই তা মান্যতা লাভ করছে বা নাম পাচ্ছে 'মধ্যযুগ' শব্দটির মধ্যে দিয়ে। এখন 'মধ্যযুগ' বলতে গ্রন্থকার ঠিক কোন সময়কে বোঝাতে চাইছেন, তা জানবার ও বোঝাবার জন্য আমাদের গ্রন্থটির দ্বারস্থ হতে হবে। গ্রন্থের শুরুটা এই রকম -

'ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কি অভিযান শুরু হল আর তার ফলে বাংলা দেশের ইতিহাস নূতনতর রূপ নিলে। গৌড় -সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হয়েও সেন রাজারা কিছুকাল ধরে মধ্য ও পূর্ব বঙ্গে স্বাধিকার রক্ষা করতে পেরেছিলেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের স্থানে স্থানে স্থানীয় শাসন কর্তারাও সেন বংশের নামে অথবা স্বনামে অল্পবিস্তর স্বাধীনতা অনেক কাল ধরে ভোগ করেছিলেন। প্রান্তীয় অঞ্চল গুলির স্বাধীনতা আরো অনেক কাল অবধি অক্ষুন্ন ছিল।

কিন্তু শেষ অবধি বিদেশী শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তার কারণ এই নয় যে বাঙালীর বীরত্ব তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান-শক্তির বিজয়লাভের প্রধানতম

কারণ হচ্ছে দেশে সংঘশক্তির অভাব। পাল -রাজত্বের শেষ দিক থেকে বাংলা দেশের গণশক্তি ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধতা হারাচ্ছিল। তার উপর বল্লালসেন-লক্ষ্মণসেনের সুশাসনে দন্ডশক্তি ও উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল। সাম্রাজ্যের বলাধিকৃতেরা অস্ত্রেশস্ত্রে যুদ্ধবিদ্যায় ও রণনীতিতে গতানুগতিকতা স্বীকার করে আসছিলেন, তাতে যে কালানুযায়ী পরিবর্তন আবশ্যক তা অনুধাবন করেন নি। সর্বোপরি, আধিভৌতিক বাহুবল অপেক্ষা আধিদৈবিক মন্ত্রবলের উপর ক্রমবর্ধমান আস্থা জনগণমানসে জড়তার মোহ বিস্তার করেছিল। এ কথা বলা মূঢ়তা যে বাঙালী তখন রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে কাতর হত। তা যদি হত তবে সমগ্র বাংলাদেশকে অধিকার করতে মুসলমান শক্তিকে দু-শো বছরের উপর লাগত না।'[১৫]

অর্থাৎ মধ্যযুগের স্বরূপ নির্মাণে শুরুটা হচ্ছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুর্কি আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। এখন এই তুর্কি আক্রমণের ফলে তৎকালীন বাংলা ও বাঙালির কি অবস্থা হয়েছিল এবং তার মধ্যে দিয়ে তুর্কিদের সঠিক কোন বৈশিষ্ট্য গুলি ফুটে ওঠে তার বর্ণনা নিম্নরূপ।

'বৌদ্ধবিহার ও ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগুলি প্রথমেই আক্রান্ত হয়েছিল তুর্কি-অভিযান কারীদের দ্বারা। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুট, আর অবান্তর উদ্দেশ্য ছিল জাতির মর্মস্থান দেবপীঠ গুলির উপর আঘাত হেনে জনসাধারণের মনে ত্রাস জাগিয়ে নিচেষ্ট করে দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্যই অল্প বিস্তর সফল হয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণপন্ডিত যাঁরা পারলেন তাঁরা প্রান্তীয় হিন্দুরাজ্যে চলে গেলেন- মিথিলায়, নেপালে, উড়িষ্যায়, কামরূপে, ঝাড়িখন্ডে। যাঁরা পারলেন না তাঁরা পড়ে মার খেলেন। কতক বা এখানে সেখানে লুকিয়ে প্রাণ, জাতি ও ধর্ম রক্ষা করলেন। ধর্ম-ঠাকুরের ঘর ভরা গাজনের শেষ অনুষ্ঠান 'ঘর ভাঙা'-র ছড়ায় এই ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। আমাদের দেশের চিন্তাধারার একটা সাধারণ সূত্র হচ্ছে সুখের মতো দুঃখকেও ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধান বলে মেনে নেওয়া। দেশ যখন মার খেয়ে খেয়ে নিবীর্য হয়ে পড়ল তখনি এই

পরাজিত মনোবৃত্তি প্রকট হল ব্যাপক ভাবে। তাই কিছুকাল পরে জনসাধারণ সহজেই মুসলমান বিজয়কে ঈশ্বরের মার বলে মনে নিয়ে মনে সান্ত্বনা আনতে চেষ্টা করলে।'[১৬]

তুর্কিদের এবং বাঙালিদের এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আর যাই হোক, মধ্যযুগের রাজশক্তির মানসিকতার উজ্জ্বলতম চিত্র আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় না। ফলে মধ্যযুগের সাথে মুসলিম শাসন সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত বর্ণনার পরে গ্রন্থকার তাঁর তথাকথিত 'মধ্যযুগ'-এর সময়ের প্রাপ্ত লেখ্য নিদর্শন গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। পরিশেষে, আরও একবার রামেশ্বর ভট্টাচার্যের লেখার মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের পরিচয় গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন -

'মোগল-শাসনে বাংলাদেশের দ্রুত অবনতি ঘটছিল, অন্তত আর্থিক অবস্থায়। দেশের ধনসম্পদ চলে যাচ্ছিল দেশের বাইরে, আর দেশের ভিতরেও লোকের দেহে মনে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। দু-বেলা ভাত আর পরনের এক টুকরা কাপড় পেলেই সাধারণ লোক কৃতার্থ হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামেশ্বর ভট্টাচার্য কুলীন-ব্রাহ্মণের যে সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ খাড়া করেছেন তাতে দেশের আর্থিক দুর্গতি হয়েছে মুখর,

কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি,
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করো তুমি।
আঁটু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত, ...

আর পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে মুখ ফিরোলে তখনকার সাংসারিক জীবনের কামনা দেখি ঐশ্বর্য্যোজ্জ্বল,

তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে,
দশ-বিশ জন যার আগে পাছে নড়ে।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার এর জন্যে কতকটা দায়ী হতে পারে। তবে আসলে হেতু হচ্ছে মোগল-শাসনে দেশের অত্যধিক শোষণ ও তার ফলে ক্রমবর্ধমান অবনতি।'[১৭]

এই অধ্যায়ে মূল আলোচনার মাধ্যমে আমরা এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে, ‘মধ্যযুগ’ নামটি বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এসেই নির্দিষ্ট হচ্ছে। তার আগে ১৮৫০-১৯২০, এই সময়ে ‘মধ্যযুগ’ এর গঠন বা চেহারা বা অবয়ব মোটামুটি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৩ -র গীতিকার আবিষ্কার ও তার মধ্যেই পড়ে। আমরা আমাদের বক্তব্যের সুবিধার্থে গীতিকা প্রসঙ্গকে এই অধ্যায়ে আলোচনা করলাম। পরিশেষে একথা স্পষ্ট যে সম্পূর্ণ মুসলমান শাসনের সময়কালই বাংলা সাহিত্যে তির্যক ও কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ‘মধ্যযুগ’ নাম চেহারায় স্থিতি লাভ করেছে।

****

সংক্ষিপ্ত টীকা ঃ-

১) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'নবম সংস্করণের পরিশিষ্ট' (সম্পাদক সংযোজিত), দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -৮৫৩।

২) দীনেশচন্দ্র সেন, 'ভূমিকা', মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃঃ - ১।

৩) ঐ, পৃঃ -২।

৪) ঐ, পৃঃ -৫।

৫) দীনেশচন্দ্র সেন, 'পরিশিষ্ট', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -৬৮১।

৬) ঐ, পৃঃ -৬৮১।

৭) দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রথম খন্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -২২৮।

৮) ঐ, পৃঃ ২৩১।

৯) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'নবম সংস্করণের পরিশিষ্ট' (সম্পাদক সংযোজিত), দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃঃ -৮৫৭।

১০) সুকুমার সেন, 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা', বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৫৫।

১১) সুকুমার সেন, 'সূচিপত্র', বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৫৫।

১২) সুকুমার সেন, ‘দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা’, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৫৫।

১৩) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৫৫, পৃঃ -৫৯, ৬২, ৬৮, ৬৯।

১৪) সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৪০৩।

১৫) ঐ, পৃঃ -৩।

১৬) ঐ, পৃঃ -৫।

১৭) ঐ, পৃঃ -৫১,৫২।

=ঃ উপসংহার ঃ=

সত্যি কথা বলতে কি এই সব ভাবনা - চিন্তা ও প্রশ্ন-উত্তর পর্বের পর একটা বিষয় আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার যে 'মধ্যযুগ' বলতে আসলে কিছুই ছিল না বা নেই। যা ছিল এবং যা এখনও আছে তা হল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে 'অন্নদামঙ্গল' পর্যন্ত যাবতীয় লিখিত সাহিত্য রূপ এবং অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে মৌখিক সাহিত্যও লিখিত সাহিত্যের পাশাপাশি সমান ভাবে বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে 'মধ্যযুগ' নামক এক ভুল ধারণার জন্ম হয়েছিল 'আধুনিক যুগ' নামক সময়টিকে পূর্ণতা দানের জন্য অর্থাৎ 'আধুনিক যুগ' কতখানি আধুনিক, তার মধ্যে নতুন এমন কি কি আমদানি করা হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির দ্বারা যা পূর্ববর্তী সময়ে ছিল না, সেই কথা বোঝাতেই 'মধ্যযুগ' এর অবতারণা। একশোতম সংখ্যায় পৌঁছাতে হলে শুরুটা যেমন এক থেকে করতে হবে, তেমনই 'আধুনিক যুগ' কে বোঝাতে হলেও একখানা 'প্রাচীন' ও 'মধ্যযুগ' এর নির্মাণ করতে হবে, তা না হলে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যাওয়া যাবে না এবং এই নির্মাণের শুরুতে 'মধ্যযুগ'-কে বোঝাতে হলে তার শুরুটা করি আমরা তুর্কি আক্রমণ থেকে।

অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে তুর্কি আক্রমণ সমকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। কিন্তু একথা আমরা একবারও ভেবে দেখবার চেষ্টা করিনি যে, তুর্কি আক্রমণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা, অথচ আমরা পড়ছি 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' -যেখানে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বা ঘটনা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে ঠিকই কিন্তু কোনটাই সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। ফলে যখনই আমরা বলি এবং মানি যে তুর্কি আক্রমণ থেকে 'মধ্যযুগ'-এর সূত্রপাত, তখনই অন্যতম এই ঘটনাটিই সাহিত্যের নিয়ন্ত্রক রূপে উপস্থিত হচ্ছে এবং সাহিত্যও সেই মতো এর দ্বারা চালিত হচ্ছে, যা কিন্তু হওয়া উচিত ছিল না।

আমরা একবারও একথা বলছি না বা বলতে চাইছি না যে ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যের 'যুগবিভাজন' পুরোপুরি ভুল এবং তার জন্য ইংরেজি সাহিত্য একমাত্র দায়ী। পাশ্চাত্য শিক্ষার কাছে আমরা ভীষণ ভাবেই ঋণী এবং সেই সাহিত্যের যা যা ভালো দিক তা নিয়ে আমাদের অবশ্যই আলোচনা, ভাবনা-চিন্তা, লেখাপড়া করা উচিত। কিন্তু সাথে সাথে আমাদের একথা ভুললেও চলবে না যে তৎকালীন 'ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস' রচনার প্রেক্ষিত এবং অনেক পরে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনার প্রেক্ষিত পুরোপুরি আলাদা, এবং এই প্রেক্ষাপটের প্রতি মনোযোগী না হয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে 'যুগবিভাজন' উপস্থিত করবার ফলেই বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

সমস্যা থাকলে তার সমাধানও থাকে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেই সমাধান যে মতৈক্যে পৌঁছাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই, বলাবাহুল্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্তত মতৈক্যের থেকে মতানৈক্য বেশি জরুরি তবেই চলমান হয়ে রইবে সাহিত্য। ফলে 'প্রাচীন ও মধ্যযুগ'-এর সাহিত্যকে একটু অন্যভাবে দেখবার প্রস্তাবিত বিকল্প পথ আমাদের পক্ষ থেকে হল এই যে, 'যুগবিভাজন' প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে যদি আমরা একবার সাহিত্যকে পড়বার চেষ্টা করে দেখি। অর্থাৎ 'চর্যাগীতি' থেকে 'অন্নদামঙ্গল' পর্যন্ত এবং অবশ্যই মৌখিক সাহিত্যকেও আমরা যে অবস্থায় বর্তমানে পাচ্ছি, সেই অবস্থায় বর্তমান রেখেই যদি পড়তে শুরু করি, যেমন -আমরা প্রথম নিদর্শন রূপে চর্যা -কে পাচ্ছি। তাই আমাদের পড়বার ধরন হতে পারে এমন,- (১) বিষয় (২) লেখক (৩) সময় (৪) অন্যান্য। আর বর্তমান অবস্থায় আমরা চর্যা কে দেখি এইভাবে (১) সময় (প্রাচীন যুগ/ দশম-দ্বাদশ শতাব্দী) (২) বিষয় (৩) লেখক (৪) অন্যান্য। ঠিক একই ভাবে আমরা পরবর্তী সাহিত্যকে ও দেখবার কথা ভাবতে পারি, তাহলেই 'যুগপ্রসঙ্গ' পাঠ্যসূচি বা সূচিপত্রের উপরিভাগ আলোকিত করবে না। অন্য আরও একটি দিক দিয়েও যদি আমরা দেখি যে, বর্তমানে যেকোন ধরনের একটি বই যদি আমাদের হাতে আসে তাহলে সর্বপ্রথম আমরা বইটি কি বিষয়ে লেখা সেটি দেখি,

তারপর লেখক, তারপর প্রথম প্রকাশ, প্রকাশনা সংস্থা ইত্যাদি দেখি। ফলে আজকের লিখিত সাহিত্যের বিচার যদি আমরা এই ভাবে করি তাহলে পুরনো সাহিত্য কি দোষ করল ? সেগুলির ক্ষেত্রে কেন অন্য পন্থা অবলম্বন করা হবে ? -তবে যদি অন্য কোন প্রায় সর্বমান্য যুক্তিগ্রাহ্য রাস্তা থাকে আমরা সেই রাস্তাতেও চলতে রাজি, কিন্তু সেই সঠিক রাস্তাটা আমাদের একটু দেখাতে হবে, তবেই আমরা আমাদের এই কাজের ভুল -ত্রুটি গুলি সংশোধন করে নতুন পথে চলতে পারব।

****

=ঃ সহায়ক বাংলা গ্রন্থপঞ্জি ঃ=

১) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস চর্চা। কলিকাতা। সারস্বত লাইব্রেরী। ১৩৭৯।

২) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কবিজীবনী। দ্র. ভবতোষ দত্ত (সম্পা.)। কলিকাতা। ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৫৮।

৩) কমল চৌধুরী (সম্পা.)। বাঙ্গালার ইতিহাস। কলিকাতা। প্রথম দে'জ সংস্করণ। ২০০৬।

৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রের সংগ্রহ।

৫) কৈলাসচন্দ্র ঘোষ। বাঙ্গালা সাহিত্য। কলিকাতা। আর্য্যবন্ধু প্রেস। ১২৯২।

৬) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। প্রথম খন্ড। দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। কলিকাতা। শিশুসাহিত্য সংসদ। ১৯৭৯।

৭) দীনেশচন্দ্র সেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। প্রথম ভাগ (একত্র)। ১৮৯৬।

৮) দীনেশচন্দ্র সেন। মৈমনসিংহ গীতিকা। প্রথম খন্ড। চতুর্থ সংস্করণ। কলিকাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৩।

৯) দীনেশচন্দ্র সেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। প্রথম খন্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০০২।

১০) দীনেশচন্দ্র সেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। দ্বিতীয় খন্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০০২।

১১) নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিহাসচর্চা। প্রথম প্রকাশ। কলিকাতা। কৃষ্টি। ২০০১।

১২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র)। দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.)। প্রথম খন্ড। চতুর্থ প্রকাশ। কলিকাতা। সাহিত্য সংসদ। ১৩৭২।

১৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম রচনাবলী। দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.)। দ্বিতীয় খন্ড। পঞ্চদশ মুদ্রণ। কলিকাতা। সাহিত্য সংসদ। ১৪১১।

১৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। সংবাদপত্রে সেকালের কথা। প্রথম খন্ড। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির। ১৩৩৯।

১৫) ভবতোষ দত্ত ও বিজলি সরকার। বঙ্গদর্শন পরম্পরা। প্রথম প্রকাশ। নৈহাটি। কাঁটালপাড়া। বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র। ২০০৬।

১৬) মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গভাষার ইতিহাস। প্রথম ভাগ। কলিকাতা।। গুপ্তযন্ত্র। ১৯২৮।

১৭) মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।উপন্যাসে অতীত ঃ ইতিহাস ও কল্পইতিহাস। প্রথম প্রকাশ। কলিকাতা। থীমা। ২০০৩।

১৮) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ। দ্র. সুদীপ বসু (সম্পা.)। কলিকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ২০০৯।

১৯) রমেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলাদেশের ইতিহাস। দ্বিতীয় খন্ড। ষষ্ঠ সংস্করণ। কলিকাতা। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স। ২০০৩।

২০) রাজনারায়ণ বসু। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। গ্রন্থন সংস্করণ। কলিকাতা। ১৯৭৩।

২১) রামগতি ন্যায়রত্ন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। দ্র. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। নতুন সংস্করণ। কলিকাতা। সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ১৯৯১।

২২) সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম খন্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা। মডার্ণ বুক এজেন্সী। ১৩৫৫।

২৩) সুকুমার সেন। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী। পুনর্মুদ্রণ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৪০৩।

২৪) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রচনা সংগ্রহ (১)। দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.)। প্রথম প্রকাশ। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ১৯৮০।

২৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রচনা সংগ্রহ (২)। দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য (সম্পা.)। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০০২।

২৬) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষ। প্রথম খন্ড। পুনর্মুদ্রণ। কলিকাতা। সাহিত্য অকাদেমি। ১৯৭৮।

২৭) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। বঙ্গভাষার লেখক। দ্র. অজয়কুমার ঘোষ ও নীরদবরণ হাজারা (সম্পা.)। প্রথম খন্ড। যুগসাহিত্য সংস্করণ। কলিকাতা। ১৯৯৬।

২৮) হারানচন্দ্র রক্ষিত। ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য। দ্র. অরুণা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলিকাতা। পারুল প্রকাশ। ২০০৯।

=ঃ সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি ঃ=

1) Bankim Chandra Chttopadhay. Bankim Rachanavali. see. Shri Jogesh Chandra Bagal (Edi.). 3rd print. Calcutta. Sahitya Sansad. 1998.

2) Dinesh Chandra Sen. History of Bengali Language and Literature. First Reprint. Delhi. Gian Publishing. 1986.

3) Ishwari Prasad. History of Mediaeval India. L.F. Rushbrook -Williams (forword). Allahabad. The Indian Press. 1972.

4) Jagadish Narayan Sarkar. Glimpses of Midieval Bihar Economy. Calcutta. Ratna Prakashan. 1978.

5) Ranajit Guha. Elementary Aspects of presant Insurgency in colonial India. Oxford. 1983.
6) Romesh Chunder Dutt. The Literature of Bengal. Revised Edition. Calcutta. Thacker Spink & Co. 1895.
7) Sisir Kumar Das. A History of Indian Literature. vol– VIII, First published. Delhi. Sahitya Akademi. 1991.
8) Taine, History of English Literature.
9) University of Calcutta minutes. Calcutta. For the year 1857. Printed for the Calcutta University at the Baptist Mission Press 1860.

=ঃ সহায়ক পত্র-পত্রিকা পঞ্জি ঃ=

১) দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.)। নব্যভারত। একাদশ খন্ড। কলিকাতা। ফাল্গুন ১৩০০।
২) দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.)। নব্যভারত। দ্বাদশ খন্ড। কলিকাতা। ভাদ্র ১৩০১।
৩) দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.)। নব্যভারত। ত্রয়োদশ খন্ড। কলিকাতা। শ্রাবণ ১৩০২।
৪) দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.)। নব্যভারত। ত্রয়োদশ খন্ড। কলিকাতা। আশ্বিন ১৩০২।
৫) দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (সম্পা.)। নব্যভারত। ত্রয়োদশ খন্ড। কলিকাতা। পৌষ ১৩০২।

৬) বঙ্গদর্শন। প্রথম খন্ড। পঞ্চম মুদ্রণ। কলিকাতা। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। জানুয়ারি ১৯৯৯।

৭) বঙ্গদর্শন। দ্বিতীয় খন্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলিকাতা। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। জুন ১৯৮৮।

৮) বঙ্গদর্শন। চতুর্থখন্ড। কলিকাতা। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। জুলাই ১৯৮০।

৯) ভারতী। ফাল্গুন ১৩০৮।

১০) ভারতী। শ্রাবণ ১৩০৯।

১১) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সম্পা.)। বিবিধার্থ সংগ্রহ। কলিকাতা। মাঘ ১৭৭৩ শকাব্দ।

১২) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সম্পা.)। বিবিধার্থ সংগ্রহ। কলিকাতা। জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৬ শকাব্দ।

১৩) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (সম্পা.)। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। অষ্টম ভাগ। প্রথম সংখ্যা। কলিকাতা। ১৩০৮।

১৪) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। পঞ্চম ভাগ। প্রথম সংখ্যা। কলিকাতা। ১৩০৫।

১৫) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। পঞ্চম ভাগ। তৃতীয় সংখ্যা। কলিকাতা। ১৩০৫।

১৬) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। সপ্তম ভাগ। চতুর্থ সংখ্যা। কলিকাতা। ১৩০৭।

১৭) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। দশম ভাগ। প্রথম সংখ্যা। কলিকাতা। ১৩১০।

১৮) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পা.)। সাধনা। তৃতীয় বর্ষ। দ্বিতীয় ভাগ। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

১৯) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.)। সাহিত্য। দ্বিতীয় বর্ষ। কলিকাতা। বৈশাখ-চৈত্র। ১২৯৮।

২০) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.)। সাহিত্য। কলিকাতা। পৌষ ও মাঘ। ১৩০৭।

২১) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.)। সাহিত্য। কলিকাতা। শ্রাবণ। ১৩০৮।

২২) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা.)। সাহিত্য। কলিকাতা। চৈত্র। ১৩০৮।

২৩) স্বর্ণকুমারী দেবী (সম্পা.)। ভারতী। কলিকাতা। ভারতীযন্ত্র। বৈশাখ। ১৩০১।

২৪) স্বর্ণকুমারী দেবী (সম্পা.)। ভারতী। কলিকাতা। ভারতীযন্ত্র। কার্ত্তিক-চৈত্র। ১৩০১।

২৫) স্বর্ণকুমারী দেবী (সম্পা.)। ভারতী। কলিকাতা। মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র। ১৩০১।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- অধিকাংশ পত্রিকা এবং কিছু গ্রন্থগুলিকে আমরা যে অবস্থায় পেয়েছি, তার থেকে গ্রন্থপঞ্জি বা সংক্ষিপ্তটীকা তৈরির জন্য আমরা উপযুক্ত তথ্য পাই নি। তবে যতটুকু পেয়েছি, আমরা চেষ্টা করেছি, ততটুকুই সঠিক ভাবে তুলে ধরবার।

****

=ঃ পরিশিষ্ট ঃ=

MINUTES OF THE SYNDICATE (1857)

(REGULATIONS IN ARTS) ENTRANCE EXAM

Two of the following languages, of which English must be one.

(Candidates for the degree of B.A. shall be examined in the following subjects.)

English

Greek	Persian	Hindi
Latin	Sanskrit	Urdu
Hebrew	Bengali	Burmese
Arabic	Oorya	

English :- Milton, Shakespeare, Dryden, Pope, Young, Thomson, Byron, swift, Addison, Johnson, Goldsmith, Burke, Southey, Macaulay, Cowper, Scott, Campbell, Defoe.

Bengali :- Batrish Singhasan

Purush Parikhya

Betal Panchabingshati

Probodh Chandrika

Mahabharat

Ramayan

Meghaduta

Sakuntala

Annada Mangal.

<u>উৎস</u> ঃ-

University of Calcutta minutes, for the year 1857, Calcutta, Printed for the Calcutta University at the Baptist Mission Press-1860.

1918

Bengali -(I.A. AND I.Sc. Exam)

(For Female Candidates)

Paper setters - RAI SAHEB DINES CHANDRA SEN, B.A.

BABU - JOGINDRANATH BASU, B.A.

1st paper

Examiner - MRS. KUMUDINI BASU, B.A.

1. Narrate briefly in simple Bengali Prose the Principal incidents of the life of Gouranga as depicted in your text.

এই প্রশ্নপত্রটি আমাদের কাজের সঙ্গে গূঢ় অর্থে সম্পৃক্ত নয়, অনুসন্ধান করতে গিয়ে অন্যান্য অংশের সাথে এটিও আমাদের চোখে পড়েছিল, তাই যেমন ও যতটুকু পেয়েছিলাম ততটুকুই অবিকৃত ভাবে এখানে তুলে দিলাম, যদি ভবিষ্যতে কেউ উপকৃত হন এই ভাবনায়।

1920 (M.A. Exam)

Indian Vernaculars.

History of the Bengali Language and Literature.

1st paper - 1st Half

Examiner -Rai BAHADUR DR. DINES CHANDRA SEN, B.A., D.LITT

1. Show how for our Language and Literature havebeen influenced by the Islamike conquest.

2) Trace the gradual growth of the Bengali metres from the earliest times down to the 18th century.

3) Give a brief account of the Yatras of the old school, with a critical review of the works of some of the prominent Yatrawalas.

4) What are the striking literary features of the period dominated by the influence of the court of Krishna Chandra? Comment on their peculiar merits and defects.

5) Clearly indicate the literary and religious evolution in Bengal brought about by the pouranik Renaissance.

6) Give a critical estimate of the Ram Prasad Alwaal and Nidhu Babu.

2nd Half. (M.A. Exam)

Examiner -Dr. ABHAYKUMAR GUHA, M.A., Ph.D.

1) Give an estimate of the Vaishnava theology propounded by Rama Roy to Chaitanya as narrated in the Chaitanya Charitamrita.

2) Shew the influence of Chaitanya's life on the songs of some of the Vaishnava Pada - Kartas, Particularly on Krishna Kamal Goswami illustrating your remarks by reference to his Divyonmada.

3) Give a critical estimate of any one of the following works-

a) Chaitanya Charitamrita.

b) Govinda Dasa's Karcha.

c) Prema -Vilasa.

4) Give a full account of the post Chaitanyic Vaishnava movement in Bengal, With special reference to Sreenivasa, Narottama and Syamananda.

5) Give a comparative review of the lyrical songs of Vidyapati and Chandidasa, illustrating your answer with quotations from each.

6) Mention some of the note worthy incidents of Chaitanya's tour in the Deccan, with special reference to the Muraris, Naroji, Barmukhi and Bhilpantha.

Indian Vernaculars (old texts)

2nd paper (M.A. Exam)

1st half

Examiner - RAI BAHADUR DR. DINES CHANDRA SEN, B.A, D.LITT

3. (b) Prove and account for the extensive popularity of the Mainamati songs out side Bengal.

4. What historical glimpses of Bengal do you find in the Mainamati - songs in respect of her social religious and political conditions?

5. (a) Give all up-to-date information regarding Raja Govinda Chandra as a historical charactor.

(b) Discuss the various allegations made against Mainamati by her son, and account for the great respect for her breathed in the poem inspite of them.

Indian Vernaculars (M.A. Exam)

Bengali - 4th paper

Examiner -MR. P.C. GHOSH, M.A.

1) Give a brief survey, down to 1880, of the departments of literary activity into which the Vernacular literature of Bengal expended under the influence of Western models.

4) Give a brief history of literary criticism in Bengali during 1858-1880.

প্রশ্নগুলিকে আমরা মোটামুটি যে আকারে পেয়েছি তেমন ভাবেই তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা পরিবর্তনের কারণ আমরা সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র হুবহু নকল করি নি। নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা কাজ করেছি।

1921

Indian Vernaculars. (M.A. Exam)

1st paper

History of the Bengali Language and Literature.

Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable.

The questions are of equal value

First Half

Examiner - RAI SAHEB DINESCHANDRA SEN, B.A.

Only three questions to be attempted unless otherwise specified, candidates may write their answers in English or in their own Vernacular.

1. Describe the characteristics of the pauranik Renaisance Literature, as contrasted with those of the earlier epoch.

2. Shew the peculiar excellences of Kavi Kankan and Bharat Chandra as poets representing two different schools.

3. Indicate the Vaishnab Influence in the Ramayana of Krittivas and discuss the question of authorship of those passages which shew such Influence.

4. Give full accounts of any two of the following poets with a critical analysis of their poems -

a) Dasharathi Hay

b) Bijay Gupta

c) Jay Narayan Ghoshal

d) Ketaka Das Kshemananda.

5. Give an account of the Bengali Society as reflected in the Bengali Literature of the 18th century.

Second Half.

Examiner -MR. SASANKA MOHAN SEN, M.A.

Only three to be attemped.

1) Give a correct estimate of the Vaishnab theology propounded by the leaders of the Gauriya School.

2. Give an outline of the classification of tender emotions by the Vaishnab song masters and compare them with some of those as given by European mystics.

3. Discus the historical value of some of the most well known biographies of Chaitanya Dev.

4. Give an estimate of the poetical value of the love lyrics of Chandidas with special reference to idealisation forming the characteristic of many of his songs.

5. Survey the lives of Raghunath Das and Sanatan from the stand points of strict as creticism of the one and spiritual humility of the other.

6. Give a full account of the conversion of Bir Hambir and chandray into the Vaishnab Faith.

Indian Vernaculars (old Texts)

Second paper

[Unless otherwise specified, candidates may write their answers either in English or in their own Vernacular]

FIRST HALF

Examiner - RAI SAHEB DINESCHANDRA SEN, B.A.

Only three to be attempted.

The questions are of equal value.

1.a) Critically examine the songs of Mainamati and Manick Chandra as to whether they belong to the same school as those mentioned in the Chaitanya Bhagavat and are popularly Known as "Songs of the pala Rajas". Fully discuss this matter from a historical standpoint.

b) .....historical problem do you find involved in the allusion made in your text to a fight said to havebeen faught between Gopi Chandra and "a Uriya Raja".

2.a) Account for and prove the extensive popularity of the Mainamati songs throught out India.

b) What clue do you find as to the time and history of Raja Hari Chandra, father of Aduna and Paduna.

3.a) What was the position of women and of the Brahmins in society as depicted in the Mainamati Songs? Shew also the particular features of Tantrik faith prevalent at the period.

b) Are you aware of any legends in European Literature analogous to those mentioned about Mainamati.

প্রশ্নপত্র অনুসারে কোথাও কোন বানান আমরা সংশোধন করি নি, ফলে বর্তমানের নিরিখে ভুল বানান লক্ষনীয়। যেখানে আমরা বুঝতে পারি নি বা ছেঁড়া অংশ চোখে পড়েছে, সেখানে শূন্যস্থান বা ..... চিহ্ন রাখা হয়েছে।

PREFACE TO THE NEW EDITION.

THIS edition of Taine's History of English Literature has been carefully revised and compared with the original. All the quotations have been collated and verified anew, and no trouble has been spared to make it as accurate as possible.

For the favourable reception this translation has met with from the press and the public, I feel much indebted.

H. VAN LAUN.

THE ACADEMY.
EDINBURGH, *May* 31, 1873.

GAC000037148ENG

CONTENTS.

INTRODUCTION.

	PAGE
Historical documents serve only as a clue to reconstruct the visible individual .	2
The outer man is only a clue to study the inner, invisible man	6
The state and the actions of the inner and invisible man have their causes in certain general ways of thought and feeling .	10
Chief causes of thoughts and feelings. Their historical effects .	13
The three primordial forces—	
I. Race .	17
II. Surroundings .	19
III. Epoch .	21
History is a mechanical and psychological problem. Within certain limits man can foretell .	23
Production of the results of a primordial cause. Common elements. Composition of groups. Law of mutual dependence. Law of proportional influences .	25
Law of formation of a group. Examples and indications .	30
General problem and future of history. Psychological method. Value of literature. Purpose in writing this book	32

BOOK I.—THE SOURCE.

CHAPTER I.

The Saxons.

		PAGE
I.	Their original country—Soil, sea, sky, climate—Their new country—A moist land and a thankless soil—Influence of climate on character . .	37
II.	Their bodily structure—Food—Manners—Uncultivated instincts, German and English . . .	41
III.	Noble instincts in Germany—The individual—The family—The state—Religion—The Edda—Tragi-heroic conception of the world and of mankind	49
IV.	Noble instincts in England—Warrior and chieftain—Husband and wife—The poem of Beowulf—Barbarian society and the barbarian hero . . .	58
V.	Pagan poems—Kind and force of sentiments—Bent of mind and speech—Force of impression; harshness of expression	68
VI.	Christian poems—Wherein the Saxons are predisposed to Christianity—How converted—Their view of Christianity—Hymns of Cædmon—Funeral hymn—Poem of Judith—Paraphrase of the Bible	72
VII.	Why Latin culture took no hold on the Saxons—Reasons drawn from the Saxon conquest—Bede, Alcuin, Alfred—Translations—Chronicles—Compilations—Impotence of Latin writers—Reasons drawn from the Saxon character—Aldhelm—Alcuin—Latin verse—Poetic dialogues—Bad taste of the Latin writers . .	82

PAGE

VIII. Contrast of German and Latin races—Character of the Saxon race—Its endurance under the Norman conquest 92

CHAPTER II.

The Normans.

I. Formation and character of Feudalism 95

II. The Norman invasion; character of the Normans—Contrast with the Saxons—The Normans are French—How they became so—Their taste and architecture—Their spirit of inquiry and their literature—Chivalry and amusements—Their tactics and their success 96

III. Bent of the French genius—Two principal characteristics; clear and consecutive ideas—Psychological form of French genius—Prosaic histories; lack of colour and passion, ease and discursiveness—Natural logic and clearness, soberness, grace and delicacy, refinement and cynicism—Order and charm—The nature of the beauty and of the ideas which the French have introduced . 104

IV. The Normans in England—Their position and their tyranny—They implant their literature and language—They forget the same—Learn English by degrees—Gradually English becomes gallicised 115

V. They translate French works into English—Opinion of Sir John Mandeville—Layamon, Robert of Gloucester, Robert de Brunne—They imitate in English the French literature—Moral manuals, chansons, fabliaux, Gestes—Brightness, frivolity, and futility of this French literature—Barbarity and ignorance of the feudal civilisation—Geste

PAGE

of Richard Cœur de Lion, and voyages of Sir John Mandeville—Poorness of the literature introduced and implanted in England—Why it has not endured on the Continent or in England . 121

VI. The Saxons in England—Endurance of the Saxon nation, and formation of the English constitution—Endurance of the Saxon character, and formation of the English character 138

VII.-IX. Comparison of the ideal hero in France and England—Fabliaux of Reynard, and ballads of Robin Hood—How the Saxon character makes way for and supports political liberty—Comparison of the condition of the Commons in France and England—Theory of the English constitution, by Sir John Fortescue—How the Saxon constitution makes way for and supports political liberty—Situation of the Church, and precursors of the Reformation in England—Piers Plowman and Wycliffe—How the Saxon character and the situation of the Norman Church made way for religious reform—Incompleteness and importance of the national literature—Why it has not endured 145

CHAPTER III

The New Tongue.

I. Chaucer—His education—His political and social life—Wherein his talent was serviceable—He paints the second feudal society 170

II. How the middle age degenerated—Decline of the serious element in manners, books, and works of art—Need of excitement—Analogies of architecture and literature 171

PAGE

III. Wherein Chaucer belongs to the middle age—Romantic and ornamental poems—*Le Roman de la Rose*—*Troilus and Cressida*—*Canterbury Tales*—Order of description and events—*The House of Fame*—Fantastic dreams and visions—Love poems—*Troilus and Cressida*—Exaggerated development of love in the middle age—Why the mind took this path—Mystic love—*The Flower and the Leaf*—Sensual love—*Troilus and Cressida* 173

IV. Wherein Chaucer is French—Satirical and jovial poems—*Canterbury Tales*—*The Wife of Bath* and marriage—The mendicant friar and religion—Buffoonery, waggery, and coarseness in the middle age 193

V. Wherein Chaucer was English and original—Idea of character and individual—Van Eyck and Chaucer contemporary—Prologue to *Canterbury Tales*—Portraits of the franklin, monk, miller, citizen, knight, squire, prioress, the good clerk—Connection of events and characters—General idea—Importance of the same—Chaucer a precursor of the Reformation—He halts by the way—Tediousness and Childishness—Causes of this feebleness—His prose, and scholastic notion—How he is isolated in his age 203

VI. Connection of philosophy and poetry—How general notions failed under the scholastic philosophy—Why poetry failed—Comparison of civilisation and decadence in the middle age, and in Spain—Extinction of the English literature—Translators—Rhyming chroniclers—Didactic poets—Compilers of moralities—Gower—Occleve—Lydgate—Analogy of taste in costumes, buildings, and literature—Sad notion of fate and human misery—Hawes—Barclay—Skelton—Elements of the Reformation and of the Renaissance 213

BOOK II.—THE RENAISSANCE.

CHAPTER I.

The Pagan Renaissance.

§ 1. Manners of the Time.

PAGE

I. Idea which men had formed of the world, since the dissolution of the old society—How and why human inventiveness reappears—The form of the spirit of the Renaissance—The representation of objects is imitative, characteristic, and complete 227

II. Why the ideal changes—Improvement of the state of man in Europe—In England—Peace—Industry—Commerce—Pasturage—Agriculture—Growth of public wealth—Buildings and furniture—The palace, meals and habits—Court pageantries—Celebrations under Elizabeth—Masques under James I. 230

III. Manners of the people—Pageants—Theatres—Village feasts—Pagan development 239

IV. Models—The ancients—Translation and study of classical authors—Sympathy for the manners and mythology of the ancients—The moderns—Taste for Italian writings and ideas—Poetry and painting in Italy were pagan—The ideal is the strong and happy man, limited by the present life 243

§ 2. Poetry.

I. The English Renaissance is the Renaissance of the Saxon genius 250

II. The forerunners—The Earl of Surrey—His feudal and chivalrous life—His English individual

CONTENTS.

BOOK IV.—MODERN LIFE.

CHAPTER II.

Lord Byron.

PAGE

I. The Man—Family—Impassioned character—Precocious loves—Life of excess—Combative character—Revolt against opinion—*English Bards and Scotch Reviewers*—Bravado and rashness—Marriage—Extravagance of adverse opinion—Departure—Political life in Italy—Sorrows and violence 1

II. The poet—Reasons for writing—Manner of writing—How his poetry is personal—Classical taste—How this gift served him—*Childe Harold*—The hero—The scenery—The style . . . 13

III. His short poems—Oratorical manner—Melodramatic effects—Truth of his descriptions of scenery—Sincerity of sentiments—Pictures of sad and extreme emotions—Dominant idea of death and despair—*Mazeppa, The Prisoner of Chillon, The Siege of Corinth, The Corsair, Lara*—Analogy of this conception with the *Edda* and Shakspeare—*Darkness* 22

PAGE

IV. *Manfred*—Comparison of *Manfred* and *Faust*—Conception of legend and life in Goethe—Symbolical and philosophical character of *Faust*—Wherein Byron is inferior to Goethe—Wherein he is superior—Conception of character and action in Byron—Dramatic character of his poem—Contrast between the universal and the personal poet 34

V. Scandal in England—Constraint and hypocrisy of manners—How and by what law moral conceptions vary—Life and morals of the south—*Beppo*—*Don Juan*—Transformation of Byron's talent and style—Picture of sensuous beauty and happiness—Haidée—How he combats British cant—Human hypocrisy—His idea of man—Of woman—Donna Julia—The shipwreck—The capture of Ismail—Naturalness and variety of his style—Excess and wearing out of his poetic vein—His drama—Departure for Greece, and death 47

VI. Position of Byron in his age—Disease of the age—Divine conceptions of happiness and life—The conception of such happiness by literature—By the sciences—Future stability of reason—Modern conception of nature 65

CHAPTER III.

The Past and the Present.

§ 1.

I. The past—The Saxon invasion—How it established the race and determined the character—The Norman Conquest—How it modified the character and established the Constitution . . . 70

PAGE

II. The Renaissance—How it manifested the national mind—The Reformation—How it fixed the ideal—The Restoration—How it imported classical culture and misled the national mind—The Revolution—How it developed classical culture and restored the national mind 73

III. The modern age—How European ideas widened the national mould 78

§ 2.

I. The present—Concordances of observation and history—Sky—Soil—Products—Man . . . 81

II Commerce—Industry 90

III. Agriculture 97

IV. Society—Family—Arts—Philosophy—Religion . 103

V. What forces have produced the present civilisation, and are working out the future civilisation . 110

BOOK V.—MODERN AUTHORS

INTRODUCTORY NOTE 113

CHAPTER I.

The Novel—Dickens.

§ 1.—THE AUTHOR.

I. Connection of the different elements of each talent—Importance of the imaginative faculty . . . 117

II. Lucidity and intensity of imagination in Dickens—Boldness and vehemence of his fancy—How with him inanimate objects are personified and impassioned—Wherein his conception is akin to intuition—How he describes idiots and madmen 118

PAGE

III. The objects to which he directs his enthusiasm—His trivialities and minuteness—Wherein he resembles the painters of his country—Wherein he differs from George Sand—*Miss Ruth* and *Geneviève*—A journey in a coach . . . 129

IV. Vehemence of the emotions which this kind of imagination must produce—His pathos—*Stephen*, the factory hand—His humour—Why he attains to buffoonery and caricature—Recklessness and nervous exaggeration of his gaiety 133

§ 2.—The Public.

I. English novels are compelled to be moral—Wherein this constraint modifies the idea of love—Comparison of love in George Sand and Dickens—Pictures of the young girl and the wife—Wherein this constraint qualifies the idea of passion—Comparison of passions in Balzac and Dickens—Inconvenience of this foregone conclusion—How comic or odious masks are substituted for natural characters—Comparison of *Pecksniff* and *Tartuffe*—Why unity of action is absent in Dickens 142

§ 3.—The Characters.

I. Two classes of characters—Natural and instinctive characters—Artificial and positive characters—Preference of Dickens for the first—Aversion against the second 150

II. The hypocrite—Mr. Pecksniff—Wherein he is English—Comparison of *Pecksniff* and *Tartuffe*—The positive man—Mr. Gradgrind—The proud man—Mr. Dombey—Wherein these characters are English 151

PAGE

III. Children—Wanting in French literature—Little *Joas* and *David Copperfield*—Men of the lower orders 159

IV. The ideal man according to Dickens—Wherein this conception corresponds to a public need—Opposition of culture and nature in England—Reassertion of sensitiveness and instinct oppressed by conventionalism and rule—Success of Dickens . 163

CHAPTER II.

The Novel continued—Thackeray.

I. Abundance and excellence of novels of manners in England—Superiority of Dickens and Thackeray—Comparison between them 165

§ 1.—The Satirist.

II. The satirist—His moral intentions—His moral dissertations 166

III. Comparison of raillery in France and England—Difference of the two temperaments, tastes, and minds 173

IV. Superiority of Thackeray in bitter and serious satire—Serious irony—Literary snobs—*Miss Blanche Amory*—Serious caricature—*Miss Hoggarty* . 176

V. Solidity and precision of this satirical conception—Resemblance of Thackeray and Swift—The duties of an ambassador 185

VI. Misanthropy of Thackeray—Silliness of his heroines—Silliness of love—Inbred vice of human generosities and exaltations 188

VII. His levelling tendencies—A want of characters and society in England—Aversions and preferences—The snob and the aristocrat—Portraits of the

PAGE

king, the great court noble, the county gentleman, the town gentleman—Advantages of this aristocratic institution—Exaggeration of the satire 191

§ 2.—The Artist.

VIII. The artist—Idea of pure art—Wherein satire injures art—Wherein it diminishes the interest—Wherein it falsifies the characters—Comparison of Thackeray and Balzac—*Valérie Marneffe* and *Rebecca Sharp*. 205

IX. Attainment of pure art—Portrait of *Henry Esmond*—Historical talent of Thackeray—Conception of ideal man 214

X. Literature is a definition of man—The definition according to Thackeray—Wherein it differs from the truth 224

CHAPTER III.

Criticism and History.—Macaulay.

I. The vocation and position of Macaulay in England . 227

II. His *Essays*—Agreeable character and utility of the style—Opinions—Philosophy. Wherein it is English and practical—His *Essay on Bacon*—The true object, according to him, of the sciences—Comparison of Bacon with the ancients . . . 228

III. His criticism—Moral prejudices—Comparison of criticism in France and England—Why he is religious—Connection of religion and Liberalism in England—Macaulay's Liberalism—*Essay on Church and State* 233

IV. His passion for political liberty—How he is the orator and historian of the Whig party—*Essays on the Revolution and the Stuarts* 238